# মন্দিরময় ভারত

অপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

এম. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২.

প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

মূল্য : পাঁচ টাকা



মুদ্রাকর : শ্রীচন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস : ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ব্রহ্মবিৎ ১০৮ শ্রীশ্রীস্বামী ভারতী শঙ্কর তীর্থ গুরুজি মহারাজের শ্রীপাদ-পদ্মে ভক্তির অর্ঘ্য-স্বরূপ নিবেদন করছি আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

**শুভ মহালয়া**
৬ই আশ্বিন, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

**শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী**

# নিবেদন

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। লক্ষশত মন্দিরে শোভিত হয়ে আছে তার নগর, গ্রাম, প্রান্তর, তার পথ, ঘাট, বন উপবন। শোভিত হয়ে আছে তার পাহাড়ের শীর্ষদেশ। তাদের অঙ্গে রচনা করেছেন শিল্পী কত অনবদ্য, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার, নিদর্শন কত বিভিন্ন স্থাপত্যের। করেছেন যুগের পর যুগ। সাজিয়েছেন তাদের অপরূপ সাজে। মিশিয়ে দিয়েছেন মনের সবখানি মাধুরী, উজাড় করে দিয়েছেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য। অমর হয়েছে ভারতবর্ষ। অমর হয়েছেন শিল্পীরাও, পেয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের শিল্পের দরবারে।

সম্ভব নয় সবগুলি মন্দির দর্শন করা। সহজ নয় তাদের সকলের সম্বন্ধে আলোচনা করাও। আমার পক্ষে যতগুলি দেখা সম্ভব হয়েছিল, যেগুলি ভাল লেগেছিল, আছে যাদের খ্যাতি, তাদেরই বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছি আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে।

মন্দিরময় ভারত নাম দিয়েছি খ্যাতিমান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শে ও ইচ্ছায়। তাঁরই ঐকান্তিক শুভ আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে লিখেছি এই বই। যদি কেউ পড়ে আনন্দ পান, মন্দির দর্শনের বাসনা অন্তরে জাগে, তবেই স্বার্থক হবে আমার প্রচেষ্টা, সফল হবে উদ্যম।

এই খণ্ডে অন্ধ্রদেশের কয়েকটি মন্দিরের বিবরণ দিয়েছি। দ্রাবিড়স্থানের, চালুক্যভূমের আর মহীশূরের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দিরের বিবরণ দিতেও চেষ্টা করেছি। বর্ণিত হয়েছে কাশ্মীরের প্রায় সবগুলি মন্দিরও। স্থাপত্য হিসাবে তাদের ভাগ করা হয়েছে, অন্ধ্র, দ্রাবিড়, চালুক্য, হোয়সল ও কাশ্মীর স্থাপত্যে।

মন্দিরের বিবরণ ছাড়াও বিবৃতি আছে দেশের ইতিহাসের, ইতিহাস স্থাপত্যের আর স্থাপত্যের ধারার; আছে তাদের রীতিনীতি জীবন-যাত্রার বর্ণনাও।

দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হবে ভারতের সমস্ত গুহামন্দির। তৃতীয় খণ্ডে, উত্তর প্রদেশের, মধ্য প্রদেশের, রাজস্থানের, উড়িষ্যার, বাংলার ও আসামের মন্দিরের বিবরণও থাকবে। জানিনা পূর্ণ হবে কিনা আমার এই বাসনা।

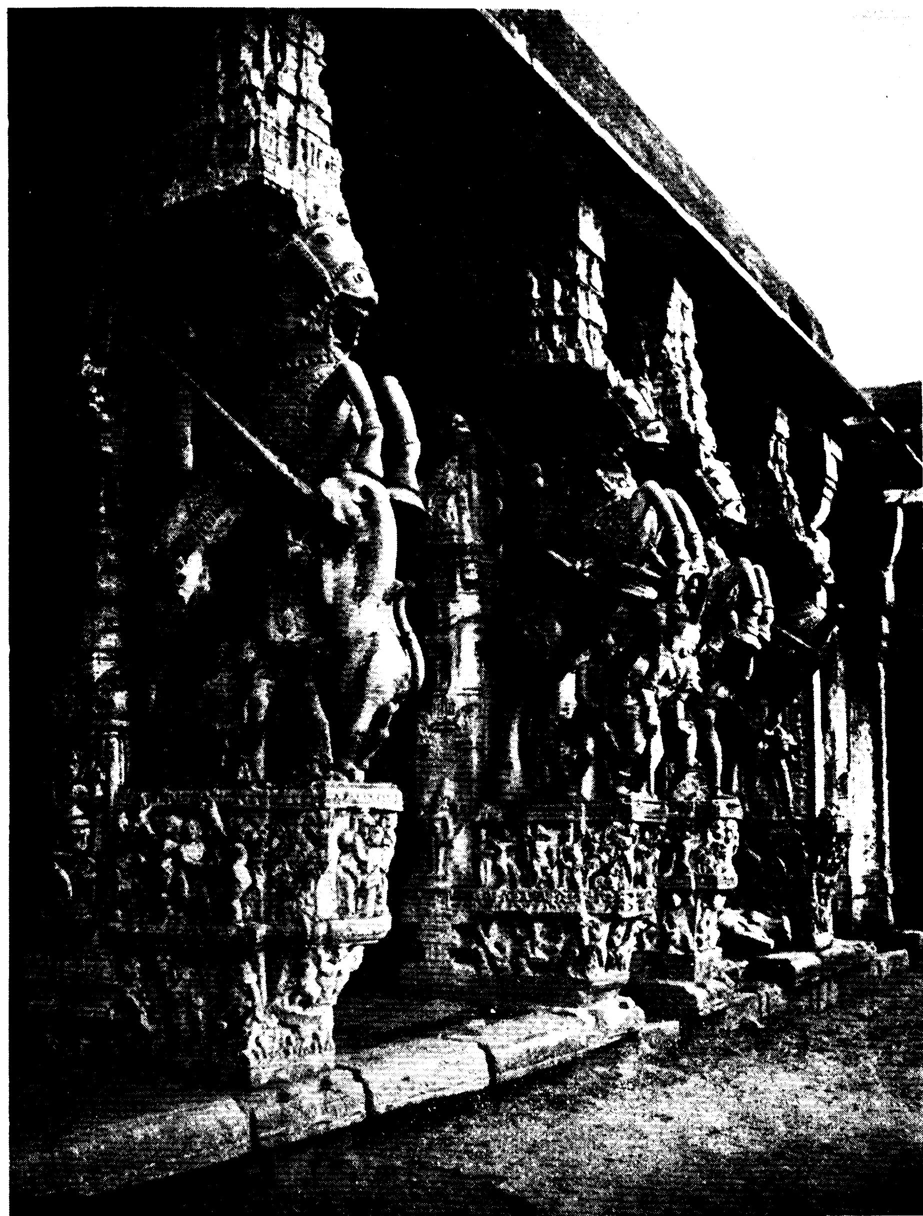
৬ই আশ্বিন, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ
২৩।এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯

শ্রীঅপূর্ববরতন ভাদুড়ী

# সূচীপত্র

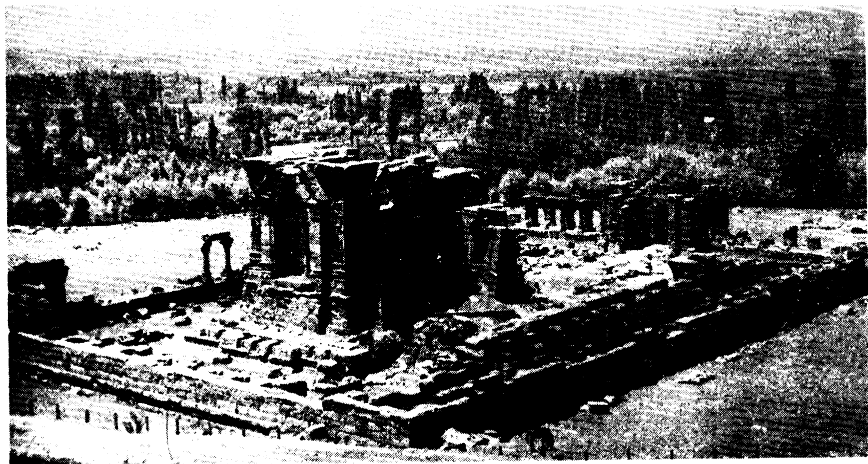
# প্রথম অধ্যায়

## অন্ধ দেশ

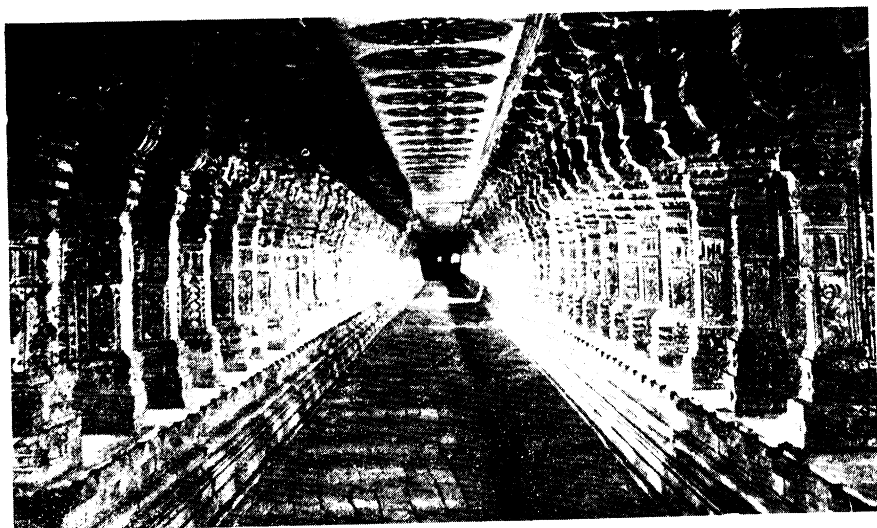


শেষাগিরি রাও-এর মন্দির-স্তম্ভ—শ্রীরঙ্গম

পৃষ্ঠা ৭০



মার্তণ্ডের মন্দির — কাশ্মীর পৃষ্ঠা ২২১



সহস্র স্তম্ভ অলিন্দ—রামেশ্বরম পৃষ্ঠা ১১০

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## বিশাখাপত্তনম্ ঃ সীমাচলমের মন্দির

১৯৫৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় দিনগুলির অন্যতম। সেদিন দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের সঙ্কল্প পাকা করে ফেলি। মনে পড়ে যায় ১৯২২ সালের ৮ই মে-র কথা, যেদিন প্রথম সমুদ্র দর্শন হয়। দেখি পুরীর সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে তরঙ্গসঙ্কুল বঙ্গোপসাগরকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি তাঁর অপরূপ রূপ। শ্রদ্ধা জানাই তাঁকে। নিজেকেও ভাগ্যবান্ মনে করি।

মনে পড়ে, যেদিন দেখি প্রথম পর্বত। দেখি ১৫ই এপ্রিল ১৯২৫ সালে। দেখি হিমালয়কে সিমলা-শৈল থেকে। সারি সারি দাঁড়িয়ে আছেন হিমগিরি-শ্রেণী, প্রসারিত হয়েছেন দিগন্তে। স্পর্শ করেছেন আকাশ, উত্তুঙ্গ চূড়া দিয়ে আকাশ ভেদ করে পৌঁছাবেন স্বর্গে--প্রণতি জানাবেন সৃষ্টিকর্তাকে। সামনে দেখি এক প্রশান্ত ধ্যান-গম্ভীর মহিমাময় মূর্তি, শিরে ধারণ করেছেন শ্বেত শিরোভূষণ, অঙ্গে জড়িয়েছেন শ্বেত উত্তরীয়। শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক, জানাই সহস্র প্রণাম, নিই বিদায় দিয়ে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, দেই নিঃশেষ করে। মনে করি নিজেকে মহাসৌভাগ্যশালী।

মনে পড়ে আরও একদিনের কথা। সেদিন ছিল ১৯৪৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী। রওনা হই সেদিন এলোরা আর অজন্তা দর্শনে। আসে সেদিন বহুপ্রতীক্ষার পরে। সার্থক হতে চলে বহু বরষের এক তীব্র বাসনা। সফল হতে যায় স্বপ্নলোক এলোরা আর অজন্তা দর্শনের স্বপ্ন। সেদিনও প্রণাম জানিয়েছিলাম নিজের সৃষ্টিকর্তাকে। মনে হয়েছে পরম ভাগ্যবান্ আমি।

তখন আমি দিল্লীপ্রবাসী, স্থির হয় গৃহিণীও সঙ্গে যাবেন, না হয় বাড়বে কিছু খরচ। যাবে রূপ সিং, আর 'ইক্‌মিক্ কুকার', আমার সব যাত্রার সাথী। যাব কলকাতা হয়ে, সেখানে দু'তিন দিন কাটিয়ে বিশাখাপত্তনম্ অভিমুখে রওনা হব।

এমন সময় কাশী থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের চিঠি আসে। যেতে হবে কাশী

হয়েও। করতে হবে গঙ্গাস্নান, হবে বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা দর্শন। হবে কিছু পুণ্যসঞ্চয়, দেখাও হবে আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে।

৭ই নভেম্বর রওনা হই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র নিয়ে, আর নিয়ে গৃহিণী আর রূপ সিং। কাশী থেকে কলিকাতায় আসি। সেখানে একদিন কাটিয়ে বিশাখাপত্তনমে রওনা হই।

১২ই নভেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় মাদ্রাজ মেল ওয়ালটিয়ার ষ্টেশনে এসে থামে। শুনি একটি 'ম্যানসানে' স্থান মিলেছে। একেবারে সমুদ্র-সৈকতে অবস্থিত এই ম্যানসানটি। ট্যাক্সি করে মাইল দুই রাস্তা যেতে হবে তবেই ম্যানসান মিলবে। ট্যাক্সি এঁকে বেঁকে যায়। শহর অতিক্রম করে একটি অনতি প্রশস্ত গলিতে প্রবেশ করে। হঠাৎ সমুদ্রের গর্জন কানে আসে। কি ভীষণ সে গর্জন, কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে।

একটি মোড় নিয়েই ট্যাক্সি থেমে যায়। দেখি, একেবারে সমুদ্রের সৈকতে এসে পড়েছি। বাম পাশে একটি বৃহৎ অট্টালিকা। এই সেই ম্যানসান, আমাদের বিশাখাপত্তনমের বাসস্থান। তারও বামে দাঁড়িয়ে আছে একটি পর্বতশ্রেণী। মনে হয়, সমস্ত শহরটিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পূর্বঘাটের এক গিরিবর। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর,—বিরাট, অন্তহীন। ছুটে যাই সৈকতের উপর। ভুলে যাই ম্যানসানের কথা। মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াই সমুদ্র আর আমি। দেখি কি প্রচণ্ড গর্জনে আসেন বঙ্গোপসাগর, ছুটে আসেন উদ্দাম গতিতে, অমিত বিক্রমে, সহস্র ফণা বিস্তার করে,—আছড়ে পড়েন কূলে। ছড়িয়ে পড়েন লক্ষ শত ধারায় বসুন্ধরার বুকে, শাসনের বেত্রদণ্ড নিয়ে। পরমুহূর্তেই তাঁর রূপ যায় বদলে। বুকে ভরে নেন স্নেহ। ধেয়ে আসেন অসংখ্য বাহু বিস্তার করে। আসেন আকুল হয়ে, অন্ধ আবেগে। লুটিয়ে পড়েন তীরের উপর। বুলিয়ে দেন স্নেহের স্পর্শ ধরিত্রীর অঙ্গে। মুছে যায় শাসনের জ্বালা।

চলেছে এই খেলা সাগরে আর বসুন্ধরায়, দিনরাত্রি। চলেছে বিরামহীন। কবে এর আরম্ভ, কতদিন এই খেলা চলবে, কবে হবে শেষ, জানেন একমাত্র বিধাতা। জানেন সৃষ্টিকর্তা। পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন গিরিবর, ধ্যানমৌন যোগী, দাঁড়িয়ে দেখেন এই খেলা।

সমুদ্রের এই অপরূপ রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। হারিয়ে ফেলি আপন সত্তা। ভুলে যাই কোথায় এসেছি, কেন এসেছি, যেতে হবে কোথায়। মনে হয়, আসে বুঝি এক গতির তরঙ্গ, উঠে আসে সমুদ্রের বুক থেকে, কূল অতিক্রম করে আসে। এসে প্রবেশ করে আমার অঙ্গে। উপলব্ধি হয়, সঞ্চারিত হয় সেই বেগ, আমার সমস্ত শিরায়, উপশিরায়—সঞ্চারিত হয় সর্বাঙ্গে। এক প্রবল ইচ্ছা জাগে মনে, বাসনা হয় ঐ সম্মুখের সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার, যেমন করে সমুদ্র বসুন্ধরার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। হারিয়ে যাক পৃথক্ সত্তা, লীন হয়ে যাই সমুদ্রে।

ঠিক এই রকমের এক অনুভূতি মনে জেগেছিল, যখন পুরীর সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে বঙ্গোপসাগরকে প্রথম দেখি। তার পরে, বহুদিন, বহুস্থানে, বহুরূপে সমুদ্রকে দেখেছি। দেখেছি বোম্বাই-এর জুহুতে আর উরিলিতে, দেখেছি আরব সাগরকে। দেখেছি বঙ্গোপসাগরকে মহাবলীপুরমে, মাদ্রাজে, পণ্ডিচেরিতে আর টুটিকোরিণে। দেখেছি আরবকে ত্রিবাঙ্কুরে আর কোচীনে। দেখেছি কন্যাকুমারীতে, তিন সমুদ্রের মিলন ক্ষেত্রে, আরব, বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগরকে। দেখেছি একসঙ্গে। উপলব্ধি করি নাই এমন অনুভূতি। বাসনা জাগে নাই মনে সাগরের বুকে লীন হয়ে যেতে।

জানিনে কতক্ষণ এই রকম অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। শেষে রূপ সিং-এর ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে ম্যানসানের দোতলায় উঠে আসি। দেখি এক কোণের ঘরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামনে একটি প্রশস্ত বারান্দা, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। সেখান থেকে মনে হয় সমুদ্র যেন বাড়িটির গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ছে। ঘরটিরও দু'দিক থেকে সমুদ্র দেখা যায়। দেখি এর মধ্যেই জিনিসপত্রগুলি যথা সম্ভব গুছিয়ে রাখা হয়েছে, কিছু রান্নাঘরে চালান দেওয়া হয়েছে, কিছু ড্রেসিং রুমে। নাইবার জায়গা, পায়খানা সবই পরিপাটি করে সাজান আর পরিষ্কার। দেখে মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

প্রাতঃকৃত্য আর স্নান শেষ করে বারান্দায় এসে বসি, তখনও খাবার প্রস্তুত হওয়ার দেরী আছে। সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটি 'ইজি' চেয়ারে বসে সমুদ্রের রূপ দেখতে থাকি।

এক বিশাল জলরাশি গর্জন করতে করতে অসীমের পানে ছুটে চলেছে, দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, মিশেছে নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র, হারিয়ে ফেলেছে পৃথক্ স্বরূপ। এক ঘোর নীলবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে, তারই ছটা সাগরের বুকে প্রতিফলিত হয়েছে, ঘোর নীল বর্ণ ধারণ করেছে সাগরের জল। নীল আকাশ, নীল সাগরের জল, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

মাঝে মাঝে দেখা যায় জাহাজ, যেন হঠাৎ সাগরের বুকে ভেসে ওঠে, আবার দৃষ্টির বাহিরে হারিয়ে যায়, একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। দু'একখানি নিকটে আসে, পাশের ফাঁড়িতে প্রবেশ করে, বন্দরে গিয়ে পৌঁছায়। তাদের আগে যায় পাইলট, পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। শুনি ঐ ফাঁড়ির মুখে, সমুদ্র থেকে কিছু দূরে, এখানকার বন্দর পাহাড়ে বেষ্টিত হয়ে আছে, আছে লোক চক্ষুর অগোচরে শত্রুর অনতিক্রম্য হয়ে। তাই ক্ষুদ্র হলেও আছে এই বন্দরের প্রসিদ্ধি। প্রকৃতি কর্তৃক সুরক্ষিত বলে খ্যাতি আছে।

দেখি ফাঁড়ির সামনা সামনি সমুদ্রের বুকে একটি ফ্লাট দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক স্থপতির পরমাশ্চর্য দান, দান মহীশূরের বিশ্বেশ্বর আইয়ারের, এই ফ্লাট-টি, রুদ্ধ করে ফাঁড়ি দিয়ে ডকে পলিমাটির প্রবেশ। নইলে পলিমাটিতে ভরতি হয়ে যেত ডক, নিঃশেষ হত তার আয়ু।

বন্দর ছাড়াও এখানে একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা আছে। এই কারখানাটি বোম্বাই-এর সিন্ধিয়া কোম্পানী স্থাপন করেছিলেন, স্থাপিত হয়েছিল খ্যাতনামা ব্যবসায়ী স্যার ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদের প্রচেষ্টায় আর উদ্যমে। আজ তাঁর কীর্তির নিদর্শন বুকে নিয়ে আছে এই কারখানা, আছে বিশাখাপত্তনম্-ও। এখানে এক যোগে তিনখানা করে জাহাজ তৈরী হতে পারে। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাস থেকে এই কারখানাটিকে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়েছে। ক্রমেই এর কলেবর বাড়ছে, একদিন হবে এই কারখানা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাহাজ নির্মাণের কারখানাগুলির অন্যতম, বিশাখাপত্তনম্ ভারতের লিভারপুলে পরিণত হবে।

সময় নাই সীমাচলমে যাওয়ার, তাই খাওয়া-দাওয়া সেরে কারখানা দেখতে বেরিয়ে পড়ি। পথে বন্দর পড়ে। বন্দরটি সত্যই সুন্দর আর সাজান। শুনি এখানে এক সঙ্গে ১২ খানি জাহাজ থাকবার স্থান আছে, তাই স্থান বাড়াবার

চেষ্টা চলেছে, যাতে এক যোগে ১৮ খানি জাহাজ স্থান পায়। দেখি নৌঘাঁটিও। তারপর কারখানা দেখতে যাই।

দেখি দুইটি জাহাজ নির্মিত হচ্ছে দুইটি 'বার্থে', তৃতীয়টি খালি রয়েছে। একটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, অপরটি সবে মাত্র 'কীলে' চাপান হয়েছে। ড্রাই ডকে এখানকার তৈরী একখানি জাহাজ দেখি। গর্বে বুক ভরে যায়, দেখি আমারই দেশের তৈরী জাহাজ। দেখি আরও অনেকগুলি কারখানা, তাদের জাহাজ নির্মাণে সাহায্য করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছে। দেখি তৈরী হচ্ছে সুন্দর আর মসৃণ চেয়ার টেবিল, জাহাজে বসান হবে, যখন তৈরী হবে। ঘুরে ঘুরে কারখানা দেখি, দেখি এক নয়নাভিরাম অফিসের বাড়িও। তারপর 'ম্যানসানে' ফিরে আসি।

ফিরে এসে কিছুক্ষণ সৈকতের উপর বসে সমুদ্রের শোভা দেখি। রাত্রির খাওয়া সেরে আবার বারান্দায় এসে বসি। দূরে, বহুদূরে একটি উজ্জ্বল আলোর বিন্দু দেখা যায়। ভেসে ওঠে বিন্দু সমুদ্রের বুকে, পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার ভেসে ওঠে। ঐ আলোই নাকি নাবিকদের জানিয়ে দেয় বিপদের বার্তা, নির্দেশ করে নিরাপদে চলার পথও।

দেখি মাঝে মাঝে আলোর মালা সমুদ্রের বুকে ভেসে ওঠে, কিছুক্ষণ পরেই অদৃশ্য হয়ে যায়। ঐ আলোর মালা কণ্ঠে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে জাহাজ চলে, পাড়ি দেয় সমুদ্র।

ক্রমে রাত্রি হয় গভীর, নিস্তব্ধ হয় চতুর্দিক, শোনা যায় একমাত্র ঝড়ের গর্জন। ঝড় নয়, সমুদ্রের বুক থেকে আসে, বধির হয় কান। দেখি সমুদ্রের রাত্রির রূপ। মহিমাময় সমুদ্র, বিশ্রাম করেন সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, থাকেন শয়ন করে। দিগন্তের কোলে মস্তক রাখেন, পদতলে বসুন্ধরা। ঘুমিয়ে পড়েন বসুন্ধরাও, নিস্তব্ধ, নীরব বসুন্ধরা। ক্রমে সমুদ্রও তার উদ্দামতা হারিয়ে ফেলে। তার নির্জনতা, তার অসীমতা ধ্যানমগ্ন করে, চঞ্চল করে না। কিছুক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে সমুদ্রের রাত্রির এই অপরূপ রূপ দেখে শয্যায় শুয়ে পড়ি। কাটে অনেকক্ষণ অর্ধ নিদ্রা আর অর্ধ জাগরণের মধ্যে। তারপর জানতে পারি না কখন ঘুমিয়ে পড়ি।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে, সূর্যের আলো দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বার আগেই

সীমাচলমের পথে রওনা হই। ট্যাক্সি করে যাই, আধ ঘণ্টার মধ্যেই অতিক্রম করি আট মাইল পথ, অতিক্রম করি কয়েকটি আম্রকুঞ্জও, উপনীত হই সীমাচলমের পাহাড়ের একেবারে সানুদেশে।

এই পাহাড়ের শীর্ষদেশে প্রায় চার হাজার ফিট উঁচুতে মন্দিরটি অবস্থিত। সেই মন্দিরে নরসিংহদেব বিরাজ করেন। এইখানেই, এই পাহাড়ের শীর্ষদেশেই সত্যযুগে নরসিংহদেবের আবির্ভাব হয়েছিল, তিনি এসেছিলেন ভক্ত প্রহ্লাদের মানরক্ষা করতে, প্রমাণ করতে এসেছিলেন হরি আছেন জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, আছেন সর্বত্র।

এক স্তম্ভ ভেদ করে আবির্ভাব হয়েছিলেন। বেরিয়ে এসে মহা অত্যাচারী দানব হিরণ্যকশিপুকে হাঁটুর উপর তুলে নিয়ে নখ দিয়ে তার পেট বিদীর্ণ করেছিলেন। পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়েছিল হিরণ্যকশিপুর। পূর্ণ হয়েছিল ভক্ত প্রহ্লাদের মনোবাঞ্ছা। তাই এই মন্দিরের এত প্রসিদ্ধি, মহাপবিত্র এই স্থান, ভারতের মহাতীর্থের অন্যতম।

প্রতিবছরে, কেবলমাত্র অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে নরসিংহদেব দর্শন দেন, অন্য দিনে, মন্দিরের স্তম্ভের অঙ্গের এক ক্ষোদিত প্রতিমূর্তি থেকে তাঁর স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। সেই মূর্তিতেই নরসিংহদেব সিংহাসনে বিরাজ করেন। এক কঠিন চন্দনের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে তাঁর সর্বাঙ্গ। যাত্রী আসে হাজারে হাজারে, কোন ঋতুতেই তাদের আগমনের বিরাম নেই। নরসিংহদেবকে ভক্তিভরে পূজা দিয়ে যায়, জানায় প্রণাম। একদিন তীর্থ ভ্রমণের পথে শ্রীচৈতন্য-দেবও এসেছিলেন, দেবতার সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে, দেবদর্শন পেয়ে ভাবাবেশে অভিভূত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তার লিখিত প্রমাণ আছে।

হাজারটি নম্বর দেওয়া সিঁড়ি অতিক্রম করে উপনীত হতে হয় মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। সিঁড়ির দু'পাশে পাহাড়ের গায়ে নানারকমের বৃক্ষ, আম, কাঁঠাল, জাম, পেঁপে, কলাগাছের গুচ্ছ আর আনারস। সবগুলিই ফলে ভরতি। তাদের ছায়া সিঁড়ির উপর এসে পড়ে, রদ্দুরের তাত মাথায় লাগে না, দূর করে আরোহণের ক্লান্তিও। মাঝে মাঝে পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে ঝরণা নেমে এসে, প্লাবিত করে সিঁড়ি। কোথাও ঝরণার নীচে সিমেণ্ট দিয়ে চৌবাচ্চা বানান হয়, হয় স্নানের জায়গাও, যাত্রীরা সেই জলে মুখহাত ধুয়ে নেয়, করে স্নানও।

ভিখারীও আছে হাজারে হাজারে, আতুর আছে খঞ্জও আছে, আছে অন্ধও। কেউ সিঁড়ির উপর বসে আছে কাউকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। প্রতিপদক্ষেপেই দিতে হয় পয়সা। নইলে রুদ্ধ হয় গতি।

আমরা ধীরে ধীরে একের পর এক সোপান অতিক্রম করি, সঙ্গে আছেন একজন অন্ধ্র ব্রাহ্মণ। কিছুদূর উঠি আর দেখি সিঁড়ির নম্বর, দেখি কটা সিঁড়ি অতিক্রম করা হল। যখন আসে ক্লান্তি, অবশ হয় পা, বসে পড়ি সিঁড়ির উপর, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিই, দূর হয় ক্লান্তি। আবার উঠে অগ্রসর হই। এমনই করে উপনীত হই ৬৫০ নম্বরের সিঁড়িতে। সুরু হয় এইবারে খাড়া সিঁড়ির শ্রেণী, ভীষণ কষ্ট হতে থাকে উঠতে, তবুও বহুকষ্টে অতিক্রম করি কয়েকটি সিঁড়ি আর বসে পড়ি। এমনই করে আরও কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করবার পর সত্যিই নিঃশেষ হয় শক্তি, বন্ধ হয় নিঃশ্বাস, মনে হয় এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে, হবে না দেব দর্শন।

হঠাৎ চোখে পড়ে একটি ক্ষুদ্র মন্দির, দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণের সোপান শ্রেণীর সংলগ্ন হয়ে। দেখি বামেও পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে নেমে আসে একটি ঝরণা, নেমে আসে চঞ্চল গতিতে, অন্তরের ধ্বনি শোনাতে শোনাতে, প্লাবিত করে সোপানের শ্রেণী। এই মন্দিরে পূজিত হন মহাবীর। কোন রকমে দেহটাকে টেনে নিয়ে যাই মন্দিরের চাতালের ওপর, কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকি, মনে মনে মহাবীরকে প্রণাম জানিয়ে বলি, "বল দাও মহাবীর, শক্তি দাও দেব দর্শনের, ফিরিয়ে দিও না মাঝ রাস্তা থেকে।"

মহাবীর প্রার্থনা শোনেন। দেহে শক্তি ফিরে আসে। ঝরণার শীতল জলে হাত মুখ ধোয়ায় দূর হয় ক্লান্তিও। আবার সুরু হয় যাত্রা। শেষে সহস্র সিঁড়ি অতিক্রম করে মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হই। সেখান থেকে যাত্রী নিবাসে।

একটি প্রাচীরে বেষ্টিত ঝরণার জল দিয়ে তৈরী পুষ্করিণীতে স্নান করে, বাজার থেকে পূজার উপকরণ কলা, নারিকেল আর কিছু ফুল কিনে নিয়ে উপস্থিত হই মন্দিরের সামনে। সারা দক্ষিণ ভারতে লাগে এই একই পূজার উপকরণ।

কয়েকটি সোপান অতিক্রম করে মূল মন্দিরে প্রবেশ করি। পাণ্ডা পূজার

বন্দোবস্ত করেন, আমরা ভক্তিভরে পূজা ও আরতি দিয়ে, স্তম্ভের অঙ্গের নরসিংহ দেবের স্বরূপ দেখি, তার পর প্রদক্ষিণ শেষ করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। দেখি মন্দিরের রূপ। মূল মন্দিরকে বেষ্টন করে আছে একটি স্তম্ভ-যুক্ত অলিন্দ, তার দেওয়ালে আর স্তম্ভের অঙ্গে আছে বহু সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন, ক্ষোদিত আছে বহু দেব-দেবীর মূর্তিও। দেব-দেবীর মূর্তি দিয়ে শোভিত করা হয় মন্দিরের চূড়াকেও। যেমন সূক্ষ্ম, তেমনই সুন্দর। আছে চাতালের এক প্রান্তে একটি বৃহৎ রথ, নির্মিত একটি সম্পূর্ণ স্ফটিক পাথর কেটে।

দেখা যায় চাতালে একটি রক্তের দাগও, পাণ্ডা বলে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের রক্তের দাগ। একদিন শ্রীকৃষ্ণ পাহাড়ের উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। 'এক ব্যাধ দেখতে পেয়ে তীর ছোড়ে। বিদ্ধ হয় তীর শ্রীকৃষ্ণের পায়ে। পাহাড় থেকে নেমে শ্রীকৃষ্ণ এসে নরসিংহ দেবের আশ্রয় নেন। রক্তে লাল হয়ে যায় সমস্ত রাস্তা। আছে আজও তার একটু দাগ, স্মরণ করিয়ে দেয় এক পুরা কাহিনী।

লক্ষ্মী দেবীর পূজা দিয়ে আমরা একটি স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ ( সভাগৃহ ) দেখতে যাই। অনেকগুলি একই রকম স্তম্ভে এই ঘরটি শোভিত হয়ে আছে। অনবদ্য এই স্তম্ভের অঙ্গের শিল্প সম্ভার। সজ্জিত হয়ে আছে ঘরটি, একটি বিশাল রথে আর কাঠের হাতী ঘোড়াতে, আছে একটি স্বর্ণ নির্মিত গরুড়ও, শোভা বর্ধক অক্ষয় তৃতীয়ার দিনের দেবতার শোভাযাত্রার।

নির্মাণ করেন নাকি এই মন্দিরটি নিকটবর্তী বিজয়নগরের রাজারা, জানা যায় না কবে আর কে এই মন্দির নির্মাণ করেন।

সভাগৃহ দেখে কিছু খিচুড়ি আর লাড্ডুর প্রসাদ কিনে নিয়ে আমরা ফিরে আসি যাত্রী নিবাসে, সেখান থেকে ম্যানসানে। তখন বেলা দ্বিপ্রহর।

বিকেলে এক ঋষির আশ্রম দেখতে যাই। ট্যাক্সিতে অতিক্রম করি তের মাইল পথ। একটি অনতিপ্রশস্ত প্রবেশপথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, সারি সারি ঝাউ আর দেবদারু গাছের নীচে দিয়ে একেবারে সমুদ্রের কিনারায় উপস্থিত হই। সেখানে অর্ধচন্দ্রাকারে অনুপ্রবিষ্ট সাগর। বামে, সবুজ বৃক্ষে আচ্ছাদিত পূর্বঘাটের পর্বতমালা, দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত বালুতট, সম্মুখে বঙ্গোপ-সাগরের অসীম জলরাশি, পশ্চাতে আর মস্তকের উপর অসংখ্য ঝাউ আর দেওদার বৃক্ষ। তটের উপর এক শ্বেত মার্বেল স্তম্ভ, বুকে নিয়ে আছে 'সমস্ত

ধর্মের সারসূত্রগুলি, সমন্বয় সর্ব ধর্মের। তার পশ্চাতে বৃক্ষের অন্তরালে মন্দিরটি লুকিয়ে আছে, হয়ে আছে অদৃশ্য। মন্দিরের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি মাটির কুটির, বাসস্থান আশ্রম-বাসীর। সৃষ্টি হয় এক শান্তিময় পরিবেশ, সার্থক হয় প্রতিষ্ঠাতা দক্ষিণ ভারতের এক সাধুর দেওয়া নাম 'শান্তির আশ্রম'।

ফিরবার পথে দেখে আসি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়। বিজয়নগরের রাজাদের অর্থে স্থাপিত আর পরিচালিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ওয়ালটিয়ারের পাহাড়ের উপর প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে অবস্থিত। সম্মুখে অন্তহীন সমুদ্র, পশ্চাতে ঘন সবুজ বৃক্ষশ্রেণী, কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত লাল ইঁটের তৈরী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাড়িগুলি, আর ফুলে ভরতি উদ্যান, দেখে মুগ্ধ হয় মন।

এখানকার রামকৃষ্ণ আশ্রমও দেখি। একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুদ্র, শান্ত আশ্রমটি, আর অন্তহীন অশান্ত সাগর। ছুটে আসে সাগর ঠাকুরের পায়ে প্রণতি জানাতে, প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়, বিরামহীন এই আসা-যাওয়া।

পরের দিন ভোরে উঠে আর একবার দেখি সাগরের রূপ, দেখে হয় না পরিতৃপ্তি, মেটেনা আশ। প্রণাম জানিয়ে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হই। সেখান থেকে মাদ্রাজ মেলে চড়ে শ্যামলকোটে যাই। শ্যামলকোট থেকে ট্যাক্সি করে কৃষ্ণার খালের পাড় দিয়ে কাকিনাড়াতে উপনীত হই।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## কাকিনাড়া ঃ সর্পভয়মের মন্দির

এক রেস্ট-হাউসে এসে উঠি। পরের দিন ভোরে উঠে স্নান সেরে নিয়ে ট্যাক্সি করে দু'মাইল দূরে সর্পভয়মের মন্দির দেখতে যাই। ট্যাক্সি এসে থামে সরোবরের কিনারায়, এক মন্দিরের দরজায়। ফুটে আছে অসংখ্য পদ্মফুল সরোবরের বুকে, আলো করে আছে সরোবর।

এইখানেই নাকি পাণ্ডুবংশের পরীক্ষিতের পুত্র মহারাজা জন্মেজয় শৃঙ্গী মুনির শাপে, তক্ষকের দংশনে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সর্প-যজ্ঞ করেন। তারপর যজ্ঞ শেষ হলে এই সরোবরে স্নান করেন, তারই স্মৃতি বহন করে আছে সর্পভয়মের মন্দির আর এই সরোবর, হয়ে আছে মহাপবিত্র।

আবার এই সরোবরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে নাকি প্রাণত্যাগ করেন নারদ-ঋষি। বিবাহের বাসনা জাগে ঋষির মনে। তিনি জন্ম নেন এক ব্রাহ্মণের ঘরে। বিবাহ করেন, জন্মায় অনেক সন্তানসন্ততি। বিস্মৃত হন তিনি দেবলোকের কথা, নিমগ্ন থাকেন সংসারের সুখে দুঃখে।

শেষে একদিন ভিখারীর বেশে তাঁর দ্বারে ভগবান উপস্থিত হন, কথার ছলে তাঁকে জানান দেবলোকের কথা। অনুতাপে দগ্ধ হয় নারদের চিত্ত, স্বর্গে ফিরে যাওয়ার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যাকুল করে তাঁর মন। ভগবানের নির্দেশে এই সরোবরে তিনি প্রাণ বিসর্জন করেন। তাই মহাপবিত্র এই সরোবরের জল।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে সরোবরের পবিত্র জল স্পর্শ করে, আমরা প্রবেশ করি সর্পভয়মের মন্দিরে। প্রবেশপথেই দেখি এক গোপুরম্। ২৫ থেকে ৩০ ফিট উঁচু, এই গোপুরমটি অঙ্গে নিয়ে আছে দেব-দেবীর মূর্তি। বেশ সুষ্ঠু গঠন এই মূর্তিগুলির, পরিচয় প্রকৃষ্ট অন্ধ্র স্থাপত্যের।

গোপুরম দেখে আমরা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করি। পাশাপাশি দুইটি বিগ্রহ আছে, একটি নারায়ণের অপরটি লক্ষ্মীদেবীর। পূজারী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় মন্দিরের আর বিগ্রহের পরিচয় দেন, বলেন সত্যযুগ থেকেই এই বিগ্রহ এখানে পূজিত। পূজা দিয়ে বেরিয়ে এসে পাশের মন্দিরটি দেখতে যাই।

এইটিই নারদের মন্দির। অপেক্ষাকৃত বড় এই মন্দিরটি। পূজিত হন এই মন্দিরে নারদ ঋষি।

মন্দির দেখে আমরা ফিরে আসি রেস্ট-হাউসে। সেখান থেকে দেড়টার ট্রেন ধরে শ্যামলকোটে। যুক্ত হয় আমাদের গাড়ি মাদ্রাজ মেলের সঙ্গে।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় রাজামুন্দ্রি ষ্টেশন পেরিয়ে আমাদের গাড়ি এসে থামে গোদাবরীতে, সেতুর প্রান্তে। তখন অপরাহ্ণের লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তে, লাল হয়ে যায় এপারের গোদাবরীর গর্ভের বাড়ির শীর্ষদেশ। লাল হয় গোদাবরীর বুক আর ওপারের সবুজবৃক্ষশ্রেণীর শীর্ষদেশ। লাল হয়ে যায় বৃক্ষের অন্তরালে দূরের বাড়িগুলিও। মনে হয় এসে পড়েছি এক স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশে। পুণ্যতোয়া গোদাবরী, বুকে নিয়ে আছে শ্রীরামচন্দ্রের কত অসংখ্য স্মৃতি, হয়ে আছে মহাপবিত্র। তাই প্রণাম জানাই গোদাবরীকে জানাই রঘুবীরকেও।

রাত্রি দশটায় আমাদের ট্রেন বেজোয়াদা ( বিজয় ওয়াড়া ) ষ্টেশন ছাড়ে। খাওয়া সেরে নিয়ে ট্রেনে কৃষ্ণার উপরকার সেতু অতিক্রম করবার অপেক্ষায় বসে থাকি। কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না—হতে হয় নিরাশ। শেষে শয্যায় আশ্রয় নেই।

একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙ্গে। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে এসে জানলার ধারে বসি। দেখি বহুদূরে দেখা যায় এক বিস্তীর্ণ জলরাশি, সমুদ্রই বুঝি, কিন্তু সমুদ্র নয়, খাঁড়ি। ক্রমে এগিয়ে আসে খাঁড়ি। হঠাৎ প্রশমিত হয় গাড়ির গতি, ধীরে, অতি ধীরে, আমাদের ট্রেন প্রবেশ করে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশনে, তখন সকাল আটটা।

প্লাটফর্মে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন গুহরায়, আমার ভ্রাতা শৈলেন লাহিড়ীর এক বন্ধু। জিনিসপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে উপস্থিত হই শৈলেনের বাসাতে, ত্যাগরাজনগরে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## দ্রাবিড়স্থান

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### মাদ্রাজ শহর ঃ

১। কাপালির মন্দির, ২। পার্থসারথির মন্দির।

ট্যাক্সি শৈলেনের বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। ছুটে এসে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করে শৈলেন, তার উচ্ছ্বসিত হাসি উচ্ছলিত করে চারিদিক। তার পেছনে আসেন ভ্রাতৃবধূ, তিনিও হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন। শৈলেনের তিন ভ্রাতুষ্পুত্রও ছুটে আসে। ট্যাক্সি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে, ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করি। হঠাৎ বুক পকেটের দিকে নজর পড়ে, দেখি, নেই চশমা জোড়া, খুব সম্ভব ফেলে এসেছি সেটাকে ট্রেনের কামরায়, পড়ে যেতে পারে ট্যাক্সির ভিতরেও লুকিয়ে থাকতে পারে সিটের অন্তরালে। কিন্তু তখন উধাও হয়েছে ট্যাক্সি, ট্রেনও প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে গিয়েছে। তাই সম্ভব নয় তাকে উদ্ধার করা। দ্বিতীয় চশমা জোড়াটি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

হাতমুখ ধুয়ে চা ও জলযোগ করতে বসেছি এমন সময় একে একে হাজির হন পাশের বাড়ির প্রবীণ সেন মহাশয় ও সেন গৃহিণী, আসেন নবীন মিঃ ব্যানার্জি সঙ্গে নিয়ে মিসেস্ ব্যানার্জিকে, আসেন গুহরায়-ও। তাঁরা সকলেই মাদ্রাজ প্রবাসী, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত শৈলেনের বন্ধু। অবগত তাঁরা আমাদের মাদ্রাজে পৌঁছাবার দিন আর ক্ষণের, তাই বিলম্ব সয় না তাঁদের দাদা-বৌদিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার।

সমস্ত দুপুর আমাদের ভ্রমণসূচী তৈরীর কাজে অতিবাহিত হয়। সরকারের কাজে শৈলেন দীর্ঘ চোদ্দ বছর মাদ্রাজে কাটিয়েছে, তখন সে বোম্বাইতে বদলি হয়েছে, কিন্তু কাটাতে পারে নাই মাদ্রাজের মায়া, বাস করেন সেখানে তাঁর স্ত্রী আর ভাইপোরা। সেও এখানে এসে কাটিয়ে যায় দীর্ঘ ছুটীর অবসর। তখন সে মাদ্রাজে ছুটীতে আছে। কার্যোপলক্ষ্যে সে সারা মাদ্রাজ ভ্রমণ করেছে। তাছাড়া মাদ্রাজে এমন কোন বড় শহর নাই, যেখানে তার একজনও বন্ধু নাই।

প্রস্তুত হয় এক বিস্তৃত সূচী, তারপর আমাদের সেই সব স্থানে পৌছবার দিন ও ক্ষণ জানিয়ে বন্ধুদের কাছে চিঠি লেখা হয়।

চিঠি লেখা শেষ হয়, এগিয়ে আসে অপরাহ্ণ. আমরা একটি ট্যাক্সি নিয়ে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ি।

প্রথমে এডিয়ারে যাই। বঙ্গোপসাগর আর এডিয়ার নদীর সংযোগস্থলটিই এডিয়ার নামে পরিচিত। প্রকৃতির এক সুন্দরতম লীলাভূমি এডিয়ার। স্থাপিত হয়েছে এখানে থিয়োজফিকাল সোসাইটীর প্রধান কেন্দ্র। ঘনপল্লবে বেষ্টিত হয়ে সোসাইটীর বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে এক অলৌকিক পরিবেশে। আছে একটি লাইব্রেরীও, তাতে আছে নানাভাষার অসংখ্য বই, আছে সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা আর প্রধান কর্মকর্তাদের তৈলচিত্রও।

এডিয়ার দেখে আমরা মায়লাপুরের কাপালি মন্দির দেখতে যাই। একটি অতি সুন্দর গোপুরমে শোভিত করা হয় মন্দিরের প্রবেশদ্বার, আছে তার অঙ্গে প্রকৃষ্টতম দ্রাবিড়ী শিল্পসম্ভার, আছে কত দেব-দেবীর মূর্তিও। আমরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ গোপুরমের অঙ্গের কারুকার্য দেখে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ করি। শৈব মন্দির, বিগ্রহ কপিলেশ্বর। পূজা দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি।

## ২

সেখান থেকে আমরা ট্রিপ্লিকেন-এ যাই। সেখানে মন্দিরে বিরাজ করেন পার্থসারথি। ট্যাক্সি অতিক্রম করে মাদ্রাজের সমুদ্র সৈকত। ভারতের সুন্দরতম আর দীর্ঘতম এই সৈকত, তার এক পাশে শোভা পায় প্রাসাদের মত সুন্দর অট্টালিকা, সেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ আছে, আছে স্থাপত্য বিদ্যা শিক্ষালয়, আছে অনেক সরকারী দপ্তরও, অপরদিকে দিগন্তবিস্তৃত বঙ্গোপসাগর, অবিরাম গর্জনে লুটিয়ে পড়ে তীরের উপর।

সৈকত অতিক্রম করে আমরা পার্থসারথির মন্দিরে উপনীত হই। বিষ্ণু মন্দির, বিগ্রহ পার্থসারথি। এই মন্দিরটির প্রবেশ পথেও আছে একটি সুন্দর গোপুরম উৎকৃষ্ট দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন বুকে নিয়ে আছে। ক্ষোদিত আছে

মূর্তিও তার অঙ্গে, মূর্তি—বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের, মূর্তি আরও কত দেব-দেবীর। সুন্দর তাঁদের গঠন সৌষ্ঠব, দেখে বিস্ময় জাগে মনে। কাপালির মন্দিরের মত, এখানেও একটি সভাগৃহ আছে। আমরা গোপুরম দেখে, সভাগৃহ দেখতে যাই। তার পর প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মন্দিরের দরজায় উপস্থিত হই। পূজা দিয়ে ফিরে আসি গাড়িতে, ফিরে আসি সৈকতে, বসে বসে দেখি কিছুক্ষণ সমুদ্রের অপরূপ শোভা। তার পর বাড়িতে ফিরে আসি, তখন রাত্রির অন্ধকারে দিগন্ত ছেয়ে ফেলে।

দেখি ইতিমধ্যেই সমাগত হয়েছেন বহু বাঙ্গালী ভদ্রলোক আর ভদ্র-মহিলা, তাঁদের উচ্ছল হাসিতে মুখর হয়েছে বাড়ি। শুনি তাঁরা সকলেই নিমন্ত্রিত, উপলক্ষ্য আমাদের মাদ্রাজ আগমন। ভ্রাতা-কলকণ্ঠে একে একে বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। আবার হাসিতে উচ্ছলিত হয় চারি-দিক। কিছুক্ষণ পরে সুরু হয় খাওয়ার পালা, আবার সমস্ত বাড়ি হাসিতে আর কলধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। শেষে একে একে বিদায় নেন তাঁরা।

তার পরের দিন থেকে সুরু হয় আমাদের নিমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ দুপুরে রাত্রিতে, সকালে বিকেলেও। নিমন্ত্রণ ত নয়, এক মহা আনন্দের মিলন। আশ্চর্য চরিত্র এই শৈলেনের, কল-কণ্ঠে কথা বলে, উচ্ছলিত হাসিতে বিদীর্ণ করে গগন। বয়স্কদের লাহিড়ী মহাশয়, ছোটদের দাদা, প্রিয় সকলের। অনুরূপ তার সঙ্গী আর সঙ্গিনীর, তার বন্ধু আর বান্ধবীরদলও। তারা উদাত্ত কণ্ঠে কথা বলে, উচ্ছল হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে উদার তাদের অন্তঃকরণ, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন, সম্পদের সহচর, বিপদের বন্ধু। মাত্র ন'দিন তাদের সাহচর্য পেয়েছিলাম কিন্তু তার স্মৃতি আজও মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে আছে, হয় নাই ম্লান। তাই যেদিন তাদের কাছে বিদায় নিয়ে মাদ্রাজ পরিত্যাগ করি, সেদিন এক অসহনীয় বিয়োগ ব্যথায় ভরে যায় বুক, আচ্ছন্ন করে মন, অবশ হয় দেহ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### কাঞ্চী-পুরম ঃ

১। একাম্বরনাথের মন্দির, ২। কৈলাসনাথের মন্দির,
৩। বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির, ৪। ভরদ্বাজ স্বামীর মন্দির।

পরের দিন ভোর না হ'তেই মোটরে করে রওনা হই কাঞ্চী-পুরম অভিমুখে।

দেখতে যাই শিব বা বড় কাঞ্চীতে একাম্বরনাথ ও কৈলাসনাথের মন্দির, আর বিষ্ণু বা ছোট কাঞ্চীতে বৈকুণ্ঠ পেরুমলের আর ভরদ্বাজ স্বামীর মন্দির। পথে পড়ে শ্রীপ্রেমেন্দুরে বৈষ্ণমাচার্য রামানুচার্যের জন্মস্থান। রেলগাড়িতে চড়েও যাওয়া যায়, যায় বাসে করেও। আছে দুইটি সুন্দর পীচের রাস্তা একটি কাঞ্চী-পুরম হয়ে তিরুচুরাপল্লী পর্যন্ত যায়, পথে শ্রীপ্রেমেন্দুর পড়ে। দ্বিতায়টি চিঙ্গেলপেট হয়ে কাঞ্চী-পুরম পর্যন্ত যায়, আমরা প্রথমটি দিয়ে যাই, দ্বিতীয়টি ধরে ফিরি। যেতে হয় প্রায় ৪৫ মাইল।

অনেকগুলি ছোট-বড় রাস্তা অতিক্রম করে আমাদের মোটর শহরের প্রান্তদেশে, এডিয়ার নদীর তীরে, এসে পৌছায়। এখানে এসেই এডিয়ার বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মেশে। রাস্তার উপর থেকেই সঙ্গমস্থল দেখা যায়। সুবিশাল এডিয়ারের বুকের উপর একটি সেতু নির্মিত হয়। ওপারে এডিয়ারের কিনারা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ বৃক্ষশ্রেণীতে বেষ্টিত হয়ে থিওজফিকাল সোসাইটীর প্রধান কেন্দ্র, বিস্তৃত হয়ে আছে সঙ্গমস্থল পর্যন্ত। সম্মুখে, দক্ষিণে এডিয়ার, বামে দিগন্তপ্রসারী বঙ্গোপসাগর সৃষ্টি করে এক অলৌকিক পরিবেশ, মুগ্ধ হই দেখে। গাড়ি সেতু অতিক্রম করে চলে।

রাস্তার দু'পাশে দেখা যায় সবুজ ধানের ক্ষেত দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। মাঝে মাঝে দেখা যায় তালকুঞ্জ, দাঁড়িয়ে আছে নিজের স্বরূপে, দেখা যায় কলাগাছের শ্রেণী, দেখি নারিকেল কুঞ্জও। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আরও কয়েকটি ছোট-বড় স্রোতস্বিনী অতিক্রম করে মোটর শ্রীপ্রেমেন্দুরের মন্দিরের দরজায় এসে থামে।

মোটর থেকে নেমে গোপুরমের ভিতর দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি। দেখি দরজার পাশে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে একজন পুরোহিত বসে আছেন। তাঁর কাছে শুনি, নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি হারীত রাজা, হারীত পুত্র বা হারীতের বংশধর বলে দক্ষিণ ভারতের মহাপরাক্রমশালী চালুক্য রাজারা নিজেদের পরিচয় দিতেন। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে একটি ছবি, চিত্র এক পুরাকাহিনীর।

মৃত্যু হয় সূর্যবংশের রাজা ভরতের। খাণ্ড অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁর পুত্র দণ্ড, মহা অত্যাচারী, উৎপীড়ন করেন প্রজাদের। রাজার কানে আসে তাঁর অত্যাচারের কাহিনী, পুত্র হন নির্বাসিত, বনে গিয়ে বাস করেন। ক্রমে সেই বনের মধ্যে এক নগর গড়ে ওঠে, পরিচিত হয় দণ্ডকারণ্য নামে। শুক্রমুনি সেই বনে এসে বাস করেন, সঙ্গে আসেন তাঁর পরম রূপবতী যুবতী কন্যা অজা। দণ্ড শুক্রের বাড়িতে অধ্যয়ন করতে যান প্রতিদিন, অনুরক্ত হয় অজার প্রতি, মুগ্ধ হন তার রূপে।

একদিন অরণ্যের এক নিভৃততম প্রদেশে একাকী পুষ্প চয়ন করেন অজা, এমন সময় দণ্ড এসে প্রেম নিবেদন করেন। অজা বাধা দেন, বলেন "তুমি পিতৃশিষ্য ভাইয়ের সমান, তোমার সাজে না এমন ব্যবহার।" বলেন "যদি সত্যিই তোমার মনে আমাকে বিবাহ করবার বাসনা জেগে থাকে তবে আগে পিতার অনুমতি নাও।"

বিশ্বাস হয় না দণ্ডের, থাকে না ধৈর্য, মানেন না তিনি সম্বন্ধের বিচারও, জোর করেই প্রেম নিবেদন করেন, চরিতার্থ করেন পাশববৃত্তি।

তপস্যা শেষে শুক্র বাড়িতে ফিরে আসেন, অজা দণ্ডের বর্বরোচিত আচরণের কথা তাঁকে বলেন, জানান নিজের অপরিসীম লজ্জার কথাও, অশ্রুজলে তাঁর বুক ভেসে যায়। এমন সময় পুস্তক হাতে নিয়ে সেখানে দণ্ড উপস্থিত হন। সারাদিনের উপবাসে ক্লিষ্ট দেহ আর মন, তার উপর কন্যার এই দারুণ অপমান, ক্ষিপ্ত হন ঋষি, তাঁর চক্ষু দিয়ে নির্গত হয় রোষের বহ্নি। দণ্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন "যে বংশে এমন কুপুত্র জন্মগ্রহণ করে, ধ্বংস হোক সেই বংশ, নির্বংশ হোক খাণ্ড রাজা।"

দেখতে দেখতে ভস্মে পরিণত হন দণ্ড, অযোধ্যাতে মৃত্যুবরণ করেন

রাজা খাণ্ডও, নির্বংশ হয় সূর্যবংশ। প্রজাদের অনুরোধে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন বশিষ্ঠ মুনি। তিনি পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন করেন, সুখের আর শান্তির হয় তাদের জীবন।

কিন্তু বশিষ্ঠের ভাল লাগে না রাজসিংহাসন, বিঘ্ন হয় জপ-তপেরও। তিনি ধ্যানে অবগত হন অজ্ঞার গর্ভেই আছে একটি পুত্র, আছে সূর্যবংশের এক নন্দন। তিনি শুক্রের কাছে গিয়ে জানান সেই সংবাদ, বলেন এসেছি আমি অজ্ঞাকে নিতে, নিয়ে যাব অযোধ্যায়। তার গর্ভের পুত্র হবে রাজা, অলঙ্কৃত করবে অযোধ্যার সিংহাসন।

হৃষ্টমনে শুক্র দেন অনুমতি। বশিষ্ঠের সঙ্গে অজ্ঞা অযোধ্যায় যান। কিছুদিন পরে তিনি এক পরম রূপবান্ পুত্র প্রসব করেন, বংশধর সূর্যবংশের। এক বছর বয়সে বশিষ্ঠ তাঁকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসান। খ্যাতিলাভ করেন সেই পুত্র হারীত নামে, হন হারীত রাজা।

এই মন্দিরেই, প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে, এক খড়ের ঘরে জন্ম নেন শ্রীরামানুচার্য এক মহামানব। পনর মাইল দূরে কাঞ্চী-পুরমে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তখন কাঞ্চী-পুরম দক্ষিণ ভারতের এক প্রখ্যাত নগর ছিল, ছিল দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আর সংস্কৃতির কেন্দ্র, পরিচিত ছিল দক্ষিণের বারাণসী নামেও। সেইখানেই বিষ্ণু কাঞ্চীতে তিনি এক বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন, ব্রীহিষ্টাদি বিদ্যালয় নামে পরিচিত সেই বিদ্যাপীঠ। যেখান থেকে তাঁর বাণী প্রচার করেন। ছড়িয়ে পড়ে সেই বাণী দিকে দিকে। প্রতিধ্বনিত হয় সারা দক্ষিণ ভারতের আকাশে বাতাসে, শেষে দক্ষিণ ভারত অতিক্রম করে উত্তর ভারতেও প্রবেশ করে। আজ তাঁর জন্মস্থানে তাঁর ভক্তেরা নির্মাণ করেছেন একটি স্মৃতিসৌধ। আসেন এখানে রামানুজ-পন্থীরা, আসেন দলে দলে, নিবেদন করেন শ্রদ্ধার অঞ্জলি, ডালি উজাড় করে দেন।

আমরাও সেই স্মৃতিসৌধ দেখি। আছে সেই ঘরের ছাদে বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি, অঙ্কিত করেন চিত্রশিল্পী। আচার্যশ্রেষ্ঠকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠি। কাঞ্চী-পুরম অভিমুখে গাড়ি চলে ষাট মাইল গতিতে।

রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছ, দেখা যায় তার ফাঁক দিয়ে রুক্ষ মাঠ,

নাই তাতে সবুজের লেশ। কিছু দূর অতিক্রম করি, দেখি একটি রেখা, অঙ্কিত আছে দিগন্তের অঙ্কে। ড্রাইভার বলে ঐটিই শিবকাঞ্চীর একাম্বর নাথের মন্দিরের গোপুরম। গাড়ি এগোতে থাকে, স্পষ্টতর হতে থাকে রেখাও, নিতে থাকে গোপুরমের রূপ, শেষে হয় স্পষ্টতম। পরিদৃশ্যমান হয় এক সম্পূর্ণ সুউচ্চ গোপুরম।

অবশেষে বাঁদিকে মোড় নিয়ে গাড়ি কাঞ্চী-পুরমের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে।

কাঞ্চী-পুরমের ইংরাজের দেওয়া নাম কন্‌জিভরম। কন্‌জিভরম মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির একটি জেলার সদর।

উত্তরে বিন্ধ্যপর্বত, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বরম আর কন্যাকুমারিকা, এই বিস্তৃত অঞ্চলটি দক্ষিণ ভারত নামে পরিচিত।

তপনদেব পর্বত প্রধান সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করেন। বিন্ধ্যর মনেও বাসনা জাগে, তাঁকেও প্রদক্ষিণ করেন সূর্যদেব। তিনি সূর্যকে মনের অভিলাষ জানান। দিবাকর বলেন, "আমি সৃষ্টিকর্তার নির্দিষ্ট পথে চলি, সাধ্য নাই অন্যপথে যাওয়ার। বিন্ধ্য ক্রুদ্ধ হন, বিস্তৃত হতে থাকে তাঁর কলেবর, শেষে স্পর্শ করে আকাশ। রুদ্ধ হয় পৃথিবীতে যাতায়াতের পথ। প্রবেশ করতে পারেন না দিবাকর। সক্ষম হন না চন্দ্রদেবও। অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে ফেলে। হয় বুঝি মহাপ্রলয়। সকল দেবতা এসে স্তুতি করেন বিন্ধ্যকে। কিন্তু তিনি শোনেন না কারও অনুরোধ, নোয়ান না মাথা। তখন তাঁরা অগস্ত্য মুনির কাছে ধর্ণা দেন, তিনিই শুধু সক্ষম এই বিপদে উদ্ধার করতে, রক্ষা করতে সৃষ্টি। সম্মত হন অগস্ত্য, উপনীত হন বিন্ধ্যর কাছে। বিন্ধ্য হন অবনত মস্তক। প্রণাম জানান মুনিবরকে। মুনি বলেন, "চলেছি আমি দক্ষিণদেশে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এইভাবেই থাক।" মুনি আর ফেরেন না, বিন্ধ্যও মুনির আদেশ লঙ্ঘন করতে পারেন না। থাকেন অবনত মস্তকে। উন্মুক্ত হয় উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়ার পথ, হয় সুগম। ক্রমে সেই পথ দিয়েই প্রবেশ করে উত্তরের আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি দক্ষিণে দ্রাবিড়স্থানে। মিলন হয় উত্তরে দক্ষিণে, আর্যে দ্রাবিড়ে।

শ্রীরামচন্দ্রও গোদাবরী নদী পার হয়ে দক্ষিণে উপনীত হন। বানরসৈন্যের

সাহায্যে সেতুবন্ধে এক সেতু নির্মাণ করেন। সেই সেতু অতিক্রম করে লঙ্কায় উপস্থিত হন। লঙ্কার রাজা রাবণকে হত্যা করে উদ্ধার করে আনেন সীতা-দেবীকে। ফিরবার পথে তিনি এপারে সমুদ্রতীরে পুষ্পকরথ থেকে অবতরণ করেন। সেখানে সীতাদেবী প্রতিষ্ঠা করেন এক শিব। পরিচিত হন সেই শিব 'রামলিঙ্গেশ্বরম' নামে, রামেশ্বরম নামে পরিচিত হয় স্থানটিও। পরিণত হয় এক মহাতীর্থে। মহাতীর্থে পরিণত হয় সেতুবন্ধও। শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে আসেন, কিন্তু থেকে যায় আর্যসভ্যতা আর সংস্কৃতি দক্ষিণে।

খ্রীঃ পূঃ ২৬৯ অব্দে মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোক। তিনি পরাজিত করেন কলিঙ্গদেশের রাজাকে, বিস্তৃত হয় তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মহীশূরে আবিষ্কৃত হয় একটি অশোকের শিলালিপি, নাম আছে তাতে সত্যপুত্র বা সাতকরণীর, নাম আছে চোল পাণ্ড্য আর কেরলপুত্রের বা চেরদের। তাঁরা সকলেই দক্ষিণ-ভারতের স্বাধীন রাজা, বিস্তৃত তাঁদের রাজ্যের সীমানা গোদাবরী থেকে কুমারিকা পর্যন্ত।

অস্তমিত হয় উত্তর ভারতে মৌর্যক্ষমতা, প্রবল হন চেতবংশ কলিঙ্গদেশে, অন্ধ্র বা সাতবাহনেরা দক্ষিণ ভারতে।

মহাপরাক্রমশালী কলিঙ্গ, বিস্তৃত তাদের রাজ্য গোদাবরীর উত্তর পার পর্যন্ত। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা খারবেল, এক দিগ্বিজয়ী বীর, জয় করেন পশ্চিমে নাসিক নগরের অধিবাসীদের, দক্ষিণে রথিক আর ভোজকদের। অন্ধ্র আর তামিল দেশেও আধিপত্য বিস্তার করেন। পরাজয় স্বীকার করতে হয় পাটলীপুত্রের রাজা পুষ্যমিত্রকেও। হাতিগুম্ফার শিলালিপিতে লেখা আছে তাঁর কীর্তির কাহিনী।

মহাপরাক্রমশালী হন অন্ধ্র বা সাতবাহনেরাও। প্রাচীনতমজাতি এই অন্ধ্র, তাদের নাম লেখা আছে উপনিষদে, মেগাস্থিনিসের বিবরণে, আর অশোকের শিলালিপিতে। দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে তাঁরা বাস করেন, একদিকে তার এখনকার ঔরঙ্গাবাদ জেলা অপরদিকে কৃষ্ণা। গোদাবরী-তীরে প্রতিষ্ঠানে তাঁদের রাজধানী। পুরাণে লেখা আছে সুঙ্গদের পরাজিত করে খৃষ্টপূর্ব

প্রথম শতাব্দীতে সিমুক স্থাপন করেন এইরাজ্য। সিমুকের পৌত্র শাতকর্ণী সাতবাহন এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। মহাপরাক্রমশালী তিনি, জয় করেন, বিদিশা আর উজ্জয়িনী, দক্ষিণাপতি উপাধি লাভ করেন, হন সার্বভৌম রাজা দক্ষিণ ভারতে। ১০৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানের সিংহাসনে গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী অধিরোহন করেন। তিনিই সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা, পরাজিত করেন শক রাজা নহপনাকে, জয় করেন মহারাষ্ট্র আর মালব, অধিকার বিস্তার করেন কঙ্কনে, বিদর্ভে আর সৌরাষ্ট্রে। মালব থেকে কর্ণাট পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হয়। রাজধানী স্থাপিত হয় কানাড়া জেলায় বৈজয়ন্তীতে আর গুনটুরের কাছে অমরাবতীতে। যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণী, এই বংশের শেষ পরাক্রমশালী রাজা, শক রাজাকে পরাজিত করে হৃতরাজ্য উজ্জয়িনী উদ্ধার করেন। মৃত্যু হয় যজ্ঞশ্রীর, অস্তমিত হতে থাকে সাতবাহনদের ক্ষমতা, শেষে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে একেবারে অন্তর্হৃত হ'য়ে যায়। ইক্ষাকুদের অভ্যুত্থান হয় কৃষ্ণা আর গোদাবরী জেলায়, বাকাটকদের নাসিকে আর বেরারে, বৈজয়ন্তীর কদম্বদের উত্তর কানাড়ায় আর পল্লবদের কাঞ্চীতে।

সাতবাহনেরা দক্ষিণভারতে একাদিক্রমে প্রায় চারি শত বৎসর প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করেন, হন দক্ষিণভারতের সার্বভৌম সম্রাট, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় তাঁদের রাজধানী, প্রচারিত হয় আর্য সভ্যতা দক্ষিণে, দ্রাবিড়স্থানে। মিলন হয় আর্যে দ্রাবিড়ে। নির্মিত হয় অনবদ্য বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য, বিহার "রেল" (গরাদে) আর স্তম্ভ বিরাটে, অমরাবতীতে, নাসিকে আর বিদিশাতে। তাঁরাই নির্মাণ করেন সাঁচীর অপরূপ তোরণ। সবগুলিই শ্রেষ্ঠ কীর্তি বৌদ্ধ স্থপতির, নিদর্শন এক গৌরবময় সৃষ্টির। অমর হয় শিল্পীরা, অমর হন সাতবাহন রাজারা, গৌরবান্বিত হয় ভারতবর্ষ, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে।

অস্তমিত হন অন্ধ্র সাতবাহন, পল্লবেরা হন প্রবল দক্ষিণভারতে, গড়ে তোলেন এক বিশাল সাম্রাজ্য। কাঞ্চীপুরমে তার রাজধানী স্থাপিত হয়। সম্পর্কিত তাঁরা বেলারির শাসনকর্তার, ছিলেন সাতবাহন রাজাদের অধীনে।

শিবস্কন্দ বর্মন, প্রথম বিখ্যাত রাজা এই বংশের, বিস্তার করেন রাজ্যের সীমানা, হন সার্বভৌম রাজা।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন সিংহবিষ্ণু, এক মহা পরাক্রমশালী রাজা। তিনি পরাজিত করেন চের, চোল, পাণ্ড্য আর সিংহলের রাজাকে, এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তাঁর পুত্র মহেন্দ্র বর্মণ, অধিকারী বহুমুখী প্রতিভার, রচনা করেন 'মত্তবিলাস' এক অপূর্ব নাটক, প্রতীক তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের। তিনি উৎসাহ দেন সংগীতের, নির্মাণ করেন বহু মন্দির তিরুচুরা পল্লীতে, অপরূপ শিল্পসম্ভারে শোভা পায় তাদের অঙ্গ। তাঁর পুত্র নরসিংহ বর্মণ মহামল্লম, রাজত্ব করেন ৬২৫ থেকে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনিই পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। পরাজিত আর বধ করেন চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীকে। অধিকার করেন তাদের রাজধানী বাতাপি বা বাদামি। বাতাপি কোণ্ড্র উপাধীতে ভূষিত হন। বিস্তার করেন তাঁর অধিকার উত্তরে তুঙ্গভদ্রা থেকে দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত। হন দক্ষিণ ভারতের সার্বভৌম রাজা। মহাসমৃদ্ধিশালী হন পল্লবেরা, পরিণত হয় রাজধানী কাঞ্চীপুরম এক মহাসমৃদ্ধিশালী নগরে, হয় সংস্কৃতি আর শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে। নরসিংহ বর্মণ মহামল্লমই রাজধানী কাঞ্চীপুরম থেকে ৪০ মাইল দূরে, পালার নদী আর বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে স্থাপন করেন এক বন্দর; পরিচিত হয় সেই বন্দর তার নাম অনুসারে মামাল্লাপুরম নামে। ক্রমে এই বন্দর দক্ষিণভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হয়।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চালুক্যবংশের দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাঞ্চীপুরম অধিকার করেন। অস্তমিত হ'তে থাকে পল্লবদের ক্ষমতা, শেষে একেবারে অন্তর্হত হ'য়ে যায়। ৮৬২ খৃষ্টাব্দে শেষ পল্লব রাজা অপরাজিত বর্মণ চোলরাজা আদিত্যের কাছে পরাজিত হন।

১৩১০ খৃষ্টাব্দে পতন হয় চোলবংশের, কাঞ্চীপুরম মালিক কাফুরের অধিকার ভুক্ত হয়। দিল্লীর মুসলমান সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির অধীনে আসে। মহাপরাক্রমশালী হন বিজয় নগর দক্ষিণ ভারতে, রাজত্ব করেন প্রবল প্রতাপে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত, কাঞ্চীপুরম থাকে বিজয় নগরের অধিকারে ১৩৬৮ থেকে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

গোলকুণ্ডার মুসলমান নবাব ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে অধিকার করেন কাঞ্চী। আসে কাঞ্চী কিছুদিনের জন্য মারাঠাদের অধিকারেও। মোগল সম্রাট

ঔরঙ্গজেব জয় করেন কাঞ্চী। শেষে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ক্লাইভ অধিকার করেন এই নগর।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চীপুরম স্বাধীন ভারতের অধীনে আসে, ফিরে পায় পূর্ব গৌরব।

পল্লবেরাই আদি স্রষ্টা দ্রাবিড় স্থানের মান্দরের, স্রষ্টা দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় স্থাপত্যেরও। নির্মাণ করেন পাহাড় কেটে মন্দির মহাবলীপুরমে, নির্মিত হয় পাথর দিয়ে তৈরী মন্দিরও, নির্মাণ করেন মহাবলীপুরমে, রাজধানী কাঞ্চীপুরমে, আর তার আশে পাশে। নির্মিত হয় মন্দির তাঞ্জোরে আর পুডু কোটাইতেও।

উত্তরাধিকারী তাঁরা সাতবাহনদের, দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করেন প্রবল প্রতাপে সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত। সাতবাহনদের সময়েই বৌদ্ধ স্থাপত্য লাভ করে চরম উৎকর্ষ, উপনীতহয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, তারই অনুকরণে পল্লব রাজারা গড়ে তোলেন এক অভিনব স্থাপত্য, গড়ে উঠে দাবিড় স্থাপত্য, দ্রাবিড় মন্দির, শোভা পায় সারা দ্রাবিড় স্থানে। অমর হন পল্লব রাজারা ইতিহাসের পাতায়।

৬৪১ খৃষ্টাব্দে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্ স্যাং এই শহর দেখতে আসেন। তিনি কাঞ্চীপুরমকে এক মহাসমৃদ্ধিশালী নগর বলে বর্ণনা করেন। তখন ছিল নাকি এখানে একশত সংঘারাম বা বৌদ্ধ বিহার, বাস করতেন সেই সব বিহারে দশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু, ছিল এখানে ৮০টি হিন্দুমন্দিরও, শোভা করে ছিল কাঞ্চীর বুক। জন্ম নেন এখানে বোধিসত্ত্ব ধর্মপাল, সমসাময়িক বুদ্ধ ঘোষের। দীক্ষা নেন জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য। স্থাপন করেন এক মহাবিদ্যাপীঠ বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ। আবির্ভাব হয় এখানে বহু বৈষ্ণব আচার্য আর শৈব সাধকের। পরিণত হয় কাঞ্চী ভারতের সভ্যতা আর সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে। পরিণত হয় এক মহাতীর্থে, সমপর্যায়ে পড়ে আরও ছয়টি মহাতীর্থের,-- বারানসীর, হরিদ্বারের, অযোধ্যার মথুরার,উজ্জয়িনী আর দ্বারকার। আসে দেশ বিদেশ থেকে যাত্রী, আসে সিংহল থেকে, আসে জাভা থেকে, আসে সুমাত্রা আর মালায়া থেকেও, ধন্য হয় দেখে। ফিরে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় ভারতের সভ্যতা, ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের কৃষ্টি।

কাঞ্চীপুরমে বাস করেন আমার ভাই-এর এক বন্ধু, এক তামিল ব্রাহ্মণ। নিযুক্ত তিনি 'বার্মাসেলের' কাজে। স্থির হয় উঠবো গিয়ে তাঁর শিবকাঞ্চীর বাসায়, তিনিই সঙ্গে করে মন্দির দেখাবেন।

মোটর তাঁর বাসার সামনে গিয়ে থামে। এক প্রসন্ন বয়ান সৌম্য দর্শন, প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন। আমাদের মোটর থেকে নামিয়ে তাঁর দোতলার ঘরে নিয়ে যান। ভারী পরিচ্ছন্ন এই ঘরটি, শীতলও, আমাদের শরীর জুড়িয়ে যায়, দূর হয় রাস্তার ক্লান্তিও। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, তাকে সঙ্গে নিয়ে একাম্বর নাথের মন্দির দেখতে যাই। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি শহরের বুকের উপর, এক ঘন নারিকেল বীথি দিয়ে বেষ্টিত হয়ে।

প্রবেশ পথের বাইরের এক দোকান থেকে পূজার উপকরণ কিনে নিয়ে মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক সুবিশাল গোপুরম, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য শিল্প সম্ভার। বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তিদিয়ে শোভিত করা হ'য়েছে তার শীর্ষদেশ, যেমন তাঁদের অঙ্গের গঠন সৌষ্ঠব, তেমনই সূক্ষ্ম তাদের রূপদান। মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ শিল্পীর এই অপরূপ সৃষ্টি দেখি। উচ্চতায় ১৮৮ ফিট্, আছে এই গোপুরমে নয়টি তলা। দক্ষিণ ভারতের উচ্চতম গোপুরমের অন্যতম এই গোপুরমটি, নির্মিত হয় ১৫২০ খৃষ্টাব্দে, নির্মাণ করেন কৃষ্ণদেব রায়, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বিজয় নগরের। তিনিই ১৫২০ খৃষ্টাব্দেই নির্মাণ করেন চিদাম্বরমের মন্দিরের উত্তর দিকের প্রবেশ পথের গোপুরমটিও। সম পর্যায়ে পড়ে গোপুরম দুটি, উচ্চতায়, স্থাপত্যের উৎকর্ষে আর মহিমাময়ত্বে। আরও তিনটি গোপুরম দেখি, প্রাচীনতর এই গোপুরমগুলি। অপরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য দিয়ে স্থপতি সাজান তাদের অঙ্গেও।

গোপুরম দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। থাকে প্রতিটি মন্দিরে চার বা ততোধিক প্রবেশ দ্বার, শোভা পায় সেই সব প্রবেশ দ্বারে এক একটি গোপুরম। নির্মিত হয় সমকোণ প্রবেশপথ, তার উপর রচিত হয় চূড়া, কোনটি দ্বিতল কোনটি ত্রিতল, আবার কোনটি দশতল। শৃঙ্গের কেন্দ্র স্থলে থাকে একটি প্রতিমার চালা, শীর্ষদেশে সারি সারি ত্রিশূল। অঙ্গে অসংখ্য ছোট বড় কুলুঙ্গির ভিতর শোভাপান দেব-দেবী, বিরাজ করেন বিভিন্ন আর বিচিত্র ভঙ্গিতে।

সাজান দ্রাবিড় স্থপতি এই গোপুরমের অঙ্গ আর শীর্ষদেশ অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে। গোপুরমই তাঁদের মধ্যমণি, গোপুরমের শ্রেষ্ঠত্বের উপরই নির্ভর করে মন্দিরের খ্যাতি, তাই শোভিত করেন তাদের অঙ্গ, হৃদয়ের সবখানি ঐশ্বর্য দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী, রচনা করেন এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ। একমাত্র ব্যতিক্রম তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দিরে, সেখানে মন্দিরের চূড়াকেই দেওয়া হ'য়েছে শ্রেষ্ঠস্থান, গোপুরমকে নয়।

গোপুরম দিয়ে প্রবেশ করে আমরা উপনীত হই একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। সেই প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে আছে ছোট ছোট মন্দির, আছে পূজারীদের থাকবার ঘরও। একটি টেপা কূলম বা পবিত্র সরোবরও আছে।

বৃহৎ প্রাঙ্গণটি অতিক্রম করে আমরা মূল মন্দিরে প্রবেশ করি। বিগ্রহ শিব লিঙ্গ পরিচিত একাম্বরেশ্বর নামে।

শুনি গিরিকুমারী গৌরীদেবীই নাকি বালি দিয়ে তৈরী করেন এই শিব-লিঙ্গটি। এই খানেই এক আম্র বৃক্ষের নিচে বসে তিনি তাঁর রূপ ফিরে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যায় নিযুক্তা থাকেন। সন্তুষ্ট হন মহাদেব, ফিরে পান গৌরী তাঁর হৃত রূপ। মিলন হয় হর গৌরীর সেই আমগাছের নিচে। আসেন গঙ্গাও, মহাতীর্থে পরিণত হয় এই স্থান। সেই থেকে এখানে পূজিত হন মহাদেব, পরিচিত হন একাম্বরনাথ নামে. পূজিতা হন গৌরী দেবীও। আছে সেই আম্র বৃক্ষটিও।

নির্মিত হয় মন্দিরটি সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে, পল্লব রাজারা নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের একটি স্তম্ভের অঙ্গে, পল্লব রাজা প্রথম মহেন্দ্র বর্মণের নাম লিখিত আছে। ক্রমে এই মন্দিরের কলেবর বাড়ে, পরিণত হয় এক বৃহৎ মন্দিরে।

মূল মন্দির দেখে আমরা কল্যাণ মণ্ডপ দেখতে যাই, নির্মাণ করেন এই মণ্ডপটিও বিজয় নগরের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা কৃষ্ণদেব রায়, ১৫২০ থেকে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। শোভিত হয়ে আছে মণ্ডপটি ৫৪০টি অপরূপ স্তম্ভে, অনবদ্য তাদের গঠন ভঙ্গিমা আর অনুপম তাদের অঙ্গের শিল্প সম্পদ, প্রতীক বিজয় নগরের শিল্পীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির। দেখি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে।

## ২

একাম্বরনাথের মন্দির দেখে আমরা কৈলাসনাথের মন্দির দেখতে যাই। শহরের পশ্চিম প্রান্তে, এক বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে, অঙ্গে নিয়ে আছে প্রাচীনতম দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন।

একটি সম্পূর্ণ স্ফটিক পাথর কেটে পল্লবরাজা রাজসীমা নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি, নির্মিত হয় ৭০০ থেকে ৭২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

মন্দিবটি দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর কারুকার্য শোভিত গোপুরম আর কতকগুলি মণ্ডপের সমষ্টি নিয়ে।

প্রবেশ পথের বিপরীত দিকে মূল মন্দিরকে পিছনে রেখে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিমান, ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে রচিত হয়েছে তার শীর্ষদেশ। বিমানের অঙ্গের ক্ষোদিত লিপি থেকে জানা যায়—নির্মাণ করেন এই বিমানটি রাজসীমার পুত্র তৃতীয় মহেন্দ্র বর্মণ। তাই পরিচিত মহেন্দ্র বর্মণেশ্বর গউগৃহম নামে।

প্রবেশপথের পূর্বদিকেও দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি আটটি একই রকম বেলে পাথরে নির্মিত ক্ষুদ্র মন্দির। ছিল নাকি প্রতিটি মন্দিরে একটি করে কষ্টি পাথরের শিব লিঙ্গ। ক্ষোদিত আছে প্রথমটির দেওয়ালে নিত্যবিনিতেশ্বর গৃহম, প্রথম মহেন্দ্র বর্মণের নাম। তৃতীয়টিতে লেখা আছে, নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি রাজসীমার স্ত্রী, মহারাণী রঙ্গপতাকা।

মন্দিরগুলি আর বিমানের অঙ্গের কারুকার্য দেখে আমরা একটি স্তম্ভ যুক্ত মণ্ডপ অতিক্রম করে গর্ভগৃহে প্রবেশ করি। যেখানে এক অতিকায় শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, প্রতিষ্ঠা করেন এই লিঙ্গটি মহেন্দ্র বর্মণ, ক্ষোদিত আছে তাঁর আর মহারাণীর মূর্তিও, এই মন্দিরের বাইরের প্রাচীরের গাত্রে।

তারপর এক বৃহৎ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে আমরা মহামণ্ডপে উপস্থিত হই, এক অতি সুন্দর স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহে। স্ফটিক পাথরে তৈরী বিশালস্তম্ভে শোভিত হয়ে আছে মহামণ্ডল। বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি পদ্মফুল, আছে জালির কাজও, যেমন সুন্দর তেমনই সূক্ষ্ম।

মণ্ডপ পেরিয়ে আমরা গর্ভগৃহে প্রবেশ করি। স্ফটিক পাথরে তৈরী এই

গর্ভগৃহ, তার উপর নির্মিত হয় একটি ৫০ ফিট উঁচু বিমান, উঠেছে পিরামিডের আকারে। চূড়ার অঙ্গে শোভা পায় নানা দেব-দেবীর মূর্তি। গর্ভগৃহের দেওয়ালে মকরে বেষ্টিত কুলুঙ্গির মধ্যে বিরাজ করেন হর-পার্বতী, বিভিন্ন মূর্তিতে। অনবদ্য এই মূর্তিগুলি প্রকৃষ্টতম স্থাপত্যের প্রতীক। বেদীর উপর বিরাজ করেন এক অতিকায় শিবলিঙ্গ, নাম রাজসিংহেশ্বর, এই মন্দিরের বিগ্রহ। তাঁর পিছনে শোভা পান সোমস্কন্দ, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য এই মন্দিরের।

গর্ভগৃহের চারিদিকের দেওয়ালের নিম্নতম প্রদেশে, ক্ষোদিত আছে অতি সুন্দর পল্লব অক্ষরে লিপি। লেখা আছে তাতে পল্লব রাজাদের শৌর্যের কাহিনী, কাহিনী আছে দয়ার আর দানেরও। আমরা বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে দেখি গর্ভগৃহের অপরূপ শিল্প সম্ভার, দেখি পল্লব স্থপতির অমর কীর্তি। শ্রদ্ধায় অবনত হয় আমাদের মস্তক।

৩

কৈলাসনাথের মন্দির দেখে আমরা বিষ্ণু কাঞ্চীতে বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির দেখতে যাই। ৭৫০ থেকে ৭৯০ খৃষ্টাব্দে পল্লব রাজা নন্দীবর্মণ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও পল্লব স্থপতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কৈলাসনাথের মন্দিরের অনুরূপ এই মন্দিরের বিমানটি, সমপর্যায়ে পড়ে অঙ্গের শিল্প সম্পদেও।

বিমানটিকে বেষ্টন করে আছে একটি আচ্ছাদিত পথ। দাঁড়িয়ে আছে পথটি সিংহ স্তম্ভের উপর, অপরূপ তাদের গঠন সৌষ্ঠব। পারাপেটের উপর আছে দুই সারি মূর্তি। অপরূপ এই মূর্তিগুলিও, বর্ণনা করে পল্লব রাজাদের উৎপত্তির কাহিনী। মূর্তি দিয়ে বর্ণিত হয় অভিষেকের দৃশ্যও।

অপরূপ মন্দিরের গর্ভগৃহের দেওয়ালের বিষ্ণু মূর্তিগুলিও। আছেন বিষ্ণু বিভিন্ন অবতারে, অনবদ্য সিংহ স্তম্ভ আর জালির কাজ করা ক্ষুদ্র স্তম্ভগুলিও। প্রতীক প্রকৃষ্টতম পল্লব স্থাপত্যের। দেখে মুগ্ধ হই। গর্ভগৃহ আর মহামণ্ডপ দেখে বিমানের ভিতরের সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে দোতলায় উপনীত হই। সেখানে গর্ভগৃহে সহস্রফণা যুক্ত সাপের উপর শুয়ে আছেন দেবতা রঙ্গনাথম।

তিন তলার গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে আছেন বিষ্ণু এক মহিমাময় মূর্তিতে। পূজা দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি।

৪

সব শেষে আমরা ভরদ্বাজ স্বামীর মন্দির দেখতে যাই। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, চোলরাজারা নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি। প্রবেশ পথে একটি ১০০ ফিট উঁচু গোপুরম দাঁড়িয়ে আছে, অঙ্গে নিয়ে অনুপম শিল্প সম্ভার। প্রতীক শ্রেষ্ঠ চোল স্থাপত্যের। আছে এই গোপুরমে সাতটি তলা। কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে গোপুরমের অঙ্গের কুলুঙ্গির ভিতরকার অনবদ্য দেব-দেবীর মূর্তি দেখে মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মন্দিরে উপস্থিত হই। দেখি কিছুক্ষণ বিমানের অঙ্গের আর শীর্ষ দেশের কারুকার্য। একটি সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে দোতলায় উপনীত হই। দেখি রুদ্ধ মন্দিরের দরজা। সঙ্গী পূজারীকে ডেকে আনতে যান, আমরা দরজার সামনে অপেক্ষা করতে থাকি। আসেন আরও অনেক যাত্রী, তাঁদের মধ্যে একটি কাথিওয়াড়ী পরিবারও আছেন, এসেছেন তীর্থ দর্শনে, সুদূর সৌরাষ্ট্র থেকে। সুরু হয় আলাপ।

এমন সময় পূজারীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন সঙ্গী। উন্মুক্ত হয় গর্ভগৃহের দ্বার। দেখি মন্দির আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন ভরদ্বাজ স্বামী, তাঁর পরিধানে পীতবাস, সর্বাঙ্গে বহু মূল্য জড়োয়ার অলঙ্কার কপালে হীরার তিলক। দেখে মুগ্ধ হই এই মহিমাময় রূপ, হয় না পরিতৃপ্তি, মেটে না আশ, স্তম্ভিত হ'য়ে দেখি। ভক্তি ভরে পূজা ও আরতি দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। নীচের তলায় যাই। সেখানেও বিগ্রহকে ও লক্ষ্মী দেবীকে পূজা ও আরতি দেই।

মন্দির কেন্দ্রিক দক্ষিণ ভারত, বাহুল্য নাই সেখানে পোশাক পরিচ্ছদের। আড়ম্বর নাই আহার বিহারের। সামান্য তার দেবতার পূজার আয়োজনও। লাগে একটি করে কলা, নারিকেল, কিছু ফুল ও বেলপাতা। ধরে দিতে হয় পূজারীর হাতে পূজার উপকরণ, বলতে হয় নাম আর গোত্র। তিনি মন্ত্র

উচ্চারণ করে দেবতাকে পূজা করেন সম্প্রদান করেন নামে ও গোত্রে। স্ত্রী সঙ্গে থাকলে বলেন 'সহধর্মিণী,' আরতি করেন পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে আর ঘণ্টা বাজিয়ে। কপালে প্রদীপের শিষের টিপ পরিয়ে, প্রসাদ ফিরিয়ে দেন। প্রতি মন্দিরেই আছে নির্দিষ্ট দর্শনীর হার, নাই পাণ্ডার অত্যাচার।

পূজারী বলেন—আছে নাকি ভরদ্বাজ স্বামীর প্রচুর বহুমূল্য অলঙ্কার, আছে অনেক হীরা, মণি আর মাণিক্য, নাই দক্ষিণ ভারতের অন্য কোন দেবতার এত ঐশ্বর্য। দান করেন সেগুলি দেবতাকে কাঞ্চীপুরমের রাজারা, দেখান হয় যাত্রীদের, যদি সঙ্গে থাকে অনুমতি পত্র। আছে তাদের মধ্যে একটি হার, লর্ড ক্লাইভ দেবতাকে দান করেন। শোভা পায় সেই হার দেবতার কণ্ঠে প্রতি বছরে, যখন তিনি শোভা যাত্রায় বার হন।

দেবদর্শন ও পূজা শেষ করে, আমরা একশত স্তম্ভ যুক্ত মণ্ডপম আর তার সংলগ্ন টেপাকুলম বা পবিত্র সরোবর দেখতে যাই।

নির্মিত হয় সুন্দর সোপান শ্রেণী, টেপাকুলমের, চতুর্দিকে, মেশে গিয়ে জলের বুকে। কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র মন্দির, বেষ্টিত হয়ে আছে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দে। প্রতিবছরে এই মন্দিরে কিছুদিন সচল দেবতা বাস করেন। দক্ষিণ ভারতের প্রায় প্রতি মন্দিরেই দুইটি বিগ্রহ আছেন, একটি অচল, তিনি বিরাজ করেন মূল মন্দিরে, আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় বিগ্রহ। তিনিই সচল দেবতা, অংশ গ্রহণ করেন উৎসবে, যান শোভাযাত্রায়, রথে চড়ে নগর পরিক্রমণ করেন। আমরা সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে টেপাকুলমের পবিত্র জল স্পর্শ করে, মণ্ডপে প্রবেশ করি।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় নির্মাণ করেন এই মণ্ডপটি, বুকে নিয়ে আছে মণ্ডপ শ্রেষ্ঠ বিজয় নগরের ভাস্কর্যের নিদর্শন, প্রতীক এক গৌরবময় যুগের।

শোভিত হয়ে আছে মণ্ডপটি এক শত অনুপম-গঠন জোড়াস্তম্ভে, নির্মিত এক একটি সম্পূর্ণ স্ফটিক পাথর কেটে। তাদের অঙ্গে শোভা পায় এক একটি অশ্বারোহী নারী। সামনের দিকে পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অশ্বগুলি, তাদের পিছনের পা স্থাপিত হয়েছে স্তম্ভের অঙ্গে। দাঁড়িয়ে আছে অশ্বগুলি বিভিন্ন আর বিচিত্র ভঙ্গিতে। অপরূপ গঠন সৌষ্ঠব, অনবদ্য গঠন

সৌষ্ঠব নারীদেরও, হাতে নিয়ে আছে বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র, ঢাল, তলোয়ার, সড়কি। শোভা করে আছে মণ্ডপের কোণগুলিও এক একটি সম্পূর্ণ স্ফটিক পাথর কেটে নির্মিত অপরূপ শিকল, প্রতীক বিজয় নগরের ভাস্কর্যের চরমতম উৎকর্ষের, এক গৌরবময় সৃষ্টির।

দেখি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে ভাস্করের এই অপরূপ সৃষ্টি, দেখি অনেকক্ষণ ধরে, দেখে মেটে না আশ। শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের সৃষ্টি কর্তাকে। জানাই শিল্পী-দেরও। অমর তাঁরা, সৌভাগ্যবান ভারতবর্ষ। ফিরে আসি, সঙ্গে নিয়ে আসি মনের মন্দিরে স্মৃতি, যা আজও হয়নি ম্লান।

ফিরে আসি সঙ্গীর বাড়িতে। কিছুক্ষণ পরে সঙ্গী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে তামিল ভাষায় পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি তামিল ছাড়া অন্য ভাষা জানেন না, কেবলই মাথা নাড়েন আর হাসেন, আলাপ জমে না। শেষে সঙ্গীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, আর কিছু খাবার ও অনেকগুলি কলা সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসি।

সারা দক্ষিণ ভারতেই আছে এই ভাষার বিভ্রাট। সাধারণ লোকেরা জানেন শুধু তাঁদের মাতৃভাষা, অন্য ভাষায় কথা কইতে পারেন না, বুঝতেও পারেন না অন্য ভাষায় কথা বললে, তাই প্রতি পদেই দোভাষীর সাহায্য নিতে হয়, নিতে হয় মন্দির দর্শনেও। বেলা তিনটেয় মাদ্রাজে ফিরে আসি।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### তিরুপদী ঃ বালাজীভেঙ্কটেশের মন্দির

কাঞ্চীপুরম দেখে আসবার পরের দিন। একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙ্গে। চায়ের টেবিলে বসে ভ্রাতা শৈলেনের সঙ্গে পরামর্শ চলে। দেখা হয় নাই তিরুপদী, মহাবলীপুরমও দেখি নাই। আমার এই অসুস্থ শরীর নিয়ে তিরুপদী আর মহাবলীপুরম দেখতে যাওয়া সম্ভবপর হবে কি? হবে কি যুক্তিসঙ্গত?

আমি বলি, "মহাবলীপুরম দেখেই এ যাত্রায় ফিরে যাওয়া যাক।" ভাই বলে, "তা হয় না, আবার কতদিনে মাদ্রাজে আসবেন, আদৌ আসবেন কি না তার ঠিক নেই, যখন এসেছেন তখন দু'জায়গাই দেখে যেতে হবে।"

মহাবলীপুরম মাদ্রাজ থেকে বত্রিশ মাইল, যেতে হবে বাসে করে। তিরুপদী একশ'চোদ্দ মাইল, যাওয়া যায় বাসে, যায় ট্রেনে চড়েও। ভাই বলতে থাকে, "তিরুপদী দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ, আর বালাজীর মন্দিরই সমৃদ্ধশালীতম মন্দির দক্ষিণ ভারতের। তাই দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে এসে কোন ক্রমেই তিরুপদীকে বাদ দেওয়া চলে না।"

সায় দেন আমার স্ত্রীও, ভ্রাতৃবধূও সমর্থন করেন, ভরসাও দেন, বলেন, "দেবদর্শনে মন প্রফুল্ল হবে, হবে না কোনও ক্ষতি দেহের।" পাই উৎসাহ, কিন্তু পাই না ভরসা; কাটে না দ্বিধা, সাহস হয় না বাসে করে অথবা ট্রেনে চড়ে তিরুপদী যাওয়ার।

এমন সময় ভাই-এর এক বন্ধু এসে হাজির হন। তিনি অন্ধ্রের অধিবাসী, তাঁদের ব্যবসা আছে বিশাখাপত্তনমে, মাদ্রাজ শহরেও আছে, ব্যবসা উপলক্ষ্যে তাঁকে মাদ্রাজেই থাকতে হয়। তিনিও সমর্থন করেন ভাই-এর প্রস্তাব।

বলেন, "দেখতেই হবে তিরুপদী, বাদ দেওয়া উচিত হবে না মহাবলীপুরম দেখাও, তিনিই আমাদের তিরুপদীতে যাতায়াতের ব্যবস্থা করবেন, মহাবলীপুরমে যাতায়াতেরও ব্যবস্থা করা হবে। তাঁর দু'খানি মোটরগাড়ি আছে, তার একখানি আমাদের তিরুপদীতে আর মহাবলীপুরমে নিয়ে যাবে।

ভাল ড্রাইভার সঙ্গে দেবেন, রাস্তায় বিপদের আশঙ্কা থাকবে না। তাঁর বন্ধু তিরুপদীর গভর্ণরকেও একখানি চিঠি লিখে দেবেন, আমাদের সেখানে বাসের কোনরকম অসুবিধা হবে না।" আরও বলেন, "কাল সকাল নটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে তিরুপদীতে রওনা হলে, সেখানে বিকেল ছটা নাগাদ পৌঁছাবেন। ধর্মশালায় রাত্রিবাস করবেন। ভোরে উঠে মন্দির দর্শন করে ধর্মশালায় ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হলে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই মাদ্রাজে পৌঁছে যাবেন। সোমবার বিশ্রাম করে মঙ্গলবার মহাবলীপুরমে যাবেন।"

বিস্মিত হই তাঁর প্রস্তাবে। মন সরে না এক সম্পূর্ণ অপরিচিতের সাহায্য নিতে। ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখান করি তাঁর প্রস্তাব। কিন্তু তিনি শুনবার পাত্র নন, বলেন, "আমরা তাঁর অতিথি, পতিত হবেন তিনি অতিথির ধর্ম থেকে যদি আমরা তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করি।" শেষে ভাই-এর অনুরোধে তাঁর সাহায্য নিতে বাধ্য হই, সুগম আর সহজ হয় আমাদের মহাবলীপুরম যাতায়াত।

শনিবার সকাল নটায় ভাই-এর বন্ধুর মোটরে চড়ে আমরা তিরুপদীর পথে রওনা হই, সঙ্গে যান আমার একটি আত্মীয়, মৈত্র মহাশয়। অনেকগুলি আঁকা-বাঁকা রাস্তা অতিক্রম করে, আমরা শহরের বাইরে, মাদ্রাজ-কলিকাতাগামী রেলপথের পাশে এসে উপস্থিত হই। এখান থেকে দিগন্তপ্রসারী বঙ্গোপসাগর দেখা যায়, এক মনোরম দৃশ্য দেখি। গাড়ি রেলপথের পাশ দিয়ে চলে, কলিকাতার দিকে। এই রাস্তাই বিশাখাপত্তনম পর্যন্ত যায়, পরিচিত কলিকাতা-মাদ্রাজ পথ নামে।

মাইল দশ অতিক্রম করে আমাদের গাড়ি বাঁ দিকের রাস্তায় মোড় নিয়ে একটি ছোট শহরের বাজারের মধ্যে এসে থামে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে একটি চায়ের দোকানে প্রবেশ করে চা পান করি, ড্রাইভারও এক হোটেলে ঢুকে ভাত খেয়ে নেয়।

আবার গাড়ি তিরুপদী অভিমুখে চলে। মাইলের কাঁটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশে উঠে, পঞ্চাশ থেকে ষাটে। রাস্তার দু'পাশে দেখা যায় সবুজ ধানের ক্ষেত, দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে, দেখা যায় তালকুঞ্জ, দেখি নারিকেল গাছের শ্রেণী আর কলার ঝাড়।

গাড়ি এগিয়ে চলে বিদ্যুৎগতিতে। অন্তর্হিত হয় সবুজের মেলা, এগিয়ে

আসে পূর্বঘাটের পর্বতমালা আর উঁচুনীচু জমি, বুকে নিয়ে লতা, গুল্ম আর কণ্টকগুচ্ছ।

হঠাৎ গাড়ি থেমে যায়, ড্রাইভার গাড়ি পর্যবেক্ষণ করে বলে, "গাড়ির একটি চাকা অচল হয়েছে।"

আমি বলি, "ষ্টেপ্‌নি আছে, বদলে নাও অচল চাকা।"

ড্রাইভার উত্তর দেয়, "আমরা যখন চা পানে নিযুক্ত ছিলাম, তখন অচল হয়েছিল আরও একটি টায়ার, ষ্টেপ্‌নি সেই টায়ারের স্থান নিয়েছে। এখন এই টায়ারকেই নিরাময় করতে হবে, নইলে সচল হবে না বাহন, তাকে পথের মাঝখানে পরিত্যাগ করে যেতে হবে।" ভরসা দেয় আধঘণ্টার মধ্যেই নিরাময় হবে টায়ার, আমরা রওনা হতে পারবো তিরুপদীর পথে।

ড্রাইভার টায়ার মেরামতের কাজে ব্যস্ত থাকে, আমরা গাড়ি থেকে নেমে পায়চারী করতে থাকি। মাঝে মাঝে দু'একখানি বাস অতিক্রম করে যায়। ভরসা জাগে মনে, যাওয়া যাবে বাসে করে যদি গাড়ি অচল থাকে।

শেষে মাঠের মধ্যে নেমে যাই। দেখি কাঁটার ঝোপে ফলে আছে অসংখ্য বুনো কুল। কিছু কুল সংগ্রহ করে নিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে আসি।

তখনও ড্রাইভার একমনে গাড়ি মেরামতের কাজে নিযুক্ত। বলে "এখনও বহু দেরী," বলে "নাই যন্ত্রপাতি, নাই মাল-মসলা।"

শুনে রাস্তার উপর বসে পড়ি। পূর্বঘাট পর্বতমালার একেবারে সানুদেশে, এক নির্জন মাঠের মধ্যে বসে আছি। সম্মুখে, যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখা যায় বন্ধুর জমি, বুকে নিয়ে আছে কণ্টকগুচ্ছ, দূরের পাহাড়ের পদতলে গিয়ে মিশেছে, নাই কোন গ্রামের চিহ্ন, চিহ্ন নাই জনমানবের। বসে আছি আমরা তিনটি প্রাণী, ড্রাইভার মেরামত করছে টায়ার।

ক্রমে কমে আসে বাসের যাতায়াতও, শেষে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। কাটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অতিক্রম করে সময়। অন্তর্হিত হয় অপরাহ্ণের লাল আভা, সন্ধ্যা নামে দিগন্তে। অন্তর্হিত হয় তিরুপদী যাওয়ার আশা, দূর হয় মাদ্রাজে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাও। ভাবতে থাকি এই বিজন মাঠের মধ্যে কি করে কাটাব রাত্রি? হবে কি উপায়? এক অজানা আশঙ্কায় ছেয়ে ফেলে সারা অন্তঃকরণ।

ড্রাইভারের ডাকে সংবিৎ ফিরে পাই। বলে, "কোনরকমে কালাহস্তি পর্যন্ত যাওয়া যাবে। কালাহস্তি এখান থেকে আট মাইল, সেখানে একটি গ্যারাজ আছে, ভাল মিস্ত্রীও আছে, সারিয়ে নেওয়া যাবে টায়ার পৌছান যায় যদি কালাহস্তি পর্যন্ত।" বলে, "কালাহস্তি থেকে আরও বত্রিশ মাইল যেতে হবে, তবেই তিরুপদী মিলবে। টায়ার সারান হলে এক ঘণ্টার মধ্যেই তিরুপদীতে পৌছে যাব, নাই কিছু ভাবনার কারণ।"

ড্রাইভারের কথা শুনে মনে ভরসা জাগে, দেখতে পাই আশার আলো, সকলে গাড়িতে উঠে বসি।

গাড়ি মন্থর গতিতে চলে, একঘণ্টা লাগে আট মাইল যেতে। কালাহস্তিতে অতিবাহিত হয় আরও একঘণ্টা, তবুও অসম্পূর্ণ থেকে যায় টায়ারের মেরামত, হয় না সম্পূর্ণ নিরাময়। অভাব মাল-মসলার, নাই উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও।

আবার গাড়ি ছাড়ে, মন্থরগতিতে চলে, ড্রাইভার গতির বেগ বাড়াতে সক্ষম হয় না, সাহস পায় না জোরে 'এক্সিলারেটর' চাপতে। দুশ্চিন্তায় আর আশঙ্কায় সময় অতিবাহিত হয়। কেবলই মনে হতে থাকে, বুঝি এক বিরাট আর্তনাদ করে, রাস্তার মাঝখানে টায়ার বসে পড়ে, রুদ্ধ হয় গাড়ির গতি, বাহন হয় অচল।

শেষে সত্যিইগাড়ি তিরুপদী শহরে এসে পৌছায়, উপনীত হয় গভর্ণরের বাড়ির দরজায়। রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজে।

শুনি, আমাদের দেরীতে তিনিও কম উৎকণ্ঠিত হন নাই। বলেন, "আমাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে নীচের ধর্মশালায়, হয়েছে উপরের গেষ্ট হাউসেও, তবে এই রাত্রিতে পাহাড়ে চড়া যুক্তিসঙ্গত হবে না।" সমর্থন করি তাঁর প্রস্তাব, নীচের ধর্মশালাতেই গিয়ে উঠি। আমাদের আর আমাদের জিনিসপত্র ধর্মশালায় নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার মোটর নিয়ে গ্যারাজে চলে যায়, সম্পূর্ণ করতে হবে কালাহস্তির অসম্পূর্ণ মেরামত, ভোর হওয়ার আগেই সচল করতে হবে বাহনকে। নইলে রওনা হওয়া যাবে না ভোর পাঁচটায়, নির্দিষ্ট সময়ে ওঠা যাবে না পাহাড়ের শীর্ষদেশে, হবে না বালাজী দর্শন।

সুন্দর আর পবিত্রকে তামিল ভাষায়-বলা হয় তিরু, স্থানকে পদ, তাই তিরু-পদী বলতে সুন্দর পবিত্রস্থান বোঝায়। মাদ্রাজ শহর থেকে সমান রাস্তায়

একশ' মাইল এলে তিরুপদী শহরে পৌছান যায়। শহরটি পূর্বঘাট পর্বতমালার একেবারে সানুদেশে, এক অতিরমণীয় পরিবেশে অবস্থিত। সেখান থেকে অতিক্রম করতে হয় সাতটি পাহাড়, যেতে হয় চোদ্দ মাইল রাস্তা, সপ্তম পাহাড়ের শীর্ষদেশে আছে একটি মন্দির, সেই মন্দিরে বিরাজ করেন বালাজী ভেঙ্কটেশ, দক্ষিণ ভারতের জাগ্রততম দেবতা। তাই এক মহাতীর্থে পরিণত হয় তিরুপদী। আসেন এখানে দেশ বিদেশ থেকে হাজার হাজার যাত্রী, করেন দেবদর্শন, ধন্য আর কৃতার্থ হয় তাঁদের জীবন।

যাত্রীরা স্থান পান নীচের ধর্মশালায়, একসঙ্গে প্রায় দু'হাজার যাত্রীর স্থান মেলে। পান রান্নার আর খাবার বাসন, ধর্মশালার দোকান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন চাল ডাল আর সবজি, খাওয়া দাওয়া সেরে, 'ক্লোক্ রুমে' জিনিসপত্র রেখে রওনা হন দেব দর্শনে, সারা রাত্রিধরে পদব্রজে অতিক্রম করেন সাতটি পাহাড়। প্রভাত হওয়ার আগেই মন্দিরের দরজায় উপনীত হন। তাই উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোয় সমস্ত রাস্তাটি আলোকিত। আলো জ্বলে সারা রাত্রি, সহজ আর নিরাপদ হয় পথচলা। ধর্মশালা থেকে দেখে মনে হয় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে আলোর মালা পাহাড়ের অঙ্গে, শোভা করে আছে মালা তার কণ্ঠ আর শীর্ষ দেশ। অপরূপ সে দৃশ্য। সরকারী বাসের ব্যবস্থাও আছে, বাসে করেও যাত্রী যায়। নিজের মোটরে চড়েও যায়, সামান্য তাদের সংখ্যা।

এই ধর্মশালায় অনেকগুলি ঘর আছে, সজ্জিত তারা আসবাবে, প্রতি ঘরের দর্শনী, দু'টাকা দিন। অনেকগুলি হোটেলও আছে, সেখানে দেশী খাবার মেলে, মেলে ভাত, সম্ভরম্, ইটলি, ডোসা আর পাকৌড়া। কফি আর চা'ও পাওয়া যায়। একটি দপ্তর আছে, খোলা থাকে রাত্রি দিন, সেখান থেকেই যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা হয়, তাদের সুখ সুবিধারও। একজন ডাক্তারও আছেন, রোগের আর রোগীর পরিচর্যা করেন।

রাত্রি নাই তিরুপদী শহরেও, আলোয়-আলোকিত হয়ে আছে শহর। যাত্রীর সমাগমে মুখর ধর্মশালা কেউ রান্না করে, কেউ বাসন মাজে, কেউ খেতে বসে যায়। কেউ প্রস্তুত হয় মন্দিরে যাওয়ার জন্য, আছে কেউ চলার পথে। দেখি এক অভিনব দৃশ্য, দেখি নাই আগে, বিস্মিত হই দেখে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হই গোবিন্দ রাজনের মন্দিরে। গোবিন্দ রাজন বালাজীর ভাই বলে পরিচিত। প্রবেশ দ্বারের ভিতর দিয়ে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মূল মন্দিরে উপস্থিত হই। দেখি সহস্র ফণাযুক্ত সাপের উপর শয়ন করে আছেন গোবিন্দ রাজন, আছেন অনন্ত শয়নে।

মন্দির দেখে বাজারে যাই, যদি মেলে কিছু খাবার, মেলে না কোন সুখাদ্য। ফিরে আসি যাত্রী মুখর ধর্মশালায়। একটি হোটেলে প্রবেশ করে, এক কাপ চা, খানকয়েক পাকৌড়া খেয়ে, আমাদের কামরায় ফিরে যাই, শয্যায় আশ্রয় নেই।

পরের দিন, শেষ রাত্রিতে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান শেষ করে মন্দির দেখতে রওনা হই। তখন ধীরে ধীরে পূবের আকাশ লাল হয়ে ওঠে, পাহাড়ের অন্তরাল থেকে দিবাকর বেরিয়ে আসেন। প্রভাতের লাল রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে আকাশের গায়ে, পড়ে পাহাড়ের চূড়ায়ও। আমাদের মোটর বঙ্কিম গতিতে চলে, যায় দু'পাশের সবুজের ভিতর দিয়ে, অতিক্রম করে পাহাড়, একের পর এক। কোথাও দেখা যায় এক বিশাল মহীরুহ আকাশ স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও জড়া-জড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে লতাগুল্ম আর ছোট গাছ। শেষে, একটি গোপুরম অতিক্রম করে আমরা উপনীত হই মন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গণে প্রায় ১৪৬০০ ফিট উঁচুতে।

খবর পেয়ে মন্দিরের অধ্যক্ষ মহাশয় উপস্থিত হন, আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে, নিয়ে যান এক গেষ্ট হাউসে। তিনিও গভর্ণরের আদেশ পেয়ে এই গেষ্ট হাউসে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের সেখানে বসিয়ে রেখে দেবদর্শনের ব্যবস্থা করতে মন্দিরে যান। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান। প্রায় এক ফার্লং পথ অতিক্রম করে, একটি বাজার পেরিয়ে আমরা মূল মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের সামনে উপস্থিত হই।

প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে আমরা একটি বাঁধান প্রঙ্গণে প্রবেশ করি। এই প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে মূল মন্দিরটি। মন্দিরের সামনে একটি নাটমন্দির আছে, কেন্দ্রস্থলটিও বেড়া দিয়ে ঘেরা আছে। সৃষ্টি হয়েছে

একটি বেষ্টনীর। তার দক্ষিণপাশে, বেড়ার বাইরে ফরাশ পাতা আছে, সেখানে মন্দিরের হিসাব রক্ষক বসে আছেন, জন কয়েক কর্মচারীও আছেন। এই খানেই দর্শনীর টিকিট বিক্রী হয়। 'কিউ'-এ দাঁড়িয়ে কিনতে হয়। দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ছ ফিট উঁচু একটি স্তম্ভও, ব্যাস তার চার ফিট, ভিতরটি ফাঁপা। বিপরীত দিকে বেড়ার বাইরে যাত্রীরা স্থান পায়, সেখান থেকেই দেব দর্শন করে। নাট মন্দিরের ভিতরের দিকে বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছেন সচল বালাজী, তাঁর সোনার অঙ্গে শোভাপায় বহু মূল্য অলঙ্কার।

প্রাঙ্গণের মধ্যে বসে গিয়েছে শত শত লোক, মুণ্ডন করছে মস্তক, দেখে অবাক হই। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে নাটমন্দিরে প্রবেশ করি। স্থান মেলে হিসাব রক্ষক আর স্তম্ভটির মাঝখানে।

আমাদের বসিয়ে রেখে আবার অধ্যক্ষ মহাশয় অদৃশ্য হন ; আমাদের জন্য টিকিট আর পূজার উপকরণ কিনতে যান। দর্শনী লাগে তের টাকা। লাগে না কোন দর্শনী শুধু দেব দর্শনে, দিতে হয় পূজার, আরতির ও ভোগের জন্য, বিভিন্ন তাদের হার।

হিসাব রক্ষকের সঙ্গে গল্প সুরু করে দিই। শুনি ভারতবর্ষে, সব চাইতে সমৃদ্ধিশালী এই মন্দির, বাষিক আয় ২৫ লক্ষ টাকারও বেশী। আসে তার অধিকাংশই যাত্রীদের কাছ থেকে। আসে দর্শনী হিসাবে, মানত থেকেও আসে, আছে বালাজীর কিছু সম্পত্তিও, আছে জমি জমা দান করেন দেবতাকে দ্রাবিড়স্থানের রাজারা।

বালাজী দক্ষিণ ভারতের জাগ্রততম দেবতা, উপাস্য বৈষ্ণবদের, উপাসনা করেন শৈবরাও। এই খানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য, ব্যতিক্রম রামেশ্বরমেও। সারা দক্ষিণ ভারতে শৈবেরা শুধু শৈব মন্দিরে পূজা দেন, বৈষ্ণবরা বিষ্ণু মন্দিরে, প্রতিস্থানেই পাশা-পাশি আছে শৈব আর বিষ্ণু মন্দির। তাই সীমাহীন বালাজীর যাত্রীর সংখ্যা। আসেন হাজারে, হাজারে করেন দেব দর্শন। দিয়ে যান পূজা, দেন মানতের জিনিসও। এই মানত থেকে তাঁর দৈনিক আয় হয় না কি সাড়ে বারো হাজার টাকা।

তার প্রমাণ পেতেও দেরী হয় না। দেখি আসে একের পর এক যাত্রী, মুণ্ডিত তাদের মস্তক, পরিধানে সিক্ত পট্ট বস্ত্র, মস্তকের উপর থালা। কারও

থালায় আছে থোলে ভরতি টাকা, কেউ ভরতি করে এনেছেন থোলে, সিকি, দু'আনি, আধুলি আর পয়সা দিয়ে, কেউ গড়িয়ে এনেছেন গহনা, সোনার তাগা, বালা, হার, দুল, নাকছাবি আরও কত কি। কারও থালায় শোভাপায় রূপো অথবা সোনার তৈরী হাত, অথবা অন্য কোন অঙ্গ। যেগুলি স্তম্ভের ভিতর ঢেলে দিয়ে, স্তম্ভকে প্রণাম করে বিদায় নেন প্রফুল্ল অন্তঃকরণে। তাঁরা এই সব জিনিস দেবতার কাছে মানত করেছিলেন, আজ দেবতার কৃপায় পূর্ণ তাঁদের মনস্কাম। তাই কৃতার্থ তাঁরা, রক্ষা করতে পেরেছেন তাঁদের প্রতিশ্রুতি। শুনি কেশই বালাজীর প্রিয়তম, তাই দিতে হয় কেশ, পূর্ণ হলে মনোবাঞ্ছা, মুণ্ডন করতে হয় মস্তক। তাই যখন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি, শত শত যাত্রীকে মস্তক মুণ্ডন করতে দেখি। বালাজীর আয় থেকেই নীচের শহরে একটি কলেজ ও একটি হাই স্কুল পরিচালিত হয়, হয় একটি হাসপাতালও।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে, টিকিট ও পূজার উপকরণ নিয়ে অধ্যক্ষ মহাশয় ফিরে আসেন। আমাদের সঙ্গে করে মন্দিরে নিয়ে যান। বলেন, "সমাপ্ত হয়েছে এখন যাত্রীদের দেব দর্শন, কমেছে যাত্রীর ভীড়ও, হয়েছে প্রকৃষ্ট সময় দেব দর্শনের আর পূজা দেওয়ার।"

আমরা তাঁর অনুগমন করে একটি দীর্ঘ অলিন্দে উপনীত হই। এই অলিন্দের প্রান্তদেশে আছে একটি বিশাল দরজা, তার সোনার অঙ্গে শোভা পায় সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম দ্রাবিড়ী শিল্পসম্ভার। সেই দরজার অন্তরালে, বেদির উপর দাঁড়িয়ে আছেন বালাজী ভেঙ্কটেশ, আছেন দক্ষিণ ভারতের জাগ্রততম দেবতা। আমরা গিয়ে প্রথম শ্রেণীতে একেবারে দরজার সামনে গিয়ে বসি। অপেক্ষা করতে থাকি পূজারীর দরজা খুলবার।

এক ব্যাকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে থাকি। কানে আসে ভিতর থেকে পূজারীর উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ, শোনা যায় ঘণ্টাধ্বনিও। হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন পূজারী, আমরাও উঠে দাঁড়াই। দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বালাজী, শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধারী। পরনে তাঁর পীত বাস, সোনার অঙ্গে বহু মূল্য জড়োয়ার অলঙ্কার, কণ্ঠে মোতির মালা, কপালে জ্বলে এক প্রকাণ্ড হীরের টিপ। সজ্জিত হয়ে আছেন ফুল ভূষণে।

দেখি নাই আগে কখনও এমন সুন্দর, শোভন রূপ দেবতার, এমন অপরূপ

মূর্তি। অলোক সামান্য এই মূর্তি, স্বপ্নের অগোচর, কল্পনার অতীত; মূর্তি নয়, স্বয়ং দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন চোখের সামনে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, দেখি স্তব্ধ হয়ে, দেখে হয় না পরিতৃপ্তি, মেটে না আশ।

সংবিৎ ফিরে পাই অধ্যক্ষের কথায়। বলেন, "নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়েছে, পথ ছেড়ে দিতে হবে অন্য দর্শন প্রার্থীদের।" আর একবার দেখি দেবতাকে, লুটিয়ে পড়ি তাঁর চরণে। পূজা ও আরতি দিয়ে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা অম্লান হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়, আছে অক্ষয় হয়ে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আবার সেই পূর্বের জায়গায় গিয়ে বসি, দেখি তখনও শেষ হয় নি মানতের দানের, তখনও যাত্রী আসে একের পর এক, দিয়ে যায় মানতের জিনিস। আমরা বিস্মিত হয়ে দেখি আর হিসাব পরীক্ষার উৎসবের অপেক্ষা করতে থাকি। বেলা এগারটায় এই উৎসব হয়, চারি প্রহরেই নির্দিষ্ট সময়ে বালাজীর উৎসব হয়, ভোর ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত হয় পূজা, যাত্রীদের দর্শন দেন সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত, যাত্রীরা পূজা দেন আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত। দশটায় খান ভোগ, এগারটায় হিসাব পরীক্ষা। আবার বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত যাত্রীরা দেবতার দর্শন পায়, ছটায় আরতি হয়, রাত্রি দশটায় শয়ন আরতি, পরিসমাপ্তি হয় উৎসবের।

দেখি নাই হিসাব পরীক্ষার উৎসব অন্য কোন মন্দিরে। ঠিক এগারটায় নাট মন্দিরের বেষ্টনীর মধ্যে একটি গালিচা পাতা হয়, সেই গালিচার উপর, সোনার সিংহাসনে সচল বালাজীকে বসান হয়। তাঁর মস্তকের উপর শোভাপায় এক সুবিশাল বহুমূল্য ছত্র, তাতে আছে সোনার ঝালর। পূজা করা হয় তাঁকে ষোড়শ উপচারে, হয় আরতি ও বাজান হয় ঘণ্টা। পূজা শেষ হলে, তাঁর সামনে এসে দাঁড়ান হিসাব রক্ষক, হাতে তাঁর হিসাবের খাতা। পড়েন আগের দিনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব। পড়া শেষ হলে, তিনি নিজের জায়গায় গিয়ে বসেন। বালাজীকেও রাখা হয় মন্দিরে বেদির উপর। অপসারিত হয় ছত্র গালিচা, হয় পূজার উপকরণও।

আমরাও মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এসে পরিক্রমণ করি মন্দির, দেখি মন্দিরের অঙ্গের আর শীর্ষ দেশের শিল্প সম্পদ। দেখি অপরূপ সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম

কারুকার্য শোভিত সোনার পাতে মোড়া আছে মন্দিরের চূড়া, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, ভাবি না জানি কত কোটি টাকার সোনা আছে এই মন্দিরের চূড়ায়, দেখি গরুড় স্তম্ভ দু'টিও, মোড়া আছে স্তম্ভদুটিও উজ্জ্বল পুরু সোনার পাত দিয়ে।

আছে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ বিষ্ণু মন্দিরেই এক বা একাধিক সুউচ্চ সোনার গরুড়স্তম্ভ। দাঁড়িয়ে আছে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, মূল মন্দিরের সামনে, দেবতার দিকে মুখ করে। অন্য বিষ্ণু মন্দিরে আছে কাঠের তৈরী গরুড়স্তম্ভ। গরুড় বিষ্ণুর বাহন, তাই দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করবার আগে দেখতে হবে তাঁর বাহনকে, জানাতে হবে প্রণাম।

তেমনই প্রতি শৈব মন্দিরেই আছে এক বা একাধিক নন্দী মণ্ডপ দেবতার দিকে মুখ করে, বসে আছেন, শিবের বাহন বিপুলকায় নন্দী এক মঞ্চের উপর। মন্দিরে প্রবেশ করবার আগে দেখতে হবে তাঁকে, জানাতে হবে প্রণাম। আছে দুর্গা মন্দিরে তাঁর বাহন সিংহ আর ময়ূর সুব্রমনিয়ামের মন্দিরে। এইগুলিই দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নাই অন্য মন্দিরে।

এমন সময় অধ্যক্ষ মহাশয় ভোগ নিয়ে হাজির হন, দিতে হয় ভোগের মূল্য দু'টাকা, দর্শনী দেবতার পাদস্পর্শের। আমরা টেপাকুলমের পবিত্র জল স্পর্শ করে আকাশ গঙ্গা দেখতে যাই, আছে এখানে একটি নির্ঝর, এই নির্ঝরের জলই নিয়ে আসা হয় টেপাকুলমে।

ফিরবার পথে দেখি সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ বা মণ্ডপ, অন্যতম অঙ্গ দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের। যাত্রীরা স্থান পান এই সব সভাগৃহে।

শোভিত হয়ে আছে সুপ্রশস্ত সভাগৃহটি (মণ্ডপটি) সহস্রটি স্তম্ভ দিয়ে, এক একটি সম্পূর্ণ স্ফটিক পাথর কেটে নির্মিত হয় প্রতিটি স্তম্ভ। স্থপতি তার অঙ্গে আর শীর্ষদেশে ক্ষোদিত করেন বিভিন্ন আর বিচিত্র শিল্পসম্ভার। রেখে যান তাদের অঙ্গে দ্রাবিড় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় সৃষ্টির, এক অমর কীর্তির, রচনা করেন এক একটি সৌন্দর্যের নিকেতন, দেখি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে, শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক, ফিরে আসি গেষ্ট হাউসে। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মন্দিরে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, সমাপন করি জলযোগ। তারপর অধ্যক্ষ মহাশয়কে

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠে বসি। বেলা একটায় গাড়ি ছাড়ে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই নীচের ধর্মশালায় এসে পৌছাই। দেখি ইক্‌মিক্ কুকারে খাবার প্রস্তুত। মুখ ধুয়ে আহার শেষ করি, অফিসে গিয়ে দেনা-পাওনা মিটিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে উঠে পড়ি গাড়িতে, রওনা হই মাদ্রাজের পথে।

মাইল তিনেক এসে গাড় থামে লক্ষ্মী দেবীর দরজায়, তিনিই বালাজীর স্ত্রী। তাই দর্শন করতে হয় তাঁকেও, নইলে অসম্পূর্ণ থাকে বালাজীর দর্শন, পূর্ণ হয় না পুণ্যের ডালি। একটি গোপুরমের ভিতর দিয়ে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ করি। লক্ষ্মী দেবীকে পূজা দিয়ে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। দেখি কিছুক্ষণ গোপুরমের অঙ্গের শিল্পসম্ভার, তারপর গাড়িতে উঠে বসি। গাড়ি চলে বিদ্যুৎগতিতে।

অতিক্রম করে গাড়ি মাইলের পর মাইল, এসে থামে কালাহস্তিতে। একেবারে মন্দিরের সামনে। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম আর পবিত্রতম মন্দিরের অন্যতম এই বিশাল মন্দিরটি, দাঁড়িয়ে আছে একটি বিরাট দুর্গের মত, রুদ্ধ করে আছে পথ। এই মন্দিরেই বিরাজ করেন দেবাদিদেব মহাদেবের বায়ুঃ লিঙ্গম, পাঁচটি পবিত্র লিঙ্গের অন্যতম। নির্গত হয় বায়ু এই লিঙ্গ থেকে, প্রকম্পিত করে আলোক, তাই এত প্রসিদ্ধি এই মন্দিরের, পবিত্র এই স্থান। সংস্কার অভাবে জীর্ণ আজ মন্দিরের প্রাচীর, ধ্বংসে পরিণত তার চারি পাশের সু-উচ্চ গোপুরমগুলি। কিন্তু, তাদের বিশালতা, অঙ্গের আর শীর্ষ দেশের অবশিষ্ট শিল্পসম্পদ পরিচয় দেয় এক পূর্ব গৌরবের, এক মহিমাময় সৃষ্টির, নিদর্শন প্রকৃষ্টতম দ্রাবিড়স্থানের স্থাপত্যের।

দেখি মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ; নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি। তারপর, একটি গোপুরমের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করি একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে উপনীত হই মন্দিরে, দাঁড়িয়ে আছে কেন্দ্রস্থলে। ভক্তি ভরে পূজাদিয়ে ফিরে আসি গাড়িতে।

গাড়ি ছাড়ে। আমরা ফিরে আসি মাদ্রাজে রাত্রি তখন গভীর, নিস্তব্ধ চারিদিক, নীরব মাদ্রাজ শহর।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## মহাবলীপুরম ঃ

১। ধর্মরাজের মন্দির　　　২। জলশয়ানের মন্দির

তার পরের পরের দিন। সকালে চা পান ও জলযোগ সেরে মহাবলীপুরম দেখতে রওনা হই, যাই ভ্রাতার বন্ধুর মোটরে চড়ে। যাওয়া যায় বাসে করেও। পথে পড়ে তিরু কলিকুণ্ড্রম বা পক্ষীতীর্থ।

শহর পেরিয়ে আমরা একটি সুন্দর রাস্তায় উপনীত হই। দু'পাশে দেখা যায় সবুজ ধানের ক্ষেত, মিশেছে গিয়ে দিগন্তে। তার মাঝে মাঝে নারিকেল গাছের শ্রেণী আর তাল কুঞ্জ সৃষ্টি করে এক রমণীয় পরিবেশ।

বেলা দশটায় মোটর এক পাহাড়ের সানুদেশে এসে পৌছায়। এই সেই পবিত্র পাহাড় তিরু কলিকুণ্ড্রম, এরই শীর্ষ দেশে আছে একটি মন্দির, বিরাজ করেন সেই মন্দিরে দেবতা। প্রতিদিন ষোড়শ উপচারে দেবতার পূজা হয়, দেওয়া হয় ভোগও। আসে দু'টি শ্বেত পক্ষী, আসে রোজই একই সময়ে, আসে বেলা ১১৷৷০টায়। আসে স্মরণাতীত কাল থেকে এসে পূজারীর হাত থেকে ভোগ খেয়ে যায়। তাঁরা অভিশপ্ত মুনি, এখানে এসে খাবার খেয়ে যান কন্যাকুমারীতে, সেখান থেকে বারানসীতে ফিরে যান; সেখানেই তাঁদের বাস। এই ভাবেই এঁদের সমস্ত কলিযুগ অতিবাহিত করতে হবে, কলি অন্তে হবেন শাপমুক্ত, আবার মুনিতে পরিণত হবেন।

আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উপনীত হয়ে পাখীর আগমনের অপেক্ষা করতে থাকি। এগারটা বাজার মিনিট পনর আগে, মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন পূজারীও। এসে বসেন একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর, এক সমান জায়গায়। তাঁর এক হাতে ভোগের দ্রব্য, অন্যহাতে ঘটি ভরতি জল।

আরও অনেক যাত্রী আসেন, সঙ্গে করে আনেন এক অদম্য কৌতূহল, সকলের মুখেই একই প্রশ্ন। "সত্যিই আসবে কি পাখী?" কৌতূহলী হন আমার স্ত্রীও, হন অন্য সঙ্গীরাও। তাঁরা দেখে আসেন সমস্ত পাহাড়টি,

খোঁজেন তন্ন তন্ন করে। দেখেন, লুকিয়ে নেই ত পাখী কোন বৃক্ষের অন্তরালে? ঘরের কোণে? পাহাড়ের গহ্বরে?

ক্রমে এগিয়ে আসে নির্দ্দিষ্ট সময়, কৌতূহল বাড়ে যাত্রীদের, তাঁরা তাকিয়ে থাকেন আকাশের পানে। ঘড়ির কাঁটা এগারটা আটাশ মিনিটে পৌঁছায়, দেখা যায় দূরের আকাশে দু'টি পাখী। তারা এগিয়ে আসে, চক্রাকারে ঘুরতে থাকে মাথার উপর, ধীরে ধীরে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর এসে বসে, এগিয়ে এসে পূজারীর হাত থেকে ভোগ খায়, ঠোঁট ডুবিয়ে পান করে ঘটির জলও। তারপর আকাশে উড়ে যায়, হয়ে যায় অদৃশ্য। শ্বেত তাদের গায়ের রং, তারা জাতিতে ঈগল।

আমরাও পাহাড়ের নীচে নেমে গাড়িতে উঠে বসি। গাড়ি মহাবলীপুরম অভিমুখে অগ্রসর হয়। আবার রাস্তার দুপাশে সুরু হয় সবুজের মেলা। ক্রমে দেখা যায় খাড়ি, পূর্ব উপকূলের বৈশিষ্ট্য এই খাড়ি, বেরিয়ে আসে সমুদ্র থেকে এক বিশাল জলরাশি, চলে সমান্তরালে। দূর থেকে দেখে মনে হয় সমুদ্রই বুঝি। দেখা যায় সমুদ্রও, শোনা যায়, তার অন্তরের ধ্বনি, শোনা যায় গর্জন। কিছু দূর খাড়ির কিনারা দিয়ে গিয়ে, খাড়িকে পিছনে রেখে মহাবলীপুরমের সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হই। গাড়ি 'সপ্ত প্যাগোডা'র প্রবেশ পথের সামনে থামে।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাঞ্চীর রাজা পল্লব শ্রেষ্ঠ নরসিংহ বর্মণ মহা-মল্লম এখানে স্থাপন করেন একটি বন্দর, তাঁর নাম অনুসারে পরিচিত হয় সেই বন্দর মহামল্লপুরম বা মামাল্লাপুরম নামে। ক্রমে পরিণত হয় মামাল্লাপুরম ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দরে, হয় মহাসমৃদ্ধশালীও। নিয়ে যায় এখান থেকে ভারতের বাণিজ্যপোত দ্রব্য সম্ভার, নিয়ে যায় সিংহলে, জাভাতে, সুমাত্রাতে, নিয়ে যায় ব্রহ্মদেশে আর মালায়ায়, যায় সুদূর বিদেশেও, সঙ্গে করে নিয়ে যায় ভারতের সভ্যতা, ভারতের সংস্কৃতি আর কৃষ্টি। সমাগত হয় এখানে দেশ বিদেশের লোক, নিয়ে তাদের পণ্য আর সংস্কৃতি। পোতে পোতে ছেয়ে যায় তার সাগরের বুক, ভরে যায় সমুদ্রের তীর। মুখর হয়ে উঠে তার সৈকত কত বিভিন্ন আর বিচিত্র কলকণ্ঠে, হয় রাত্রি দিন। বিনিময় হয় পণ্যে পণ্যে, পণ্যে স্বর্ণে, বিনিময় হয় সংস্কৃতিতে আর কৃষ্টিতে, হয় সভ্যতায়।

পরিণত হয় মহাবলীপুরম, এক মহামিলন ক্ষেত্রে, মিলন হয় এখানে বিশ্বের মানবের।

আজ মামাল্লাপুরম হারিয়েছে তার পূর্ব গৌরব, পরিণত হয়েছে এক কীর্তিহীন, সমৃদ্ধিহীন দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে। কিন্তু এখানে পল্লব রাজারা রেখে গিয়েছেন দ্রাবিড় স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন, ছড়িয়ে আছে এর সমুদ্র সৈকতে, দ্রাবিড় স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের এক বিস্তৃত ইতিহাস, বিস্তৃত হয়ে আছে সৈকতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। শোভিত হয়ে আছে আদি দ্রাবিড় স্রষ্টা পল্লব রাজা মহেন্দ্র বর্মণের পাহাড় কেটে তৈরী মন্দির, শোভা করে আছে পল্লবরাজ রাজসীমার প্রথম পাথর দিয়ে তৈরী জলশয়ানের মন্দির। তাই আজ আসে এখানে দেশ বিদেশ থেকে দর্শকবৃন্দ, দেখে যায় তাঁদের কীর্তি, দিয়ে যায় শ্রদ্ধার অঞ্জলী, ডালি উজাড় করে। তাই অমর আজ মামাল্লাপুরম।

দেখি সপ্ত প্যাগোডা। একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে চারিটি রথ। একটি চল্লিশ ফিট উঁচু সম্পূর্ণ পাহাড় কেটে স্থপতি নির্মাণ করেন এই রথ বা মন্দিরগুলি। পরিচিত তারা দ্রৌপদীর, অর্জুনের, ভীমের, আর ধর্মরাজার রথ নামে। দেখি একের পর এক চারিটি রথ।

মন্দিরের চূড়ার আকৃতিতে নিমিত হয় দ্রৌপদীর রথের শীর্ষদেশ। আছে বাংলা দেশেও অনুরূপ রথ, কিন্তু নাই তাদের অঙ্গে কোন শিল্পসম্ভার। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি একটি অপরূপ চতুর্ভুজা লক্ষ্মীমূর্তি, স্থপতি দেওয়ালের অঙ্গে ক্ষোদিত করেছেন। ক্ষোদিত আছে দেওয়ালে অনেক নারী দ্বারপালও।

দ্রৌপদীর রথ দেখে অর্জুনের রথ দেখি। এই রথটির আকৃতি দ্রৌপদীর রথের প্রায় দ্বিগুণ, আছে তাতে দুইটি তলা। দ্রাবিড় মন্দিরের চূড়ার আকারে নির্মিত এই রথের শীর্ষদেশ। সাজান স্থপতি এই মন্দিরের বাইরের আর ভিতরের দেওয়াল, অনুপম গঠন দেব-দেবীর মূর্তি দিয়ে, আছে কত হর-পার্বতীর মূর্তিও। সাজান মন্দিরের শীর্ষদেশও।

দেখতে যাই ভীমের রথ। দৈর্ঘ্যে আটচল্লিশ, প্রস্থে ও উচ্চতায় আটাশ ফিট এই রথটি। নাই তার মস্তকের উপর কোন চূড়া, নির্মিত হয় সমান ছাদ। বাইরের দেওয়ালে ক্ষোদিত হয় দেব-দেবীর মূর্তি, প্রতীক দ্রাবিড়

স্থাপত্যের। বেষ্টিত হয়ে আছে রথটি একটি অনতি প্রশস্ত স্তম্ভযুক্ত অলিন্দে। অনবদ্য এই স্তম্ভের গঠন-সৌষ্ঠব, অঙ্গে নিয়ে আছে সুস্ত দ্রাবিড় শিল্পসম্ভার। দাঁড়িয়ে আছে এক একটি কেশরযুক্ত সিংহের উপর, বৈশিষ্ট্য মহাবলীপুরমের স্তম্ভের। নাই কোন কারুকার্য রথের ভিতরে, রয়ে গিয়েছে অসম্পূর্ণ অবস্থায়।

তারপর দেখি ধর্মরাজার রথটি। বৃহত্তম আর সুন্দরতম রথ এই গোষ্ঠীর, এই রথটি দৈর্ঘ্যে ২৭ প্রস্থে ২৯ আর উচ্চতায় ৩৫ ফিট। আছে এই রথে চারিটি তলা। নীচের তলায় নাই কোন শিল্পসম্পদ, সময় হয় নাই স্থপতির সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার। অপর তিনটি তলাকে অপরূপ শিল্পসম্ভারে শোভিত করেন স্থপতি। রচনা করেন রথের ভিতরে বহু ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, অপরূপ স্তম্ভ দিয়ে বেষ্টিত করেন সেই প্রকোষ্ঠগুলিকে। বিরাজ করেন সেই সব প্রকোষ্ঠে অসংখ্য চতুর্ভুজ আর চতুর্ভুজা দেব-দেবী, বিরাজ করেন শিব, ব্রহ্মা আর বিষ্ণু, করেন অর্ধনারীশ্বর আর নরসিংহ, তিনি হাঁটুর উপরে হিরণ্য-কশিপুকে শুইয়ে নখ দিয়ে তার পেট বিদীর্ণ করেন। আছেন বিষ্ণু বরাহ-মূর্তিতেও। অপরূপ তাঁদের গঠন সৌষ্ঠব, একেবারে জীবন্ত প্রতিমূর্তি। ক্ষোদিত আছে দেওয়ালের গায়ে কবিতাও। ঢালু ছাদ আর দেওয়ালের সন্ধিস্থলে রচিত হয় গবাক্ষ। গবাক্ষের চারিপাশেও স্থপতি ক্ষোদিত করেন অনবদ্য দেব-দেবীর মূর্তি, ক্ষোদিত হয় কবিতাও। দেখি অনুরূপ একটি কবিতা কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথের মন্দিরের অঙ্গেও। দেখি নাই এলোরাতে দেখি নাই এলিফ্যাণ্টাতেও। বাইরের দেওয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন সারি-সারি দ্বারপাল। চূড়ার আকারে নির্মিত হয় এই রথের ছাদ, শোভা পায় তাদের অঙ্গেও কত দেব-দেবীর মূর্তি, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের।

নেমে এসে দেখি সহদেবের রথ। বিভিন্ন তার গঠন প্রণালী, নির্মিত হয় বৌদ্ধ চৈত্যের বা ধর্ম মন্দিরের অনুকরণে চৈত্যের ছাদের অনুরূপ এই রথের ছাদটিও, তাই এই রথের বৈশিষ্ট্য। আছে এই রথের ভিতরেও অনেকগুলি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, বিরাজ করেন সেখানেও দেব-দেবী, ক্ষোদিত করেন মামাল্লা-পুরমের পল্লব ভাস্কর।

দেখি আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির, দেখি গুহা, দেখি মহিষাসুরের

মণ্ডপ, শোভাকরে আছে সেই মণ্ডপ এক অনবদ্য মহিষমর্দিনী মূর্তি, প্রকৃষ্টতম নিদর্শন পল্লব ভাস্কর্যের।

উপনীত হই গণেশ রথে। দেখতে মন্দিরের মত, আছে এই রথে তিনটি তলা। অতি সুন্দর এই রথের বা মন্দিরের গঠন সৌষ্ঠব। দু'পাশ থেকে ঢালু হয়ে সমতল ছাদটি নেমে আসে। শোভা পায় একটি শৈব ত্রিশূল সমতল অংশের এক প্রান্তে, শীর্ষদেশে নয়টি সূক্ষ্মাগ্র চূড়া, অতি মনোরম তাদের গঠন প্রণালীও, ছাদের অঙ্গে নির্মিত হয় গবাক্ষও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই রথটির অঙ্গের শিল্পসম্ভার, দেখি এর অঙ্গের ভাস্কর্যও। ক্ষোদিত আছে এই রথের পিছনের দেওয়ালে একটি লিপি, তাতে লেখা আছে রাজা অট্টনায়কম রণজয় দেবাদিদেব শিবকে দান করেন এই মন্দিরটি, তিনিই পল্লব-রাজ রাজসীমা, সপ্তদশ শতাব্দীতে অলঙ্কৃত করেন কাঞ্চীর সিংহাসন।

ক্ষোদিত আছে অনুরূপ একটি শিলালিপি ধর্মরাজার রথের তিনতলার পূর্ব দিকের দেওয়ালেও। লেখা আছে পুণ্যবান অট্টনায়কমের মন্দির। খুব সম্ভব নির্মিত হয় এই রথগুলি ৬৭০ থেকে ৭০০ খৃষ্টাব্দে।

প্রাচীনতম কীর্তি দ্রাবিড় স্থপতির এই রথগুলি, রেখে যান অসম্পূর্ণ অবস্থায়, করেন নাই সম্পূর্ণ রূপদান, করেন নাই মহান্ আর সূক্ষ্মতম, গড়েন ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি এক মহান্ আদর্শের। ঋষি তাঁরা, মামাল্লাপুরমের সৈকতে সৃষ্টি করেন এক ভবিষ্যৎ অতুল ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা, তাতে রূপ দান করেন ভবিষ্যৎ স্থপতিরা বহুশত বর্ষ ধরে, নির্মাণ করেন মন্দিরের চূড়া, দ্রৌপদীর, অর্জুনের আর ধর্মরাজের রথের অনুকরণে, গণেশের রথের অনুকরণে নির্মিত হয় গোপুরম, নির্মাণ করেন চিদাম্বরমে, শ্রীরঙ্গমে, তাঞ্জোরে, মাদুরাতে আর রামেশ্বরমে। নির্মিত হয় এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, লাভ করে মামাল্লা-পুরমের ক্ষুদ্র প্রতীক সম্পূর্ণ রূপ, পায় চরম উৎকর্ষ। সার্থক হয় মামাল্লাপুরমের ঋষির সম্ভাবনা, সফল হয় তাঁদের স্বপ্ন। অমর হন ঋষিরা, অমর হয় মামাল্লা-পুরমও ইতিহাসের পাতায়।

গণেশের রথের কাছেই দেখি এক অপরূপ শিল্পসম্ভার, নাম তার অর্জুনের তপস্যা। একটি ৯০ ফিট দীর্ঘ আর ৩০ ফিট প্রস্থ পাথরের বুকে স্থপতি ক্ষোদিত করেন অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি। তাদের মধ্যে আছে একটি

অপরূপ নাগমূর্তি, তার মস্তকে সাতটি ফণা শোভা পায়। তারপাশেই আছে একটি নাগিনীর মূর্তি, তিনটি ফণা বিস্তার করে আছে নাগিনী। তাদের নীচে একটি বিরাট সাপের মাথা। দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কত দেব-দেবী, দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে ঐ মূর্তি তিনটির দিকে। বামে একেবারে নিম্নতম প্রদেশে দাঁড়িয়ে আছেন একটি দেবতা, তাঁর সম্মুখে হাত জোড় করে একটি যোগী দেবতাকে স্তুতি করেন। তাঁদের পিছনে কয়েকটি বন্যজন্তু। দক্ষিণে, ক্ষোদিত আছে দুইটি অতি সুন্দর দর্শন বিশালকায় হস্তিমূর্তি। আছে কয়েকটি ক্ষুদ্র হস্তিমূর্তিও। মাথার উপরে শোভা পায় উড়ন্ত গন্ধর্ব আর গন্ধর্বিনীর দল। যেমন সুষ্ঠু গঠন এই মূর্তিগুলি, তেমনই জীবন্ত তাদের প্রতিকৃতি। এক মহিমাময় পরিকল্পনার সূক্ষ্মতম রূপদান, নিদর্শন অষ্টম শতাব্দীর দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, দেখি শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে, প্রণাম জানাই তাদের সৃষ্টি কর্তাকে, জানাই শিল্পীদেরও, সঙ্গে নিয়ে আসি এক অক্ষয় স্মৃতি, যা আজও অম্লান হয়ে আছে।

ফিরে আসি সমুদ্র সৈকতে, দেখি জলশয়ানের মন্দির বা 'শোর' মন্দির। প্রাচীনতম পাথর দিয়ে তৈরী এই মন্দিরটি, নির্মিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, নির্মাণ করেন পল্লব রাজা রাজসীমা। সমুদ্রের গর্ভে অর্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি। বিরাজ করেন এই মন্দিরের গর্ভগৃহে দুইটি দেবতা, শিব আর বিষ্ণু, আছে দুটি সুন্দর চূড়া, অঙ্গে নিয়ে দ্রাবিড় শিল্প-সম্ভার। আছে, প্রাচীরের অঙ্গেও দেবীর মূর্তি, মূর্তি সিংহের আর হাতীর। দেখে মনে হয় বঙ্গোপসাগরের বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে মন্দির, কোলে নিয়ে আছে দুই দেবতাকে, তাই পরিচিত জলশয়ানের মন্দির নামে। দেখে বিস্মিত হই সাগরের খেলা। আসে অমিত বিক্রমে, ঝাঁপিয়ে পড়ে মন্দিরের উপর, স্পর্শ করে দেবতার পা, ধুয়ে দেয় অতি যত্নে, তারপর চলে যায় দিগন্তের পানে। ভেসে ওঠেন দেবতা, ভেসে ওঠে মন্দির সাগরের বুকে। চলে এই খেলা বিরামহীন, রাত্রিদিন, চলে যুগের পর যুগ। মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসে দেখতে থাকি এই খেলা, দেখি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে, ঠিক পাই না কখন ভিজে যায় সর্বাঙ্গ, ভিজে যায় তরঙ্গের জলে।

ফিরে আসি মাদ্রাজে। সঙ্গে নিয়ে আসি এক অক্ষয় স্মৃতি।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## চিদাম্বরম ঃ নটরাজনের মন্দির

আরও দু'দিন মাদ্রাজে কাটাই, দেখি যা কিছু দর্শনীয় আছে মাদ্রাজ শহরে। তৃতীয় দিন রাত্রি ৯॥টায়, এগমোর ষ্টেশনে এসে কুডালুর প্যাসেঞ্জারে চড়ি। সকাল ৭॥টায় ট্রেন কুডালুর নিউ টাউন ষ্টেশনে পৌছায়।

সেইদিনই খাওয়া-দাওয়া সেরে ৩০ মাইল দূরে চিদাম্বরম দেখতে রওনা হই।

সেই রাস্তার দু'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত আর তার মাঝে মাঝে কলাগাছের শ্রেণী আর নারিকেলকুঞ্জ সৃষ্টি করে এক রমণীয় পরিবেশ। দেখা যায় গ্রামও বেষ্টন করে আছে মন্দিরকে। গাড়ি এসে থামে এক সেতুর পারে, তার পাশেই একটি গৃহস্থের বাড়ি, ছুটে আসে ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল, দেখে যায় গাড়ি। সেতু অতিক্রম করে গাড়ি, উপনীত হয় চিদাম্বরম শহরে, এসে থামে নটরাজনের মন্দিরের দরজায়। একটি তামিল যুবক আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন। আমরা গাড়ি থেকে নেমে তাঁর সঙ্গে মন্দির দেখতে যাই, যাই নটরাজনকে দর্শন করতে।

দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম মন্দিরগুলির অন্যতম এই মন্দিরটি, নির্মিত হয় তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দিরের অল্প কিছু দিন পরে।

আছে 'কোঙ্গদেশ রাজকাল' নামে একখানি বই, তাতে এই মন্দিরের সৃষ্টির ইতিহাস লেখা আছে।

একদিন সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণ করতে যান রাজা বীরনারায়ণ চোল রায়, কানে আসে ডমরুর আওয়াজ। দেখেন ডমরু বাজাতে বাজাতে আসছেন চিদাম্বরমের সভাপতি, দেবাদিদেব মহাদেব, আসছেন নৃত্যের ছন্দে। তাঁর সঙ্গে আছেন পার্বতী। রাজা বিস্মিত হন এই দৃশ্য দেখে, পরে সেই স্থানেই সোনা দিয়ে নির্মাণ করেন একটি সভাগৃহ, তার নাম রাখা হয় 'কনক সভা'। সেই সভাগৃহে প্রতিষ্ঠিত হন এক দেবতা, সেই দেবতাই চিদাম্বরম।

৯৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর পৌত্র প্রথম রাজা রাজ চোল সেই কনক সভাকে বেষ্টন

করে এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণ নির্মাণ করেন। অপরূপ গোপুরম দিয়ে সাজান প্রবেশ পথগুলিকে। নির্মিত হয় এক সুন্দর পাথরের মণ্ডপ, আর অনবদ্য সভাগৃহ। মূল্যবান্ জড়োয়ার অলঙ্কারে ভূষিত হন দেবতাও। লেখা আছে মন্দিরের অঙ্গেও, রাজা বীরনারায়ণ চোল সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেন এই মন্দিরের ছাদ। তিনিই ইতিহাসের পাতায় প্রথম প্রান্তক নামে খ্যাত। তিনিই নির্মাণ করেন কনক সভা। লেখা আছে আরও একটি ক্ষোদিত লিপিতে রাজা রাজ চোল নির্মাণ করেন এই প্রাঙ্গণটি, নির্মিত হয় ১০১৮ থেকে ১০৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

উত্তরের প্রবেশদ্বারের গোপুরমটিই সুন্দরতম, বুকে নিয়ে আছে সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, দ্রাবিড়ী স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় সৃষ্টির। ১৪০ ফিট উঁচু এই গোপুরমটি, ১৫২০ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন বিজয়নগরের অধিপতি কৃষ্ণদেব রায়। সমসাময়িক কাঞ্চীপুরমের একাম্বরনাথের মন্দিরের গোপুরমের, পড়ে সমপর্যায়েও।

পূর্ব প্রবেশদ্বারের গোপুরমটিও ১২৫০ খৃষ্টাব্দে পাণ্ড্যরাজা সুন্দর পাণ্ড্য নির্মাণ করেন। জানা যায় গোপুরমের অঙ্গের এক লিপি থেকে। নির্মিত হয় সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহটি ১৫৯৫ থেকে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। নির্মাণ করেন মাদুরার নায়ক রাজারা, এই সময়েই উপনীত হয় দ্রাবিড় স্থাপত্য উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে।

মন্দিরের বিগ্রহের নাম নটেশ বা নটরাজন। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম জাগ্রততম দেবতা এই নটরাজন, পবিত্রতম এই মন্দির। বিরাজ করেন এই মন্দিরে দেবাদিদেব মহাদেবের পঞ্চম বা আকার লিঙ্গম, পবিত্রতম পাঁচটি পবিত্র লিঙ্গের মধ্যে। নাই এই লিঙ্গের কোন বাস্তব রূপ। তাই এত প্রসিদ্ধি এই মন্দিরের, পরিণত হয় চিদাম্বরম ভারতের অন্যতম মহাতীর্থে।

কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথের মন্দিরে বিরাজ করেন পৃথ্বী লিঙ্গম, পৃথ্বী দিয়ে রচিত হয় সেই লিঙ্গম। তিরুচুরাপল্লীর জম্বুকেশ্বরের মন্দিরে বিরাজ করেন অপোলিঙ্গম, নির্গত হয় বারি সেই লিঙ্গম থেকে। তিরুভানমালাই-এর মন্দিরে তেজোলিঙ্গম বিরাজ করেন, নির্গত হয় সেই লিঙ্গম থেকে আলোক। কালা-হস্তিতে বিরাজ করেন বায়ুলিঙ্গম, সেই বায়ুতে প্রকম্পিত হয় আলোক। তাই খ্যাতিলাভ করে এই পাঁচটি মন্দিরই, মহাপবিত্র এই স্থানগুলি।

এক বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে, পরিধি তার একশ ষোল বিঘে। প্রাঙ্গণটিকে বেষ্টন করে আছে একটি স্ফটিক পাথরে তৈরী উঁচু প্রাচীর। পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে চারিটি প্রবেশপথে শোভাপায় চারিটি গোপুরম, তাদের অঙ্গে আর শীর্ষদেশে শোভা পায় কুলুঙ্গির ভিতরে কত দেব-দেবীর মূর্তি, প্রকৃষ্টতম নিদর্শন দ্রাবিড় ভাস্কর্যের, নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের।

দেখি ঘুরে ঘুরে গোপুরমের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভার, দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে। তারপর পশ্চিম গোপুরম দিয়ে প্রবেশ করে, প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে ভিতরের বেষ্টনীতে পৌছাই। উপস্থিত হই নটরাজনের মন্দিরে, দর্শন করবো নটরাজনকে। পরনের শার্ট আর গেঞ্জি খুলে ধুতিখানি কোমরে জড়িয়ে নিতে হয়, নইলে প্রবেশ করা যাবে না মন্দিরের চাতালে। প্রচলিত এই রীতি, দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ মন্দিরেই। তারপর, পূজার উপকরণ হাতে নিয়ে সোপান অতিক্রম করে মন্দিরের বারান্দায় উপনীত হই। পাশে আছেন গৃহিণী, আছেন সঙ্গীটিও, তিনিই বলে দেন আমাদের কি করণীয়।

তিনটি পৃথক অংশে বিভক্ত এই মন্দিরটি। কেন্দ্র স্থলে কনক সভা, অন্তরতম প্রদেশে নৃত্য সভা আর তাদের মাঝখানে চিত সভা। দেখি সামনেই কেন্দ্র স্থলে বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছেন নটেশ, আছেন নৃত্যের ভঙ্গিতে, অপরূপ তাঁর গঠন ভঙ্গিমা আর অঙ্গের সৌষ্ঠব, নৃত্য করেন অনবদ্য ছন্দে। তাঁর সোনার অঙ্গে শোভাপায় বহু মূল্য জড়োয়ার অলঙ্কার। দেখি নাই এমন সুন্দর শোভন মূর্তি নটরাজের এর আগে, দেখি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে, দেখে হয় না পরিতৃপ্তি।

কাঠ দিয়ে তৈরী এই মন্দিরটি একটি প্রস্তর নির্মিত মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বেদীর সামনে শোভা পায় একটি চন্দ্রাতপ, দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রাতপটি কয়েকটি অনবদ্য শিল্প সম্ভারে শোভিত স্তম্ভের উপর। চন্দ্রাতপের প্রবেশ পথে তৈরী হয় একটি অতি সুন্দর গোপুরমও। সোনার পাত দিয়ে মোড়া আছে মন্দিরের ছাদটি, তাই পরিচিত কনক সভা নামে।

কনক সভার পিছনেই চিত সভা, এইখানেই বিরাজ করেন মন্দিরের বিগ্রহ পবিত্রতম লিঙ্গম, বিরাজ করেন 'চিত' লিঙ্গম। তিনিও একটি

কাঠের- সিংহাসনে বিরাজ করেন, বেষ্টিত থাকেন আভরণে আর বেল পাতার মালায়—

নির্মাণ করেন স্থপতি নৃত্য সভা, এক স্বপ্নপুরী, এক ইন্দ্রলোক। নির্মাণ করেন একটি ক্ষুদ্র বেদীর উপর এক অলোক সামান্য চন্দ্রাতপ, দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রাতপটি আট ফিট উঁচু ছাপ্পান্নটি স্তম্ভের উপর, তাদের অঙ্গে আর শীর্ষ দেশে ক্ষোদিত করেন যুগ যুগ ধরে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, রেখে যান দ্রাবিড় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, নিদর্শন এক অমর কীর্তির, এক সুন্দরতম সৃষ্টির। দেখি নাই এমন সুষ্ঠু গঠন, সূক্ষ্মতম শিল্প সম্ভারে ভূষিত স্তম্ভ দক্ষিণ ভারতের অন্য কোন মন্দিরে। বেদীর পাশে শোভা পায় চক্র আর অশ্ব, প্রতীক রথের। এই রথে করেই নৃত্য করতে করতে এসেছিলেন চিদাম্বরমের সভাপতি, দেবাদিদেব মহাদেব, দর্শন দিয়েছিলেন সমুদ্র সৈকতে রাজা বীর চোলকে, তারই স্মৃতি বুকে নিয়ে আছে এই নৃত্য সভা, স্মারক এক পুরাকাহিনীর।

প্রবেশ নিষিদ্ধ মন্দিরের ভিতরে। তাই দেখতে হয় কনক সভা চিত সভা আর নৃত্য সভা, দরজার উপর, পূজারীর পাশে দাঁড়িয়ে, তিনিই বুঝিয়ে দেন সব। আমরা দেখি বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে।

এমন সময় বেজে ওঠে আরতির ঘণ্টা, সামনের নাট মন্দিরে দাঁড়িয়ে নটেশের আরতি দেখে বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসি, প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে পার্বতীর মন্দির দেখতে যাই।

দেখি এক অপরূপ চন্দ্রাতপ, দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলি অনবদ্য স্তম্ভের উপর, বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলিও সূক্ষ্মতম সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, প্রতীক দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের। সৃষ্টি হয় এক সৌন্দর্যের প্রস্রবণ। এই চন্দ্রাতপে তিনটি গলিপথ আছে, বাইরেরটি প্রস্থে ৬ ফিট, তার পরেরটি ৮ আর কেন্দ্র-স্থলেরটি ২১ ফিট। পঞ্চাশ ফিট পরিধি নিয়ে বিস্তৃত হয়ে আছে গলিপথগুলি, দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ কারুকার্য সমন্বিত স্তম্ভের উপর। একটি দ্বিতল মঞ্চ বা গ্যালারি বেষ্টন করে আছে চন্দ্রাতপকে, নির্মিত হয় একটি অপরূপ মন্দির, পরিচায়ক প্রকৃষ্টতম স্থাপত্য জ্ঞানের। দেখি অনেকক্ষণ ধরে মন্দিরটি, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। শিল্পীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে দেখতে যাই সুব্রমনিয়ামের মন্দির।

শিবের পুত্র সুব্রমনিয়াম, দেবসেনাপতি, প্রিয়তম দেবতা দক্ষিণ ভারতের। তিনিই উত্তর ভারতের কার্তিকেয়। খুব সম্ভব সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই মন্দির নির্মিত হয়। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও দ্রাবিড় স্থাপত্যের সুন্দরতম নিদর্শন।

সুব্রমনিয়ামের মন্দির দেখে আমরা সহস্র স্তম্ভ যুক্ত সভাগৃহ দেখতে যাই, যাওয়ার আগে স্পর্শ করে যাই শিব গঙ্গার পবিত্র জল। এই মন্দিরের পবিত্র পুষ্করিণী (টেপাকুলম) এই শিব গঙ্গা, জুড়ে আছে বাইরের প্রাঙ্গণের অনেকখানি স্থান। এর দক্ষিণে বেষ্টনীর মধ্যে আছে নটেশের মন্দির, আছে কনক সভা, চিত সভা আর নৃত্য সভা, পূর্বে সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ পশ্চিমে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে পার্বতীর আর সুব্রমনিয়ামের মন্দির।

এই সভাগৃহটি প্রস্থে ১৯৭ আর দৈর্ঘ্যে ৩৩৮ ফিট। সামনের সারিগুলিতে ২৮টি করে স্তম্ভ, গভীরতায় ৪১টি করে। স্ফটিক পাথরে তৈরী প্রতিটি স্তম্ভ, অঙ্গে আর শীর্ষদেশে শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন। তাদের অঙ্গে পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক একটি ঘোড়া, দাঁড়িয়ে আছে কত বিভিন্ন আর বিচিত্র ভঙ্গিতে, পিঠে নিয়ে আছে অশ্ব এক একটি সুন্দর শোভন গঠন নারী, এক একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি। করা হয় এক অপূর্ব সমন্বয় স্তম্ভের গঠনের আর অঙ্গের কারুকার্যের সঙ্গে, অশ্বের অঙ্গ সৌষ্ঠবের আর নারীর সৌন্দর্যের। খিলানের আর ব্রাকেটের উপর রচিত হয় মণ্ডপের ছাদ, ব্যতিক্রম কাঞ্চীপুরমের সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহের সঙ্গে। ব্যতিক্রম পূর্বেকার তৈরী ছাদের সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতিতে রচিত হয় পার্বতীর মন্দিরের ছাদও। খুব সম্ভব সমসাময়িক পার্বতীর মন্দির সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভা গৃহের। প্রথমে মুসলমান স্থপতিই দক্ষিণ ভারতে নির্মাণ করেন ব্রাকেট আর খিলানের সাহায্যে ছাদ, তাদেরই অনুকরণে এই দুটি ছাদ নির্মিত হয়।

আমরা ঘুরে ঘুরে স্তম্ভগুলির অপরূপ শোভা দেখি, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। এসে বসি কেন্দ্রস্থলটিতে, মনে হয় বসে আছি এক স্ফটিক পাথরের অরণ্যের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, বেষ্টিত হয়ে আছে অপরূপ শিল্প সম্ভারে, ভূষিত মহিমাময় স্তম্ভে। ভাবতে থাকি কোথায় পান স্থপতি এমন মহিমাময় পরিকল্পনা, আর কেমন করে করেন তাতে এমন অনবদ্য রূপদান। কি যন্ত্র দিয়ে কাটেন

পাথরের অঙ্গ, গাড়েন তাদের অঙ্গে এই সব সুন্দর শোভন মূর্তি, রচনা করেন এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, কতদিনে? অমর হন নিজেরা, দান করেন অমরত্ব দ্রাবিড় স্থাপত্য-শিল্পকে, দেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের শিল্পের দরবারে। অমর হয় ভারতবর্ষ ইতিহাসের পাতায়। শ্রদ্ধা জানাই মন্দিরের সৃষ্টি কর্তাকে, জানাই শিল্পীদেরও। সঙ্গে করে নিয়ে আসি এক স্মৃতি যা আজও মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে আছে, হয়নি ম্লান।

মন্দির দর্শন শেষ করে আমরা আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রামনাদের স্যার আন্নামালাই চেট্টি চিদাম্বরমে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। এই রামনাদেই ছিল সেতুবংশের রাজধানী, তাঁরাই নির্মাণ করেন রামেশ্বরমের মন্দির, বুকে নিয়ে আছে মন্দির এক গৌরবময় সৃষ্টি, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের।

দশ মাইল পরিধি নিয়ে বিস্তৃত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা—আছে এখানে ১৯টি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, ব্যবস্থা আছে ছাত্রদের বাসেরও।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## তাঞ্জোর ঃ

১। বৃহদীশ্বরের মন্দির  ২। সুব্রমনিয়ামের মন্দির

দেখা হয় চিদাম্বরমে নটরাজনের মন্দির, দেখে আসি পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমও। তার পরের দিন ভোরের ট্রেনে বৃহদীশ্বরের মন্দির দেখতে তাঞ্জোর অভিমুখে রওনা হই।

বেলা তখন তিনটে, ট্রেন তাঞ্জোর ষ্টেশনে এসে দাঁড়ায়। আমরা ট্রেন থেকে নেমে পড়ে, পিওনের জিম্মায় জিনিসপত্র প্লাটফর্মের উপর রেখে ছুটি। অতিক্রম করি প্লাটফর্ম, পার হই রেলের লাইন, ডিঙ্গিয়ে যাই ষ্টেশন প্রাঙ্গণের কাঁটা তারের বেষ্টনীও। কিছু দূর একটি রুক্ষ উঁচু নীচু পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে, মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের সামনে উপস্থিত হই। যেতে পাঁচ মিনিট লাগে, সংক্ষিপ্ত হয় দূরত্ব আর সময়ের।

দূর থেকে দেখে মনে হয়—পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল দুর্গ। দুর্গ নয়, দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট মহিমাময় মন্দির। মন্দির বৃহদীশ্বরের, অঙ্গে নিয়ে আছে দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পরিচিত এই মন্দিরটি রাজরাজেশ্বর নামেও।

প্রবেশদ্বারে শোভা করে আছে একটি গোপুরম, তার অঙ্গে আর শীর্ষদেশে স্থপতি অপরূপ শিল্পসম্ভার ক্ষোদিত করেন। ক্ষোদিত করেন বহু বিষ্ণু মূর্তিও। খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, মন্দির নির্মাণের বহুশত বর্ষ পরে এই গোপুরমটি নির্মিত হয়। এই সময়েই দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। উচ্চতাতেও এই গোপুরমটি অন্য দ্রাবিড় মন্দিরের গোপুরমের সমপর্যায়ে পড়ে না, সমপর্যায়ে পড়ে না মন্দিরের চূড়াও। কিন্তু সৃষ্টি হয় এক অপরূপ সমন্বয় মন্দিরের চূড়ায় আর গোপুরমে, নাই এই সমন্বয় দক্ষিণ ভারতের অন্য কোন মন্দিরে।

অন্য সমস্ত মন্দিরের গোপুরমকে মধ্যমণির স্থান দেওয়া হয়, সাজান স্থপতি তার অঙ্গ আর শীর্ষদেশ অনবদ্য শিল্পসম্ভারে, রচনা করেন এক একটি সৌন্দর্যের

প্রস্রবণ। তাই নিষ্প্রভ হয় মন্দিরের, চূড়ার উচ্চতা গোপুরমের চূড়ার উচ্চতার তুলনায়, হয় তার অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প সম্পদেও। ব্যতিক্রম শুধু তাঞ্জোরে, বৃহদীশ্বরের মন্দিরে। দেন স্থপতি মন্দিরকে আর মন্দিরের চূড়াকেই শ্রেষ্ঠ স্থান, করেন মধ্যমণি। নির্মাণ করেন এক গগন-স্পর্শী চূড়া বা বিমান, ক্ষোদিত করেন তার অঙ্গে আর শীর্ষদেশে অনবদ্য শিল্প সম্ভার। রচনা করেন এক বিরাট মহিমাময় পরিকল্পনা, করেন তাতে সূক্ষ্মতম রূপদান, গড়েন এক সৌন্দর্যের নিকেতন, এক ইন্দ্রপুরী, পরিচয় দেন দ্রাবিড় স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের। রেখে যান শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের।

গোপুরমের ভিতর দিয়ে আমরা প্রবেশ করি একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২৫০ ফিট এই প্রাঙ্গণটি, আছে তার কেন্দ্রস্থলে একটি বেদী। বেদীর চারিদিকে আছে অনেকগুলি ঘর, নির্মিত হয় যাত্রীদের থাকবার জন্য। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে, মন্দির যখন ফরাসী সেনাপতি লালীর অধিকারে আসে, বারুদের গুদামে পরিণত হয় এই ঘরগুলি। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে, ইংরাজ লালীকে পরাজিত করে এই মন্দির অধিকার করেন, ইংরাজের শিবিরে পরিণত হয় এই মন্দির। শেষে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সাহজী অধিকার করেন এই মন্দির, মন্দির আসে হিন্দুর অধিকারে, সুরু হয় দেবতার পূজাও।

প্রথম প্রাঙ্গণটি অতিক্রম করে আমরা দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই। এই প্রাঙ্গণটির প্রস্থে প্রথমটির সমান, কিন্তু দৈর্ঘ্যে দ্বিগুণ। কিছু দূর অগ্রসর হতেই দেখি দেবতার বাহন নন্দীর মণ্ডপ। পা গুটিয়ে; মঞ্চের উপর বসে আছেন এক অতিকায় নন্দী ( ষাঁড় ) মন্দিরের দিকে মুখ করে। একটি সম্পূর্ণ স্ফটিক পাথর কেটে তৈরী করা হয় এই মূর্তিটি, দৈর্ঘ্যে ষোল ফিট, প্রস্থে সাত আর উচ্চতায় দশ ফিটের কিছু বেশী। রচনা করা হয় এক নিখুঁত প্রাণবন্ত মূর্তি, অনবদ্য তার অঙ্গের গঠন সৌষ্ঠব। দেখি নাই আগে এমন সুন্দর শোভন মূর্তি, নন্দীর। পরে দেখেছি অনুরূপ মূর্তি, ত্রিবেন্দ্রামের পথে সুচিন্দ্রমের মন্দিরে, দেখেছি মহীশূরে, চামুণ্ডা পাহাড়ে। নির্মিত তারাও এক একটি সম্পূর্ণ স্ফটিক পাথর কেটে, সমপর্যায়ে পড়ে এই নন্দীটির। সোপান অতিক্রম করে মঞ্চের উপরে উঠে দেখি এই নন্দীকে, বিস্ময়ে মুগ্ধ হই দেখে।

নন্দী মণ্ডপ থেকে কিছু দূরে, বৃহৎ প্রাঙ্গণের একেবারে প্রান্তদেশে, দাঁড়িয়ে

আছে বৃহদীশ্বরের বিশাল মন্দির, স্পর্শ করে আছে আকাশ, দাঁড়িয়ে আছে চোল স্থপতির এক অনুপম সৃষ্টি, এক গৌরবময় কীর্তি, প্রতীক চরমোৎকর্ষের।

নির্মাণ করেন একটি বিরাশি স্কোয়ার ফিট চতুষ্কোণ ভিত্তি, তৈরী হয় স্ফটিক প্রস্তরে। দোতলা সমান উঁচুতে ঋজু হয়ে উঠে যায় সেই ভিত্তি। নির্মিত হয় তার উপর একশ নব্বই ফিট উঁচু সূক্ষ্মাগ্র চূড়া, আকার তার 'পিরামিডের' মত, আছে তাতে তেরটি তলা। শীর্ষদেশে শোভা পায় একটি অপরূপ গম্বুজ, অঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন আর বিচিত্র শিল্প সম্ভার, রচিত সেটিও একটি মাত্র স্ফটিক প্রস্তরে। ক্ষোদিত করেন স্থপতি ভিত্তি আর চূড়ার সর্বাঙ্গ, রচনা করেন কত অসংখ্য কুলুঙ্গি আর প্রকোষ্ঠ, বিরাজ করেন কত দেব-দেবী সেই সব কুলুঙ্গিতে আর প্রকোষ্ঠে। বিরাজ করেন কত হর-পার্বতী, কত কালভৈরব, কত গৌরী, কত নটরাজ, কত অর্ধনারীশ্বর, বিরাজ করেন বিভিন্ন আর বিচিত্র ভঙ্গিতে। শৈব মন্দির, এই বৃহদীশ্বরের বিগ্রহ শিব লিঙ্গ, তাই হর-পার্বতীর বিভিন্ন লীলা দিয়ে শোভিত করা হয় মন্দিরের সর্বাঙ্গ, আর চূড়ার অঙ্গ। অনবদ্য তাদের গঠন ভঙ্গিমা, সূক্ষ্মতম তাদের প্রকাশ, পরিচয় দেয় শিল্পীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য জ্ঞানের। ক্ষোদিত করা হয় এই সব কুলুঙ্গি আর প্রকোষ্ঠের ফাঁকে ফাঁকে কত লতা, কত পল্লব, কত ফুল, যেমন অনুপম তেমনই সূক্ষ্ম, রচিত হয় এক সৌন্দর্যের নন্দন কানন।

একটি নীচু চাঁদ্‌নি মন্দিরের প্রবেশ দ্বার শোভা করে আছে। তার দেওয়ালেও ক্ষোদিত আছে অনেক দেব-দেবীর মূর্তি, মূর্তি আছে কার্ত্তিক গণেশেরও, বুকে নিয়ে আছে চন্দ্রাতপটিও দ্রাবিড় স্থাপত্যের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন।

এক উদ্ধত মহিমাময় মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি, হ'য়েছে এক অপূর্ব সমন্বয় সামনের গোপুরমের সঙ্গে আর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে।

মন্দিরের অঙ্গের ক্ষোদিত লিপি থেকে জানা যায়, নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি চোল রাজা দ্বিতীয় প্রান্তকের পুত্র রাজা রাজদেব চোল। নির্মাণ সুরু হয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে, সমাপ্ত হয় ১০১২ খৃষ্টাব্দে। তিনি এই মন্দিরের দেবতাকে, বহু সোনার মূর্তি, স্বর্ণপাত্র আর মূল্যবান্ অলঙ্কার দান করেন। তিনিই নাগ পট্টমের বৌদ্ধ মন্দিরকে একটি গ্রাম দান করেন।

দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রাচীন জাতি এই চোল, বিস্তৃত ছিল তাঁদের পিতৃভূমি পূর্ব উপকূল দিয়ে, দক্ষিণে তার পাণ্ড্যদেশ, কাবেরীর উপত্যকা, আর কোলেবান নদী আর উত্তরে পালার নদী। চোলমণ্ডল নামে পরিচিত ছিল এই ভূভাগটি, পরে করোমণ্ডল নামে পরিবর্তিত হয়। এখনকার তাঞ্জোর, ত্রিরুচুরাপল্লী আর পাদু কোটার কিছু অংশ নিয়ে এই ভূভাগটি গঠিত। পশ্চিমে, তাদের রাজ্যের সীমানা মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ছিল আরও দুইটি প্রাচীন জাতি দক্ষিণ ভারতে, ছিল পাণ্ড্য আর চের বা কেরল। প্রাচীনতম তাদের মধ্যে পাণ্ড্য, অধিবাসী তারা দক্ষিণ প্রত্যন্ত প্রদেশের।

জানা যায় না কে আর কবে স্থাপন করেন এই চোলরাজ্য. তাদের নাম উল্লেখ আছে সম্রাট অশোকের দ্বিতীয় শিলালিপিতে, তখনও তারা ছিল এক স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি।

লেখা আছে প্রাচীন তামিল বই-এ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রবল হন এক চোলরাজা, পরিচিত কারিকল নামে, তিনি চের আর পাণ্ড্য রাজ্য জয় করেন, সিংহল পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন। টলেমীর বিবরণেও লেখা আছে মহাসমৃদ্ধিশালী চোলেরা বাণিজ্যপোত পণ্য সম্ভারে ভরে নিয়ে পাড়ি দিত বঙ্গোপসাগর, ব্যবসা করতো দেশে বিদেশে।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে পতন হয় দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র সাতবাহনদের, মহাপরাক্রমশালী হন পল্লব, স্থাপন করেন এক বিশাল সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতে, কাঞ্চীপুরমে স্থাপিত হয় তাঁদের রাজধানী। প্রত্যন্ত সীমায় প্রবল হন পাণ্ড্যরাও, ক্রমে অস্তমিত হয় চোলের ক্ষমতা, শেষে লুপ্ত হয় একেবারে, আসেন তাঁরা পল্লবের অধিকারে। অরণ্যে পরিণত হয় তাঁদের রাজধানী, বলেন চীন পরিব্রাজক হিউ-এন স্যাং।

শেষ হয়ে আসে নবম শতাব্দী, বিজয়ালয় চোল ছিন্ন করেন অধীনতার পাশ, হন স্বাধীন রাজা, তাঞ্জোরে স্থাপন করেন তাঁর রাজধানী। তাঁর পুত্র প্রথম আদিত্য ৮৬২ খৃষ্টাব্দে পরাজিত করেন শেষ পল্লব রাজা অপরাজিত বর্মণকে, অধিকার করেন কাঞ্চীর সিংহাসন। রাজধানী স্থানান্তরিত হয় তাঞ্জোর থেকে কাঞ্চীপুরমে। দক্ষিণ ভারতের রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হন

পল্লব। পরাজয় স্বীকার করতে হয় মহীশূরের গঙ্গরাজকেও, বিস্তৃত হয় চোল রাজ্যের সীমানা কাবেরী থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত

তাঁর পুত্র, প্রথম পরান্তক, পরাজিত করেন পাণ্ড্য রাজাকে, তাঁদের রাজধানী মাদুরা আসে চোলের অধিকারে। তিনিই চিদাম্বরমে নটরাজনের মন্দিরের কনক সভা নির্মাণ করেন, সোনাদিয়ে রচিত হয় তার ছাদ।

৯৮৫ খৃষ্টাব্দে চোল সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, প্রথম রাজারাজ, শ্রেষ্ঠ রাজা চোল বংশের। প্রবলতম হয় চোল দক্ষিণ ভারতে হয় মহাপরাক্রমশালী, আবার পরাজিত হন পাণ্ড্যরাজা অধিকৃত হয় তাঁদের রাজধানী মাদুরা। পরাজিত হন সিংহল আর মহীশূরের রাজাও,চোলের অধিকারে আসে সিংহলের এক বিস্তৃত অংশ, আসে মহীশূরও। পরাজয় স্বীকার করতে হয় চালুক্য রাজা সত্যাশ্রয়কেও। বাড়ে রাজ্যের সীমানা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় রাজধানী। তিনিই নির্মাণ করেন তাঞ্জোরে এক বিশাল মহিমাময় মন্দির, নিদর্শন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির, চোল স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির। অপরূপ গোপুরম দিয়ে শোভিত করেন চিদাম্বরমের নটরাজনের মন্দির, নির্মাণ করেন এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, বেষ্টন করে প্রাঙ্গণ তাঁর পিতামহের অমর কীর্তি কনক সভা। নির্মিত হয় নটরাজনের মন্দিরে অপরূপ মণ্ডপ আর সভাগৃহ, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার, অমর হয় চিদাম্বরম আর তাঞ্জোর ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, সৌভাগ্যবান হয় ভারতবর্ষ, পায় শ্রেষ্ঠ স্থান বিশ্বের দরবারে।

তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোলদেব ১০৪২ খৃষ্টাব্দে অধিরোহণ করেন চোল সিংহাসনে। মহাপরাক্রমশালী তিনিও, পরাজিত করেন কল্যাণের চালুক্য আর মহীশূরের গঙ্গরাজকে। পরাজিত হন বাংলার মহীপালদেবও। তাঁর বিজয়বাহিনী গঙ্গার তটভূমিতে প্রবেশ করে। তিনি গঙ্গাইকোণ্ড্রা উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর নৌবাহিনী অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগর, যায় জয় যাত্রায়। বিস্তৃত হয় তাঁর অধিকার মালয়ে, সুমাত্রাতে আর যবদ্বীপে। তিনি ত্রিচীনো-পল্লীতে স্থাপন করেন দ্বিতীয় রাজধানী। সক্ষম হন নাই ভারতের অন্য কোন রাজা অধিকার বিস্তার করতে ভারতের বাইরে এত দূর দেশে, বিস্তার করতে পারেন নাই ভারতের সভ্যতা আর কৃষ্টি, হন নাই এমন পরাক্রমশালী, স্থাপন করতে পারেন নাই এমন বিশাল সাম্রাজ্য।

অধিরোহণ করেন চোল সিংহাসনে ১০৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ, এক পরাক্রমশালী রাজা। তিনি পরাজিত করেন কলিঙ্গ রাজা অনন্ত বর্মণকে, কলিঙ্গদেশ হয় চোল সামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বাড়ে সাম্রাজ্যের সীমানা।

প্রবল প্রতাপান্বিত থাকে চোল দক্ষিণ ভারতে দশম, একাদশ আর দ্বাদশ শতাব্দীতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকেই সুরু হয় তাদের পতন। স্বাধীন হন একে একে সামন্ত রাজারা, হন হোয়সল, পাণ্ড্য আর কাকতীয়েরা। শেষে ১৩১০ খৃষ্টাব্দে তাঁদের বিস্তৃত সাম্রাজ্য দিল্লীর সম্রাট সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর অধিকারে আসে। জয় করেন তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর। বিজয় নগর অধিকার করেন এই রাজ্য মুসলমানদের হাত থেকে। পতন হয় বিজয় নগরের, নায়করা অধিকার করেন এই রাজ্য। তাদের হাত থেকে আসে মহারাষ্ট্রদের হাতে।

আমরা সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে চন্দ্রাতপ দেখে মন্দিরে প্রবেশ করি। দেখি দাঁড়িয়ে আছেন গর্ভগৃহে এক অতিকায় শিবলিঙ্গ। শুনি তের ফিটেরও বেশী উঁচু এই লিঙ্গটি, পরিচিত বৃহদীশ্বর নামে, বলা হয় রাজ-রাজেশ্বরও। দেখে বিস্মিত হই। পূজা ও আরতি দিয়ে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে।

শনিদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে নটরাজনের ও আরও দু'একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখে আমরা উপনীত হই বৃহদীশ্বরের মন্দিরের পিছনে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি মন্দিরের অঙ্গের আর বিমানের অঙ্গের শিল্প সম্ভার। দেখি গম্বুজের শিল্পসম্পদও, দেখি বহুক্ষণ ধরে, দেখি দুই পাশ থেকেও। দেখে হয় না পরিতৃপ্তি, মেটে না আশ। ভাবি কোথায় পান স্থপতি এমন স্ফটিক প্রস্তর, কেমন করে আনেন সেই পাথর তাঞ্জোরে? কি যন্ত্র দিয়ে ক্ষোদাই করেন তার অঙ্গ? কত দিনে? কে রচনা করে এমন মহিমাময় পরিকল্পনা? কারা সেই কল্পনায় দেয় এমন অনবদ্য সূক্ষ্মতম রূপ? সত্যিই কি তাঁরা মানব শিল্পী না স্বয়ং বিশ্বকর্মা? কার এই গৌরবময় সৃষ্টি? কার এই অনুপম কীর্তি তাঞ্জোরের বুকে? আজও হয়নি ম্লান, আছে অক্ষয় হয়ে। অমর হয়ে আছে তাঞ্জোর ইতিহাসের, পাতায়, অমর হয়ে আছে ভারতবর্ষ। অমরত্ব লাভ করেছেন শিল্পী বিশ্বের দরবারে।

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক, শ্রদ্ধা জানাই রাজারাজ চোলকে, জানাই শিল্পীদের, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মন্দিরে।

২

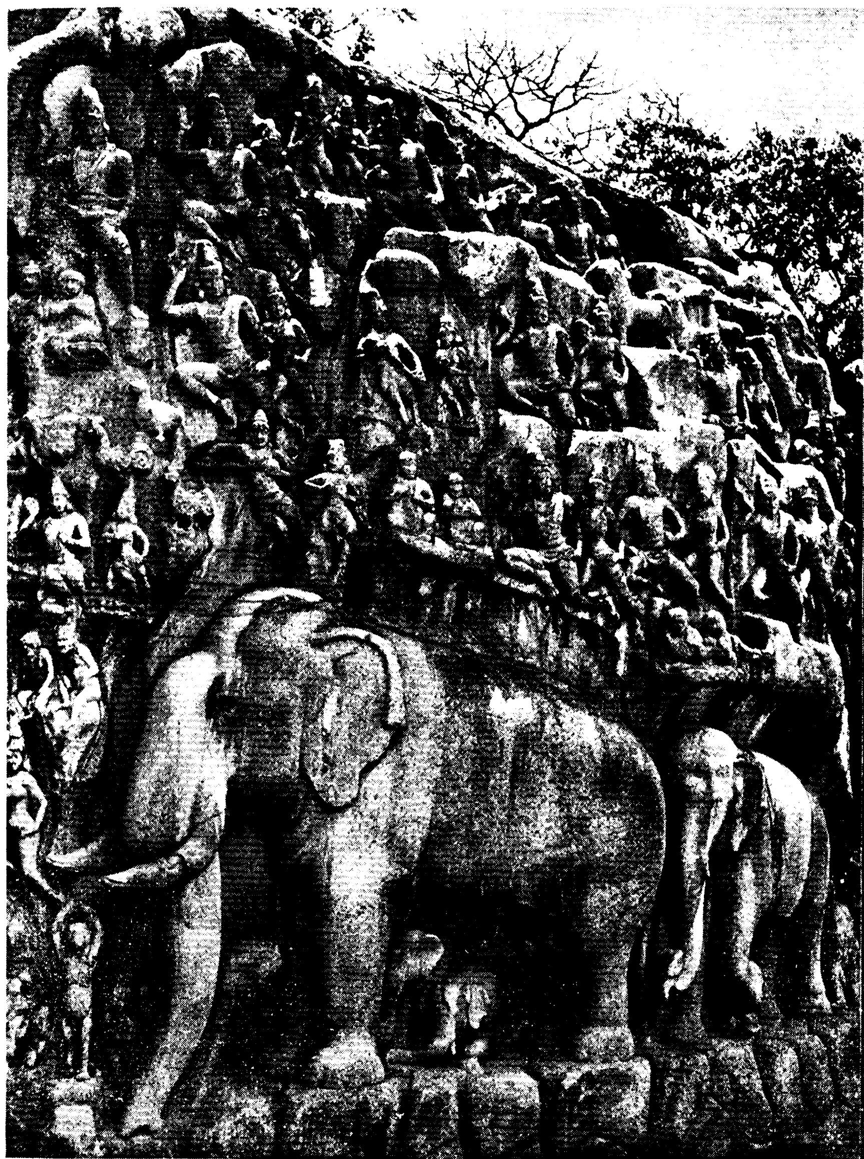
স্ুব্রমনিয়ামের মন্দির দেখি। দেবসেনাপতি সুব্রমনিয়াম বীর্য্যের প্রতীক, শিব আর বিষ্ণুর পরেই তাঁর স্থান, আছে একাধিক অনবদ্য সুব্রমনিয়ামের মন্দির দক্ষিণ ভারতে। আলো করে আছে দক্ষিণ ভারত।

বৃহদীশ্বরের মন্দির নির্মাণের প্রায় দু'শ বছর পরে নির্মিত হয় এই মন্দিরটি, সপ্তদশ শতাব্দীতে। খুব সম্ভব নির্মাণ করেন শ্রেষ্ঠ নায়ক রাজ তিরুমল নায়ক। সমপর্যায়ে পড়ে এই মন্দিরের স্তম্ভগুলি মাদুরার তিরুমল নায়কের চৌল্টি্র স্তম্ভের, পড়ে রামেশ্বরমের দরদালানেও। এই সময়েই দ্রাবিড় স্থাপত্য শিল্প উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, পায় চরমতম উৎকর্ষ।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এই মন্দিরের অঙ্গের আর শীর্ষ দেশের শিল্পসম্ভার। স্থপতি অপরূপ শিল্প সম্ভারে শোভিত করেন এই মন্দিরটিকে, যেমন সূক্ষ্ম, তেমনই অনবদ্য।

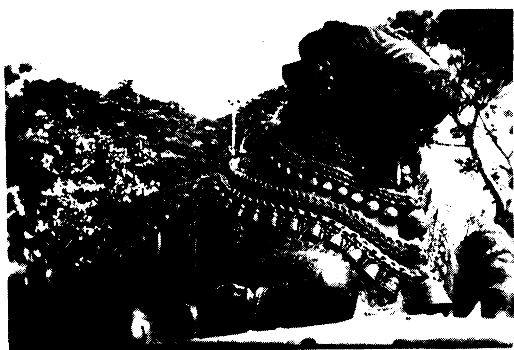
বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি অপরূপ স্তম্ভ, অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভ সূক্ষ্মতম শিল্পসম্পদ, শোভিত হয়ে আছে অনুপম ভূষণে, প্রতীক হয়ে আছে শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম দ্রাবিড় স্তম্ভের। নির্মাণ করা হয়েছে কেন্দ্রের স্তম্ভটিকে পর্যায়ক্রমে চতুষ্কোণ আর অষ্টকোণ করে। তার শীর্ষদেশে, দু'পাশে রচিত হ'য়েছে দু'টি স্তম্ভদণ্ড, অঙ্গে নিয়ে আছে তারাও অনুপম সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই অনবদ্য স্তম্ভগুলি, হয় না পরিতৃপ্তি। শ্রদ্ধা জানাই পেরুমল নায়ককে, জানাই শিল্পীদেরও। সঙ্গে করে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও অম্লান হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়।

ধীরে ধীরে ষ্টেশনে ফিরে আসি। উঠে বসি ট্রেনে।—ট্রেন চলে শ্রীরঙ্গমের পথে।



অর্জুনের তপস্যা বা গঙ্গাবতরণ—মহাবলীপুরম

পৃষ্ঠা ৫০



পবিত্র নন্দী
তাঞ্জোর পৃষ্ঠা ৫৯ ; সুচিন্দ্রম পৃষ্ঠা ৯৩ ; মহীশুর পৃষ্ঠা ১৫৩



রক ফোর্ট মন্দির—তিরুচিরাপল্লী
পৃষ্ঠা ৮০



পক্ষীতীর্থ—তিরুকলিকুণ্ড.ম পৃষ্ঠা ৪৭

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## তিরুচুরাপল্লী ঃ

১। শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথমের মন্দির। ২। জম্বুকেশ্বরের মন্দির
৩। রক ফোর্ট মন্দির

রাত্রি দশটায় আমাদের ট্রেন তিরুচুরাপল্লী ষ্টেশনের প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা লাভের পর ত্রিচিনোপল্লী তিরুচুরাপল্লীতে পরিণত হয়।

আমরা ট্রেন থেকে নেমে, জিনিসপত্র নিয়ে ট্যাক্সি করে উপস্থিত হই পান্থ নিবাসে বা ট্রাভেলার্স বাংলোতে। আছে দক্ষিণ ভারতের প্রতিটি বড় শহরেই একটি করে পান্থ নিবাস। যাত্রীরা স্থান পান সেই সব পান্থ নিবাসে, দর্শনী লাগে কোথাও দৈনিক তিন টাকা, কোথাও বা চার। আছে এই পান্থ নিবাসে একটি করে শোবার ঘর, আছে তার সংলগ্ন একটি ড্রেসিংরুম, সজ্জিত আসবাবে। আছে গোসলখানা, আর স্নানের ঘরও।

আমরা ভোরে উঠে চা ও জলযোগ সমাপন করে শ্রীরঙ্গম অভিমুখে রওনা হই। যাই বাসে করে। পান্থ নিবাসের সামনেই আছে বাসের দাঁড়াবার স্থান। আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন। কিছুদূর যেতেই বৃষ্টি স্বরু হয়। ক্রমে বাড়ে তার গতি। আমাদের বাস শহর অতিক্রম করে, রক ফোর্ট মন্দিরের তলা দিয়ে, পুণ্যতোয়া কাবেরীর পুল পার হয়ে ছোটে শ্রীরঙ্গমের দিকে। দক্ষিণে কাবেরী বয়ে যায় বঙ্কিম গতিতে, অন্তরের ধ্বনি শোনাতে শোনাতে। তার বুকের উপর শোভা পায় বিস্তীর্ণ সবুজ ধানের ক্ষেত, যেন দিগন্তের পদতলে বিস্তার করে দেয় কাবেরী তার সবুজ অঞ্চল। সৃষ্টি হয় এক অতি রমণীয় পরিবেশ। আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করে, দেখতে দেখতে বাস শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথমের মন্দিরের সামনে এসে থামে। আমরা বাস থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে উপস্থিত হই মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে, আশ্রয় নেই গোপুরমের নীচে। বৃষ্টির জলে ভিজে যায় আমাদের সর্বাঙ্গ।

দক্ষিণ ভারতের বিশালতম এই মন্দিরটি, দাঁড়িয়ে আছে এক মহিমাময় মূর্তিতে। হতে পারত সুন্দরতমও হত যদি কিছু পরিবর্তন পরিকল্পনায়।

সাতটি প্রাঙ্গণ ঘিরে আছে মন্দিরটিকে, সৃষ্টি করেছে সাতটি বেষ্টনী। শোভা করে আছে চোদ্দটি গোপুরম তার চোদ্দটি প্রবেশ দ্বার। তাদের অঙ্গ আর শীর্ষদেশ অপরূপ শিল্প সম্ভারে শোভিত করেন শিল্পী, রচনা করেন এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ।

সপ্তম বা কেন্দ্রস্থলের প্রাঙ্গণটিতে দাঁড়িয়ে আছে মূল মন্দির, ক্ষুদ্রতম বেষ্টনীর মধ্যে, আয়তন তার দৈর্ঘ্যে ২৪০ আর প্রস্থে ১৮১ ফিট। বিরাজ করেন এই মন্দিরে বিগ্রহ রঙ্গনাথম। এইটিই এখানকার প্রাচীনতম মন্দির, নাই তার অঙ্গে স্থপতির সূক্ষ্ম কারুকার্য, নাই শিল্পসম্পদ। শুধু মন্দিরের চূড়াটি সোনার পাত দিয়ে মোড়া আছে। খুব সম্ভব নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি জটা বর্মণ সুন্দর পাণ্ড্য। রাজত্ব করেন তিনি ১২৫১ থেকে ১২৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মন্দিরের অঙ্গের শিলালিপি থেকে জানা যায় তিনি এই মন্দিরে বহু অর্থ ও মূল্যবান অলঙ্কার দান করেন।

প্রাচীনতম জাতি দক্ষিণ ভারতের এই পাণ্ড্য। তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি গল্প শোনা যায়। ভ্রমণে বার হন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন, এসে উপনীত হন দক্ষিণ ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশে। তিনি এই দেশের এক রূপবতী যুবতী কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই কন্যাকে বিবাহ করেন। জন্ম গ্রহণ করে একটি পুত্র। মহাপরাক্রমশালী হয় সেই পুত্র। স্থাপন করে একটি বিস্তৃত রাজ্য দক্ষিণ ভারতে; পাণ্ডুর নাম থেকে সেই রাজ্য পাণ্ড্যরাজ্য নামে পরিচিত হয়। পাণ্ড্য নামে খ্যাতিলাভ করে তাঁর বংশধরেরাও।

আছে তাঁদের নাম মেগাস্থিনিসের বিবরণে, উল্লেখ আছে প্রাচীন সাহিত্যে আর অশোকের শিলালিপিতেও। অধিপতি তাঁরা এক স্বাধীন রাজ্যের, বিস্তৃত তাঁদের রাজ্যের সীমানা পূর্ব উপকূলে কন্যা কুমারিকা থেকে ভেলোর নদী পর্যন্ত। তার মধ্যে আছে মাদুরা, টিনেভ্যালি বা তিরুন্যাল ভ্যালি আর ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণ অংশ। কন্যা-কুমারীর কাছে তাম্রপর্ণী নদীর তীরে করকাইতে তাঁরা তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেন। স্থাপিত হয় দ্বিতীয় রাজধানী মাদুরাতে।

জানা যায় না, কে পত্তন করেন এই রাজ্য—আর কবে। সিংহল দেশের উপকথা, মহাবংশে লেখা আছে রাজা বিজয় পাণ্ডুর রাজার কন্যাকে বিবাহ

করেন। নাম রাখা হয় তাঁর দ্বিতীয়া আর চতুর্থা কন্যার, দুই সিংহল রাজ কুমারীর পাণ্ডু ভাষা আর পাণ্ডু কাব্য, নিদর্শন পাণ্ডুমায়ের সন্তানের। প্রমাণ করে এই কাহিনী পাণ্ড্যের স্বাধীন অস্তিত্বের খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্বে।

টলেমীও তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিত্রেয়ান সি'তে লেখেন তাঁদের কথা, বর্ণনা করেন তাঁদের বন্দরের আর সমৃদ্ধির। মুক্তার পণ্য নিয়ে তাঁদের বাণিজ্য পোত, অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগর, ব্যবসা করে দেশে বিদেশে। তাঁরা প্রথম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে প্রবল হন, মহাপরাক্রমশালী হন পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে। পাওয়া যায় তাঁদের রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বহু রোমান স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা, রোমদেশীয় সম্রাট অগষ্টাস থেকে নেরোর যুগের, প্রতীক পাণ্ড্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের নিদর্শন তাদের সমৃদ্ধিরও।

সপ্তম শতাব্দী থেকে আছে তাদের ধারাবাহিক বিবরণ, জানা যায় পূর্ববর্তী রাজাদের নামও। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয় সেই সব নাম।

এই সময়ে তাঁদের রাজ্য পরি দর্শনে আসেন চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এন-স্যাং। দেখেন বহু সুন্দর হিন্দু মন্দিরে শোভা করে আছে এই রাজ্য। বলেন মুক্তার ব্যবসায়ী তাঁরা।

অষ্টম শতাব্দীতে চোল আর কেরল রাজ্য পাণ্ড্যর অধিকারে আসে। নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন শ্রীমর শ্রীবল্লভ, এক মহাপরাক্রমশালী রাজা এই বংশের। তিনি পরাজিত করেন পল্লব, চোল আর গঙ্গরাজকে, অধিকার বিস্তার করেন সিংহলে।

দশম শতাব্দীতে পাণ্ড্যরাজা রাজসিংহ চোলরাজা পরান্তকের কাছে পরাজিত হন। মাদুরা আসে চোলের অধীনে। পরবর্তী তিনশ' বছর পাণ্ড্যদের চোলের অধীনে থাকতে হয়, তাঁরা সক্ষম হন না স্বাধীন হতে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জটা বর্মণ কুলশেখর প্রবল হন, আবার স্বাধীন হয় পাণ্ড্য। তাঁর পুত্র মার বর্মণ প্রথম সুন্দর পাণ্ড্য পরাজিত করেন চোল রাজাকে, লুণ্ঠিত হয় তাঁদের রাজধানী তাঞ্জোর।

অধিরোহণ করেন মাদুরার সিংহাসনে জটা বর্মণ সুন্দরপাণ্ড্য ১২৫১ খৃষ্টাব্দে, রাজত্ব করেন ১২৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনিই সবশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের।

পরাজিত করেন চোল আর চেরকে, পরাজিত হন সিংহলের রাজাও। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। তাঁর বাণিজ্যপোত পণ্য নিয়ে যায় দেশ-দেশান্তরে। উল্লেখ আছে মার্কোপোলোর বিবরণে। তিনি ইটালি থেকে পাণ্ড্যরাজ্য দেখতে আসেন। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় পাণ্ড্য, পরিণত হয় রাজধানী মাদুরা এক মহাসমৃদ্ধিশালী নগরীতে, পরিণত হয় দক্ষিণ ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে, কেন্দ্রস্থল হয় কৃষ্টির। সমপর্যায়ে পড়ে উত্তর ভারতের মথুরার।

তিনিই শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথমের মন্দির নির্মাণ স্থরু করেন। তাঁর আমলে স্থরু হয় মাদুরায় মীনাক্ষী মন্দিরও। দান করেন তিনি বহু অর্থ আর অলঙ্কার এই সব মন্দিরে। দেন জম্বুকেশ্বর আর চিদাম্বরমের নটরাজনের মন্দিরকেও, নিদর্শন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির।

১৩১১ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর অধিকার করেন মাদুরা। মহাপ্রবল হন বিজয়নগর দক্ষিণ ভারতে। ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে মাদুরা বিজয়নগরের অধীনে আসে। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁদের এক সেনানায়ক, বিশ্বনাথ নায়ক অধিকার করেন মাদুরার সিংহাসন, হন স্বাধীন রাজা। স্থাপিত হয় ত্রিচিনোপল্লীতে দ্বিতীয় রাজধানী। তিরুমল নায়ক, শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, দক্ষিণভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও, রাজত্ব করেন ১৬২৩ থেকে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। নির্মিত হয় মন্দির শ্রীরঙ্গমে, ত্রিচিনোপল্লীতে আর মাদুরাতে। অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরগুলি দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন, প্রতীক এক গৌরবময় যুগের।

নায়করা ত্রিচিনোপল্লীতে আর মাদুরাতে রাজত্ব করেন ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, একশ সাতাত্তর বছর। রাণী মীনাক্ষীদেবী, শেষ অধিপতি এই বংশের, কার্ণাটকের নবাবের ষড়যন্ত্রে হন সিংহাসনচ্যুত। পরিসমাপ্তি হয় এক গৌরব-ময় যুগের।

মন্দিরের ষষ্ঠ, পঞ্চম ও চতুর্থ প্রাঙ্গণ বেষ্টন করে আছে ১২৩৫×৮৪৯ ফিট পরিধি। তার মধ্যে আছে চন্দন মণ্ডপম, যজ্ঞশালা আর গরুড় মণ্ডপম, দেবতার বাহন। আছে এই মণ্ডপে দুইটি অতিকায় সোনার গরুড়স্তম্ভ শোভা করে আছে মন্দির। পাণ্ড্যরামণ্ডপম আছে, আছে সূর্যপুষ্করিণী আর রামস্বামীর

মন্দির। শোভা করে আছে বৈকুণ্ঠের মন্দির, চন্দ্রপুষ্করিণী, ধন্বন্তরির মন্দির আর বাসুদেব পেরুমলের মন্দির। আছে রঙ্গনায়কের মন্দির, নরসিংহ পেরুমলের মন্দির আর রঙ্গ বিলাসের মণ্ডপম। শোভা করে আছে শেষাগিরিরাও মণ্ডপম আর সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপম। আর আছে কুরাত আলোয়ারের মন্দির, কৃষ্ণের মন্দির, কন্দাকিলি মণ্ডপম, হাতিশালা ইত্যাদি। দ্বিতীয় আর তৃতীয় বেষ্টনীতে আছে বহু অট্টালিকা, নির্মাণ করা হয় যাত্রীদের আর পূজারীদের বাস করবার জন্য। প্রথম প্রাঙ্গণে আছে বাজার। ঘিরে আছে এক বিস্তৃত স্থান প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় বেষ্টনী, পরিধি তার দৈর্ঘ্যে ২৮৬৫ ফিট আর প্রস্থে ২৫২১ ফিট।

আমরা দক্ষিণ প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে মুগ্ধবিস্ময়ে কুরাত আলোয়ারের গোপুরমটি দেখি। স্তম্ভিত হই দেখে তার অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভার। যেমন বিশাল এই গোপুরমটি তেমনই অনবদ্য তার পরিকল্পনা। তিনটি পৃথক অংশে গোপুরমটি বিভক্ত হয়ে আছে। ঘোড়ার খুরের আকৃতিতে রচিত হয় কেন্দ্রস্থলের অংশের শীর্ষদেশ। শৃঙ্গে শোভা পায় অনেকগুলি তীক্ষ্ণ-সূক্ষ্মাগ্র চূড়া। সারা অঙ্গে রচিত হয় অসংখ্য অপরূপ চন্দ্রাতপ আর কুলুঙ্গি, বিরাজ করেন সেই সব কুলুঙ্গিতে কত অসংখ্য দেবতা, বিরাজ করেন বিষ্ণু বিভিন্ন মূর্তিতে, মূর্তি আছে দশাবতারেরও। যেমন নিখুঁত তাঁদের গঠনসৌষ্ঠব, তেমনই প্রাণবন্ত তাঁরা। যেমন সুন্দর তেমনই সূক্ষ্মতম। পরিচয় দেয় দ্রাবিড় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের।

গোপুরমটি দেখে অতিক্রম করি একের পর এক ছয়টি প্রাঙ্গণ, দেখি প্রতি প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের ছয়টি গোপুরমও। দেখি আরও একটি সুন্দর গোপুরম বুকে নিয়ে আছে অনুপম শিল্পসম্পদ। খুব সম্ভব এইটিই বৈকুণ্ঠ গোপুরম, অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতীক দ্রাবিড় ভাস্কর্যের।

উপনীত হই সপ্তম বেষ্টনীতে। সেখানে গরুড় মণ্ডপকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মূল মন্দির, বেষ্টিত হয়ে আছে প্রাকারে। গর্ভগৃহে, বেদীর উপর শুয়ে আছেন বিগ্রহ রঙ্গনাথম, আছেন অনন্ত শয্যায়, সহস্র ফণাযুক্ত নাগের উপর। দেখে মুগ্ধ হই তাঁর রূপ। ভক্তিভরে পূজা ও আরতি দিয়ে ফিরে আসি মন্দিরের বাইরে, অবাক হয়ে দেখি মন্দিরের ছাদ, মোড়া আছে সোনার পাতে।

দেখি গরুড় মণ্ডপ, দাঁড়িয়ে আছে দেবতার দিক মুখ করে একটি অতিকায়

সোনার গরুড়স্তম্ভ। শেষ হয় দেবদর্শন, দর্শন শেষ হয় দেবতার বাহনেরও, আমরা দেখতে থাকি একে একে চন্দন মণ্ডপম, যজ্ঞশালা, বৈকুণ্ঠমন্দির, ধন্বন্তরির মন্দির, পাণ্ডারামণ্ডপম, সূর্যপুষ্করিণী, চন্দ্রপুষ্করিণী, বাসুদেব পেরুমলের মন্দির, রঙ্গনায়কের আর রঙ্গবিলাসের মন্দির দেখি হাতিশালাও, উপস্থিত হই চতুর্থ বেষ্টনীতে। এই বেষ্টনীতে আছে সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ আর শেষাগিরিরাও-এর মন্দির, শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই মন্দিরের, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দ্রাবিড় স্থপতির, নিদর্শন চরম উৎকর্ষের।

প্রথমে সভাগৃহে প্রবেশ করি। নায়ক রাজারা নির্মাণ করেন এই সভাগৃহটি। দৈর্ঘ্যে ৫০০ আর প্রস্থে ১৩৮ ফিট এই সভাগৃহটি। উচ্চতায় কোথাও দশ ফিট কোথাও কুড়ি। এই সভাগৃহটিতে ৯৫৩টি স্তম্ভ আছে। নির্মিত হয় প্রতিটি স্তম্ভ এক একটি সম্পূর্ণ স্ফটিকপাথর কেটে। স্তম্ভের অঙ্গে আর শীর্ষদেশে শোভা পায় দ্রাবিড় স্থপতির সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের চরম উৎকর্ষের। দেখি মুগ্ধবিস্ময়ে, দেখি স্তব্ধ হয়ে স্তম্ভের অঙ্গের সৌন্দর্য প্রণাম জানিয়ে শেষাগিরিরাও-এর মন্দিরে প্রবেশ করি।

অনবদ্য শিল্পসম্ভারে সমৃদ্ধশালী এই মন্দিরটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই মন্দিরের, শ্রেষ্ঠ কীর্তি দ্রাবিড় ভাস্করেরও। নিদর্শন শ্রেষ্ঠ গৌরবের। যেমন বিস্তৃত আর সুদূরপ্রসারী এই মন্দিরের পরিকল্পনা, তেমনই সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম রূপদান। বুকে নিয়ে আছে মণ্ডপটি অসংখ্য অপরূপ স্তম্ভ; নির্মিত স্ফটিকপাথরে। অঙ্গে নিয়ে আছে প্রতিটি স্তম্ভ দুর্ধর্ষ দুর্মদ অশ্ব। সম্মুখের দুই পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অশ্ব বিভিন্ন আর বিচিত্র ভঙ্গিতে। তাদের শির স্পর্শ করেছে অপরূপ অলঙ্কারে সজ্জিত স্তম্ভের অঙ্গের চন্দ্রাতপ। পদদলিত হচ্ছে কোথাও বা রাজা, তার মস্তকে শোভা পায় শিরোভূষণ, কোথায় যুবতী নারীর স্কন্ধে উপবিষ্ট সেনানায়ক। কোন স্তম্ভের অঙ্গে শোভা পায় একটি অশ্ব, কারও অঙ্গে একাধিক। কেউ সওয়ারবিহীন, কারও অঙ্গে শোভা পায় আরোহী। আরোহী কোথাও নর কোথাও বা নারী, হাতে নিয়ে আছে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, ঢাল, তলোয়ার, সড়কি। তাঁদের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষোদিত করেন ভাস্কর কত সূক্ষ্মতম বিচিত্র লতাপাতা আর ফুল। স্তম্ভের নিম্নতম প্রদেশে বিরাজ করেন কত অসংখ্য দেব-দেবী, অনুপম তাঁদের অঙ্গসৌষ্ঠব। অনবদ্য গঠনভঙ্গিমা অশ্বের,

অশ্বারোহীর আর নারীদেরও, একেবারে জীবন্ত প্রতিমূর্তি। রচনা করেন বিজয়নগরের ভাস্কর এক সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, এক বীর্যের প্রতীক, প্রতীক বিজয়-নগরের রাজাদের বিজয় অভিযানের। তাঁরাই ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন এই মণ্ডপটি। ধারণার অতীত, বুদ্ধির অগোচর, তুলনাহীনমণ্ডপটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই বিজয়নগরের ভাস্করের। দেখি মুগ্ধবিস্ময়ে, দেখে মেটে না আশ, দেখি বহুক্ষণ ধরে। প্রণাম জানাই সেইসব ভাস্করদের, যাঁরা রচনা করেন এই মণ্ডপ, দেখতে যাই ভিলাই গোপুরম। সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠতম গোপুরম এই মন্দিরের, দাঁড়িয়ে আছে চতুর্থ প্রাঙ্গণের পূর্ব প্রবেশদ্বারে, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় শিল্পসম্ভার। ১৪৬ ফিট উঁচু এই গোপুরমটি নির্মাণ করেন তিরুমল নায়ক, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা নায়ক বংশের। রুদ্ধ হয় গতি, দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় গোপুরমের অঙ্গে আর চূড়ায়। দেখি নাই এমন সূক্ষ্মতম কারুকার্য, এমন মহিমাময় পরিকল্পনা, এমন অনুপম শিল্পসম্পদ-এর আগে। পরিচয় দেয় এর অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প-সম্ভার শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের। এই সময়েই গোপুরম লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, পায় চরম উৎকর্ষ। দেখতে থাকি স্তম্ভিত হয়ে। সংবিৎ ফিরে পাই পাণ্ডার ডাকে। আর একবার প্রণাম জানাই তিরুমল নায়ককে। শ্রদ্ধা জানাই অমর শিল্পীদের।

একের পর এক প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে উপনীত হই মন্দিরের দক্ষিণ পাশে। দাঁড়িয়ে আছে বাইরের প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারে একটি গোপুরম, আছে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায়। বেষ্টন করে আছে এই প্রাঙ্গণটি ২৫২১ × ২৮৬৫ ফিট পরিধি, বেষ্টিত হয়ে আছে উঁচু প্রাচীরে। খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই গোপুরমটির নির্মাণ সুরু হয়। এই সময় ফরাসী সেনাপতি লালী অধিকার করেন মন্দির, তাই সময় হয় না মন্দিরের পরিসমাপ্তির। একই সময়ে নির্মাণ সুরু হয় আরও তিন প্রবেশ-পথে তিনটি গোপুরম, তারাও থেকে যায় অসমাপ্ত অবস্থায়।

এই গোপুরমটি প্রস্থে ১৩০ ফিট গভীরতায় ১০০ ফিট। প্রবেশপথটির দৈর্ঘ্য ২২ ফিট, উচ্চতায় ৪৪ ফিট। নির্মিত হয় এক একটি সম্পূর্ণ স্ফটিকপাথর কেটে প্রবেশদ্বারের চারিটি বাজু, উচ্চতা তাদের ৪০ ফিটেরও বেশী। রচিত হয় আচ্ছাদনও একটিমাত্র প্রস্তর দিয়ে, তার প্রস্থ ২৪ ফিট। নির্মিত হত যদি এই আচ্ছাদনের উপর চূড়া, এই গোপুরমটি ৩০০ ফিট উঁচু হত, স্পর্শ করতো

আকাশ, হত দক্ষিণ ভারতের উচ্চতম গোপুরম, উচ্চতম গোপুরম ভারতেরও। বুকে নিয়ে আছে এই অসমাপ্ত গোপুরমটিও শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন। যেমন মহিমাময় তাদের পরিকল্পনা, তেমনই অনবদ্য রূপদান। প্রতীক এক গৌরবময়, এক বিরাট, এক মহিমাময় সৃষ্টির, এক অমর কীর্তির। দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে।

শ্রদ্ধা জানাই এই মহিমাময় সুন্দরকে, জানাই তার সৃষ্টিকর্তাকে, জানাই তিরুমল নায়ককে, জানাই বিজয়নগরের রাজাদের আর সুন্দর পাণ্ড্যকে, জানাই পাণ্ড্য, বিজয়নগরের আর মাদুরার শিল্পীদেরও। অমর তাঁরা, অমর ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। অমর ভারতবর্ষ, বুকে নিয়ে আছে অমর শ্রীরঙ্গমকে।

সঙ্গে নিয়ে আসি এক স্মৃতি, যা আজও মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বাসে উঠে পড়ি। বাস তিরুচুরাপল্লী অভিমুখে ছোটে।

## ২

মিনিট দশেকের মধ্যেই বাস জম্বুকেশ্বরের মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাড়ে বৃষ্টির বেগ, আমরা বাস থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে মন্দিরে উপস্থিত হই। আবার ভিজে যায় আমাদের সর্বাঙ্গ।

শৈব মন্দির, বিগ্রহ জম্বুকেশ্বর। বিরাজ করেন এই মন্দিরে দক্ষিণ ভারতের পাঁচটি পবিত্রতম লিঙ্গের অন্যতম, অপোলিঙ্গম। নির্গত হয় এই লিঙ্গ থেকে বারি। সমপর্যায়ে পড়ে এই মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতের চারটি পবিত্র মন্দিরের, পড়ে চিদাম্বরমের নটরাজের, কালাহস্তির, তিরুভান মালাই-এর আর কাঞ্চী-পুরমের কৈলাস নাথের।

নির্মিত হয় এই মন্দিরটি দ্বাদশ শতাব্দীতে। মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাকারের দক্ষিণ দেওয়ালে একটি ক্ষোদিত শিলা লিপি আছে। লেখা হয় লিপিটি জাতবর্মণ সুন্দর পাণ্ড্যের রাজত্বের দশমবর্ষে। তিনি ১২৫১ খৃষ্টাব্দে মাদুরার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, রাজত্ব করেন ১২৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনিই

শ্রেষ্ঠ রাজা পাণ্ড্য বংশের, নির্মাণ করেন এই মন্দির। পরবর্তী কালে নির্মিত হয় শুধু বাইরের প্রাঙ্গণটি, হয় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে।

অপরূপ এই মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে বুকে নিয়ে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম মন্দিরের নিদর্শন, কীর্তি এক গৌরবময় যুগের ক্ষুদ্রতর এই মন্দিরটি, শ্রীরঙ্গমের বিশালমন্দিরের তুলনায়, কিন্তু সুন্দরতম পরিকল্পনায় আর অনুপম রূপদানে।

বাইরের প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে, গোপুরমের নীচে দিয়ে একটি অনতি প্রশস্ত পথ দিয়ে আমরা একটি সভাগৃহের একেবারে কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হই। শোভা করে আছে এই সভাগৃহটি ২৫০টি স্তম্ভে, নির্মিত সেগুলি এক একটি সম্পূর্ণ স্ফটিক পাথর কেটে। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভ, অনবদ্য, শিল্প সম্ভার, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের, প্রতীক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাদের অঙ্গের শিল্প সম্পদ, দেখি স্তব্ধ হয়ে।

সভাগৃহটি অতিক্রম করে উপনীত হই একটি পুষ্করিণীর পাড়ে। আছে এই পুষ্করিণীর গর্ভে একটি নির্ঝর, সেই থেকে নির্গত হয় জল, জলে পরিপূর্ণ হয় পুষ্করিণী। বিরামহীন সেই জল নির্গম, হয় রাত্রি দিন। তাই মহাপবিত্র এই পুষ্করিণীর জল। খ্যাতি লাভ করেন অপোলিঙ্গম নামে জম্বুকেশ্বরও। হন মহাপবিত্র, মহাতীর্থে পরিণত হয় জম্বুকেশ্বর।

পুষ্করিণীর বিপরীত দিকেও একটি সভাগৃহ আছে, সেখানেও শোভাপায় অপরূপ ৪৭০টি স্তম্ভ, অনুরূপ বাম পাশের সভাগৃহের ২৫০টি স্তম্ভের, শিল্প সম্পদে আর স্থাপত্য মহিমায়। প্রতীক চরম উৎকর্ষের। দুইদিকের দুই সভাগৃহ নিয়ে রচিত হয় এই মন্দিরের সহস্র স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপম। মাঝখানে তার পবিত্র পুষ্করিণী, সৃষ্টি করে এক স্বর্গীয় পরিবেশ, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

দ্বিতীয় প্রাকারে, দুই গোপুরমের কেন্দ্র স্থলে, শোভা করে আছে একটি অলিন্দ, আকার তার ক্রুশের মত। অনবদ্য আর সূক্ষ্মতম এই অলিন্দের অঙ্গের কারুকার্য। পরিচয় দেয় শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় সৃষ্টির। সুন্দরতম অলিন্দ দক্ষিণ ভারতের, তার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় চিদাম্বরমের পার্বতীর মন্দিরের অলিন্দের। তুলনাহীন সৌন্দর্য বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই অলিন্দটি। দেখি মুগ্ধ হয়ে, স্তব্ধ হই দেখে, হই স্তম্ভিত। মন্দিরের দরজায় গিয়ে শেষ হয়

অলিন্দটি, আমরা দেখতে দেখতে যাই তার সৌন্দর্য, দেখি নির্মাণ করেন স্থপতি এক সৌন্দর্যের প্রস্রবণ। যত দেখি বিস্ময় বাড়ে তত। শেষে উপস্থিত হই মন্দিরে। ভক্তি ভরে জম্বুকেশ্বরকে পূজা দিয়ে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে।

ফিরবার পথে দেখি গোপুরম। দেখে মুগ্ধ হই তার অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভার।

নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলী সুন্দর পাণ্ড্যকে, করি এই মন্দিরের শিল্পীদের, করি ডালি উজাড় করে। ধন্য তাঁরা, ধন্য ভারতবর্ষ, ধন্য আমি জন্মেছি এই দেশে। ফিরে আসি, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও অক্ষয় হয়ে আছে মনের মন্দিরে, হয়নি ম্লান।

মন্দির থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে উপস্থিত হই বাস ষ্ট্যাণ্ডে। তখন বেড়ে যায় বৃষ্টির বেগ, বাড়ে ঝড়ের গতিও। কোন রকমে বাসে উঠে পৌছাই পান্থ নিবাসে। আবার তৃতীয়বার, ভিজে যায় আমাদের সর্বাঙ্গ।

৩

ভোর থেকেই সুরু হয় অল্প অল্প বৃষ্টি, সঙ্গে নিয়ে হাওয়া। বাড়তে থাকে বেলা, বাড়তে থাকে বৃষ্টির আর ঝড়ের বেগও। শেষে বেলা তিনটে নাগাদ পরিণত হয় সাইক্লোনে।

ইকমিক কুকারে খাবার প্রস্তুত ছিল। আমরা ভিজে কাপড় বদলে, খাওয়া দাওয়া সেরে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করি। তখন অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ হয়, সন্ধ্যার অন্ধকার ধরিত্রির বুকে নেমে আসে। ঝড়ের সিংহবাহনে আসে রাত্রি।

সেই রাত্রিতেই এগারটার গাড়িতে আমাদের টুটিকোরিণে রওনা হ'তে হবে। উৎকন্ঠিত হ'য়ে অপেক্ষা করি, কখন প্রশমিত হবে ঝড়ের বেগ, বন্ধ হবে বৃষ্টি। কিন্তু, ঝড়ের বেগ বেড়েই চলে, বাড়ে বৃষ্টির ছাটও, ভিজিয়ে দেয় ঘরের মেঝে। তাই বন্ধ করে দিতে হয় ঘরের দরজা।

একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের ভিতর এই বাংলোটি অবস্থিত। তিনটি ঘর আছে, দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, ঘরগুলির সামনে একটি প্রশস্ত টানা বারান্দাও

আছে। আমরা দক্ষিণ প্রান্তের ঘরখানি অধিকার করি, নাই অন্য কোন যাত্রী অপর দু'খানি ঘরে। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে, এক সুবিশাল তেঁতুল গাছের নীচে, চৌকিদারের থাকবার ঘর, খড় দিয়ে তার ছাদ নির্মিত। সেই ঘরে আছে চৌকিদার তার স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা। দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ঘরের পাশে, সিঁড়ি ঘেঁসে অনুরূপ একটি গাছ। আছে অনুরূপ একটি গাছ বাম প্রান্তের ঘরটির সিঁড়ির সংলগ্নও। সামনে পঞ্চাশ গজের ব্যবধানে, দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি অনেকগুলি বিশালকায় তেঁতুল গাছ, প্রাঙ্গণটিকে বেষ্টন করে আছে, সামনের দোতলা বাড়ি থেকে পৃথক করে আছে। তাদের পাশে পাশে নারিকেল কুঞ্জও আছে, আছে কলা গাছের শ্রেণীও, তাদের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে আছে সামনের বাড়ি, আছে অদৃশ্য হ'য়ে। বাংলোর পেছনে প্রায় একশ গজ দূরে পাহাড়ের শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে, বুকে নিয়ে সবুজের মেলা। বারান্দার এক প্রান্তে ছোট্ট টেলিফোনের ঘর।

কোন রকমে উপস্থিত হই সেই ঘরে। ষ্টেশনে ফোন করে গাড়ির খবরা-খবর করি। বলতে পারে না কখন টুটিকোরিণের গাড়ি আসবে। হতাশ হয়ে ফিরে আসি, ভিজে যায় সর্বাঙ্গ। কয়েকবার এই রকম যাতায়াত করি, শেষে বিকেল ছটায় এক বিরাট আর্তনাদ করে টেলিফোনের তার ছিন্ন হয়, বন্ধ হয় বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ। ফিরে এসে শয্যার উপর বসি, পরিত্যাগ করি টুটিকোরিণে যাওয়ার আশা।

জানালা দিয়ে দেখতে থাকি ঝড়ের তাণ্ডবলীলা আর শুনতে থাকি গর্জন। ছুটে আসে ঝড় রুদ্র মূর্তিতে, আসে মরণ নৃত্যের ছন্দে, ডমরু বাজাতে বাজাতে, আসে প্রলয়ের ধ্বনি শোনাতে শোনাতে। হয় বুঝি মহাপ্রলয়। খেলে যায় বিদ্যুতের শিখা, উদ্ভাসিত হয় দিগন্ত। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় বজ্রপতনের শব্দ। ক্রমে বাড়ে ঝড়ের উদ্দামতা, হয় রুদ্রতর, হয় রুদ্রতম, বাড়ে গর্জনও, শেষে অতিক্রম করে সহস্র সমুদ্রের গর্জনকেও। বাড়ে বৃষ্টির বেগও, শোনা যায় সহস্র সর্পের গর্জন, শোনা যায় মুহুর্মুহু বজ্রপতনের শব্দও, প্রতি মুহূর্তেই আলোয় উদ্ভাসিত হয় আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, বুঝি বধির হয় কান, অন্ধ হয় চোখ।

হঠাৎ চৌকিদারের কথা মনে পড়ে যায়। বারান্দায় গিয়ে চীৎকার করি

চৌকিদার বলে। পৌঁছায় সেই ডাক চৌকিদারের কানে, তারা ছুটে আসে সপিরবারে, ডাকবাংলোতে আশ্রয় নেয়। পরমুহূর্তেই এক বিরাট শব্দ করে চৌকিদারের ঘরের সংলগ্ন তেঁতুল গাছটি ভূপতিত হয়। তার নীচে গুঁড়িয়ে যায় চৌকিদারের ঘর। রক্ষা পায় চারিটি প্রাণী নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। বিদ্যুতের আলোতে দেখি পড়েছে আরও অনেক গাছ, পরিষ্কার চারিদিক, এক নগ্ন মূর্তি নিয়ে সামনের বাড়িখানি দাঁড়িয়ে আছে।

আবার ঘরের ভিতর প্রবেশ করে ভিজে কাপড় বদলে, দরজায় খিল এঁটে দিয়ে খাটের উপর গিয়ে বসি। ক্রমেই বেড়ে যায় বাইরের দৈত্যের আস্ফালন। এত করেও তার হয় না শান্তি, ছুটে আসে প্রচণ্ড বিক্রমে, বুঝি গ্রাস করবে বসুন্ধরা। সুরু হয় বৃক্ষ পতনের শব্দ, পড়ে গাছ এখানে, সেখানে, পড়ে সর্বত্র। পড়ে প্রতি পাঁচ দশ মিনিট অন্তরই। আশঙ্কা হয় কখন পড়বে, সিঁড়ির সংলগ্ন গাছটিও, তার তলায় চূর্ণ হয়ে যাবে আমাদের বাংলোটি, জীবনান্ত হবে সকলের। এক ভীষণ আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয় মন, অঙ্গ হয় অবশ। মনে মনে স্মরণ করতে থাকি বিপদের বন্ধু ভগবানকে।

এমন সময় ঘরের বিদ্যুতের আলোও নিভে যায়, নিবিড় অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে চতুর্দিক। সঙ্গে নাই মোমবাতি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে কিছুক্ষণ বসে থাকি। সরষের তেল সঙ্গে ছিল, সেই তেল দিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি ভরতি করি। রুমাল ছিঁড়ে পলতে বানাই। দেশালাই জ্বেলে জ্বালাই সেই পলতে। আলোকিত হয় ঘর, অন্তর্হিত হয় অন্ধকার।

আবার খাটের উপর গিয়ে বসে বৃক্ষ পতনের শব্দ শুনতে থাকি, শুনি গৃহ পতনের শব্দও। তার সঙ্গে শুনতে থাকি বৃষ্টি পতনের শব্দ, পড়ে বৃষ্টি সহস্র ধারায় ভেদ করে ঘরের ছাদ, বিরামহীন সেই শব্দ। নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকি। বাদ যায় না সিঁড়ির সংলগ্ন গাছটিও, পড়ে বিপরীত দিকে এক ভীষণ আর্তনাদ করে। কেঁপে ওঠে সমস্ত বাংলোটি, কাঁপে আমাদের খাট, চেয়ার আর জিনিসপত্র, কম্পিত হয় আমাদের অন্তঃকরণ, মুহ্যমান হয়ে পড়ে থাকি

শেষে, শেষ রাত্রির দিকে সত্যিই প্রশমিত হয় ঝড়ের উদ্দামতা, হয় বৃষ্টির বেগও। ভোর বেলায় থেমে যায় একেবারে। অন্তর্হিত হয় ঝড়ের সিংহ গর্জন, আসে শান্ত, স্নিগ্ধ প্রভাত।

ঘরের বাইরে এসে বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাই মূক হয়ে যাই বাইরের দৃশ্য দেখে। দাঁড়িয়ে নাই একটি গাছও। সবগুলি তেঁতুল গাছই মাটির উপর শুয়ে আছে, প্রণতি জানাচ্ছে ধরিত্রী দেবীকে। তাদের শীর্ষদেশ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে স্পর্শ করেছে বারান্দার প্রান্তদেশ, অদৃশ্য হয়েছে সোপানের শ্রেণী তার অন্তরালে। পড়তো যদি বাংলোর ছাদে, চূর্ণ হত বাংলো, গুঁড়িয়ে যেতাম আমরা, হত প্রাণান্ত। এক আতঙ্কের শিহরণ খেলে যায় বুকের ভিতর। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রণাম জানাই ভগবানকে, জানাই সহস্র প্রণাম।

দেখি দক্ষিণ প্রান্তের সিড়ির সংলগ্ন অতিকায় গাছটিও ভূপতিত হয়েছে। গুঁড়িয়ে গিয়েছে তার নীচে একটি পাকা ঘর, ছিল বাংলোর বিপরীত দিকে। বাংলোর ছাদের উপর এসে পড়েছে বাম প্রান্তের তেঁতুল বৃক্ষটিও, তার নীচে নিশ্চিহ্ন হয়েছে ছাদ। সারা প্রাঙ্গণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে নারিকেল, কলা, বেল আরও কত ছোট গাছ, সবলে উৎপাটিত হয়ে আছে। তাদের একটি এসে পড়েছে প্রাঙ্গণের চৌবাচ্চার উপর, বিচূর্ণ হয়েছে চৌবাচ্চা, দ্বিখণ্ডিত হয়েছে কলের জলের নল। এগিয়ে এসেছে সামনের দোতলা বাড়ি, অদৃশ্য ছিল বৃক্ষের অন্তরালে, কিন্তু চূর্ণ হয়েছে তার দ্বিতল, অদৃশ্য হয়ে আছে এক বিশাল তেঁতুলের ডালের নীচে।

অতি কষ্টে গাছের বেষ্টনী অতিক্রম করে ধীরে ধীরে গেটের সামনে এসে পৌছাই। দেখি চিহ্ন নাই গেটের। উৎপাটিত হয়েছে গেট, নিক্ষিপ্ত হয়েছে তার মাথার উপরকার ছ'ফিট চওড়া আর বারো ফিট লম্বা ষ্টীলের পরিচয় ফলকটি, প্রায় পঁচিশ গজ দূরে, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। নিক্ষিপ্ত হয়েছে গেটের সংলগ্ন বেল গাছটিও ততোধিক দূরে, ছড়িয়ে আছে গেটের চতুর্দিকে অসংখ্য বেল, উৎপাটিত হয়েছে ঝড়ের নির্মম হস্তে।

ফিরে আসি বাংলোতে, কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকি। গৃহিণী বলেন, "ভেঙে গিয়েছে জলের নল, নাই জল চৌবাচ্চায়ও, কাঠ কয়লার অভাবে অচল হ'য়েছে ইকমিক্ কুকারও।"

তাই যেতে হয় জলের সন্ধানে, যোগাড় করতে হবে কাঠ কয়লাও। সঙ্গে যায় রূপ সিং হাতে নিয়ে বালতি আর থলে। রাস্তার অপর পারে আঙিনা

থেকে কিছু দূরে পুলিস ফাঁড়ি। প্রথমেই সেখানে যাই—দেখে স্তম্ভিত হই ফাঁড়ির অবস্থা। পড়েছে সবগুলি গাছই, গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে একটির উপর একটি। পড়েছে গাড়ি বারান্দার সংলগ্ন অতিকায় তেঁতুল গাছটিও। তার বুকের নীচে চূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িবারান্দা, শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছে অপর পাশের মাটি। সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়েছে প্রাঙ্গণ, আবদ্ধ হ'য়ে আছেন অধিবাসীরা ভূপতিত বৃক্ষের বেষ্টনীর মধ্যে। রাস্তা নাই বাইরে বেরোবার। জন দশ বারো পুলিস নিযুক্ত আছেন গাছ কাটার কাজে। কুড়ুল দিয়ে কাটছেন গাছের ডাল, এক পাশে সরিয়ে দিচ্ছেন সেগুলি, তৈরী করছেন বাইরে আসবার পথ। দূর থেকে কিছুক্ষণ তাঁদের কাজ দেখি। সাধ্য নাই তাঁদের নিকটে পৌঁছাবার। জিজ্ঞাসা করি কোথায় পাওয়া যাবে পানের উপযুক্ত জল, কোথায় মিলবে কাঠ কয়লা।

তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী রূপ সিং যায় টিউবওয়েল থেকে জল আনতে, আছে নাকি এক ফার্লং দূরে, আমি কাঠ কয়লার সন্ধানে অগ্রসর হই।

দেখি দাঁড়িয়ে নাই রাস্তার দু'পাশের একটি গাছও। সহ্য করতে পারে নাই রাত্রির ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যের বেগ। কেউ শুয়ে আছে রাস্তার বুকের উপর অবরুদ্ধ হয়ে আছে রাস্তা, কেউ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রাস্তার পাশের অগভীর নালার ভিতর। কারও শীর্ষদেশ নালা অতিক্রম করে স্পর্শ করেছে অপর পারের বাড়ির প্রাঙ্গণ। আশ্রয় নিয়েছে কেউ বাড়ির দেওয়ালে, কেউ দেওয়াল অতিক্রম করে ছাদে, চূর্ণ হয়েছে বাড়ির দেওয়াল, নিশ্চিহ্ন হয়েছে ছাদও, পরিণত হয়েছে ভগ্নস্তূপে।

অতি কষ্টে রাস্তা অতিক্রম করে একটি হোটেলে উপস্থিত হই, মেলে যদি যেখানে কাঠ কয়লা। দেখি একই অবস্থা, নাই এখানেও কোন ব্যতিক্রম। পড়েছে গাছ, তার সংঘাতে অর্ধেক ছাদ চূর্ণ হয়েছে। এক বীভৎস মূর্তিতে অপর অর্ধেক দাঁড়িয়ে আছে। তার নীচে হোটেলবাসীরা আশ্রয় নিয়েছে। বৃষ্টির জলে ভেসে গিয়েছে ঘরের মেঝে, পৌঁছেছে এক প্রান্তের উনুনের মধ্যেও। সেই উনুন থেকেই কিছু ভিজে কাঠ কয়লা সংগ্রহ করে ডাক বাংলোতে ফিরে আসি। রূপ সিংও এক বালতি জল নিয়ে ফিরে আসে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে চৌকিদারও, তাকে ষ্টেশনে ট্রেনের খবর নিতে

পাঠান হয়েছিল। ফিরে আসে অর্ধ পথ থেকে। ভূপতিত বৃক্ষে আর বাড়ির ধ্বংসস্তূপে সমস্ত রাস্তাই অবরুদ্ধ হ'য়ে আছে। রাস্তা নাই বাস চলবার, নাই পায়ে চলার পথও, তাই সম্ভব হয় নাই ষ্টেশন পর্যন্ত পৌছান।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ সুরু হয় শুধু প্রধান রাজপথটি দিয়ে বাস চলা। আমরা উঠে পড়ি একটি বাসে, বাস ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হয়। তখনও পরিষ্কার হয়নি সমস্ত রাস্তা, এখানে সেখানে এক একটি বড় গাছ পড়ে আছে, জুড়ে আছে রাস্তার অংশ। তার মধ্য দিয়ে বাস এঁকে বেঁকে চলে, অগ্রসর হয় মন্থর গতিতে। দেখতে দেখতে যাই ঝড়ের ধ্বংসের লীলা। আসে ঝড় সংহারিণী মূর্তিতে, সঙ্গে নিয়ে আসে এক মহাপ্রলয়। রক্ষা পায় না একটি গাছও, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় ত্রিচির অধিকাংশ বাড়িই। ভাঙে টেলিগ্রাফের 'পোষ্ট', ছিন্ন হয় তার। ভগ্ন হয় পাওয়ার ষ্টেশনও; বন্ধ হয় টেলিগ্রাম। অচল হয় বিদ্যুতের কারখানাও, অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে সারা শহর। ভাঙে কলের জলের 'পাম্পিং ষ্টেশন'ও। জলশূন্য হয় ত্রিচি।

ষ্টেশনে পৌছে শুনি গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আসে নাই কোন ট্রেন, অচল কণ্ট্রোল, তাই জানবার উপায় নাই কখন কোন্ ট্রেন আসবে, আদৌ আসবে কি না। নাই গাড়ি, নাই টেলিগ্রামের তার, সংযোগ নাই, বাইরের জগতের সঙ্গে, হয়েছে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। হতাশায় ভরে যায় বুক, নিরাশ অন্তঃকরণে ফিরে আসি ডাক বাংলোতে।

শুনি জল নাই টিউবওয়েলেও, সক্ষম হয় নাই লোকেদের চাহিদা মেটাতে। রূপ সিংকে পুলিশ ফাঁড়িতে জলের জন্য পাঠিয়ে আমরা বাজারে যাই। মোমবাতি আর কিছু খাবার জিনিস কিনে ফিরে আসি ডাক বাংলোতে। কিছুক্ষণ পরে রূপ সিংও জল নিয়ে ফিরে আসে।

পরের দিন সকালে উঠে আবার ষ্টেশনে যাই। শুনি এসেছিল নাকি দুপুরের দিকে একখানি গাড়ি। সচল হয় নি 'কণ্ট্রোল' তাই বলতে পারে না কখন দ্বিতীয় গাড়ি আসবে। বলতে পারে না কবে সচল হবে কণ্ট্রোল, সহজ আর সুগম হবে যাতায়াত।

ষ্টেশনের প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে দেখি দাঁড়িয়ে আছে একখানি বাস, রকফোর্ট মন্দিরের যাত্রী নিয়ে যাবে। আমরা সেই বাসে উঠে পড়ি। বাস

চলে শহরের ভিতর দিয়ে। দেখি সর্বত্রই সীমাহীন ধ্বংসের লীলা, ধ্বংসে পরিণত হয়েছে সারা ত্রিচিনোপল্লী, পরিণত হয়েছে এক প্রেতভূমিতে। এক রাত্রিতেই সর্বহারা হয়েছে ত্রিচির অধিবাসীরা। মুখে তাদের অপরিসীম বিষাদের আর আতঙ্কের ছাপ। এক বিরাট ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রেত, নিযুক্ত কেউ বাড়ি পরিষ্কারের কাজেও। তার উপর অচল হয়েছে জলের কল, তাই প্রতিটি টিউবওয়েলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে শতশত নরনারী, কারও হাতে বালতি, কারও বগলে শোভা পায় কলসি, বিভিন্ন তাদের আকার, নীরবে অপেক্ষা করছে যদি পায় একটুখানি জল, পান করে মেটাবে তৃষ্ণা, রক্ষা হবে জীবন। অসহ্য সে দৃশ্য।

অবশেষে অনেকগুলি রাস্তা অতিক্রম করে, আমাদের বাস রক ফোর্ট মন্দিরের নীচে এসে থামে। আমরা বাস থেকে নেমে বাজার থেকে কিছু পূজার উপকরণ কিনে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি।

পাহাড়ের অঙ্গ ভেদ করে উঠেছে এঁকে বেঁকে সোপান শ্রেণী, এসে পৌঁছেছে একটি অপ্রশস্ত উপত্যকায়। তার প্রান্ত দেশে পাহাড়ের অঙ্গ কেটে নির্মাণ করা হয়েছে মন্দির, নির্মিত হয়েছে একটি বিশাল নাটমন্দিরও, তার দেওয়ালে আর ছাদে শোভা পায় বিভিন্ন চিত্র সম্ভার, শোভা পায় নানা দেব-দেবীর মূর্তিও।

আমরা মন্দির ও নাটমন্দির দেখে দেবতাকে পূজা দিয়ে উপত্যকায় বেরিয়ে আসি। নাই কোন আভরণ নাই সবুজের ভূষণ, নাই একটিও তৃণগুল্ম লতা, নাই কোন বৃক্ষ এই পাহাড়ের অঙ্গে। দূর থেকে দেখে মনে হয় দুর্গই বুঝি, তাই নাম রাখা হয় 'রক ফোর্ট' মন্দির। আভরণ নাই উপত্যকার অঙ্গেও, তাই মুগ্ধ হয় না নয়ন। উপত্যকা থেকে উঠে গিয়েছে সোপানের শ্রেণী, রচিত হয়েছে পাহাড়ের অঙ্গ কেটে, যেমন খাড়া, তেমনই ভীতিপ্রদ। সংযুক্ত হয়েছে, উপত্যকা আর পাহাড়ের শীর্ষদেশ। সেখানেও নির্মিত হয়েছে একটি মন্দির, নির্মাণ করেছেন মহারাষ্ট্রে বীর শ্রেষ্ঠ, হিন্দুরাজ্য পুনরুদ্ধারের মন্ত্রে দীক্ষিত মহারাজা শিবাজি। বিরাজ করেন সেই মন্দিরে গণেশ।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে জন্ম নেন এক শিশু জুনারের কাছে শিবনারের গিরিদুর্গে। ভূমিষ্ঠ হন শিবাজি মারাঠা জায়গীরদার সাহজির দ্বিতীয়া পত্নী ধর্ম প্রাণা,

মহা তেজস্বিনী তীক্ষ্ণবুদ্ধি জিজাবাই-এর গর্ভ থেকে। মুখর হয়ে ওঠে সমস্ত দুর্গটি নব জাতকের উৎসবে। তিনি এক মহাপ্রতিভাশালী ব্রাহ্মণের সাহচর্যে আসেন। নাম তাঁর দাদাজি খনদেব।

পিতৃরক্তে প্রবাহিত দেবগিরির যাদবদের শোণিত, মাতৃরক্তে মেওয়ারের শিশোদিয়া রাজপুতের। এক অরণ্যের অন্ধকারে শৈলশিখরে বসে স্বপ্ন দেখেন শিবাজি, স্থাপন করবেন এক হিন্দুরাজ্য, একত্রিত করবেন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত আর পরাজিত হিন্দুরাজাদের। প্রতিষ্ঠা করবেন এক ধর্মরাজ্য, হবেন সেই ধর্মরাজ্যের সার্বভৌম সম্রাট। তারপর, উল্কার গতিতে ছুটে আসেন, হস্তে তাঁর বজ্র শিখা, ললাটে অঙ্কিত স্বাধীনতার মন্ত্র, হৃদয়ে পরিপূর্ণ অমিত সাহস, কণ্ঠে উদ্‌গত বজ্রের নির্ঘোষ।

পরাজিত হয় একে একে বিজাপুর আর আহ্‌মদ নগর, পরাজয় স্বীকার করেন জুনারের অধিপতি। তিনি অধিকার করেন কঙ্কন, কল্যান আর ভিওয়াণ্ডি। অধিকৃত হয় কত অসংখ্য গিরি দুর্গও। বিস্তৃত হয় তাঁর ক্ষমতা মাদ্রাজে কর্ণাটকে আর মহীশূরে। ম্লান হয় মোগলের মহিমা, মহিমা ভারত সম্রাট ঔরংজেবের। প্রতিষ্ঠিত হয় এক সুবিশাল হিন্দুরাজ্য দক্ষিণ ভারতে, বিস্তৃত তার সীমানা, উত্তরে সৌরাষ্ট্রে ধরমপুর, দক্ষিণে কারোয়ার, পূর্বে বাগলালা, নাসিক, পুনা, সাতারা, কোলাপুর। পশ্চিমে কর্ণাটক, বেলগাম থেকে তুঙ্গভদ্রা নদীর বেলারির অপর পার পর্যন্ত আর মহীশূরের এক বিস্তৃত ভূভাগ। রাইগড়ে স্থাপিত হয় রাজধানী। ১৬ই জুন ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বাধীন সার্বভৌম সম্রাটে পরিণত হন, হন ছত্রপতি শিবাজি। তাঁর গৌরবময় কীর্তির কাহিনী ঘোষিত হয় দিকে দিকে। অমর হন সেই শিশু ইতিহাসের পাতায়।

১৪ই এপ্রিল ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু এসে রুদ্ধ করে তাঁর বিজয়ের অভিযান। অকালে ঝরে পড়ে এক মহামানব, এক যুগাবতার। পূর্ণ হয় না অখণ্ড ধর্মরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন, রয়ে যায় অর্ধসমাপ্ত অবস্থায়।

আমরা অতি সাবধানে সিঁড়ি অতিক্রম করে গণেশের মন্দিরে উপনীত হই। মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম করে বেরিয়ে এসে বসি একটি উন্মুক্ত অলিন্দে, বেষ্টন করে আছে মন্দিরকে। সেখান থেকে দেখি ত্রিচি শহর, দেখি দূরে দাঁড়িয়ে

আছে শ্রীরঙ্গমের মন্দির, নিয়ে তাঁর গগন চুম্বী গোপুরমগুলি, দেখি পুণ্যতোয়া কাবেরীকেও। বঙ্কিম গতিতে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে একটি রূপালি রেখা, ভেদ করে গিয়েছে এক সবুজ আস্তরণ, এইগুলিই সবুজ ধানের ক্ষেত, পরিপুষ্ট এই ক্ষেত কাবেরীর জলে। পরিচিত এই স্থানটি কাবেরীর উপত্যকা নামে, শস্যশ্যামল এই উপত্যকা কাবেরীর জলে।

কিছুক্ষণ এই নির্জন পরিবেশে কাটিয়ে আমরা নেমে আসি মন্দির থেকে, ডাক বাংলোতে ফিরে আসি।

রাত্রি ৯টায় খাওয়া দাওয়া সেরে জিনিসপত্র নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হই। শুনি তখনও সচল হয়নি কণ্ট্রোল ; তবে দশটার সময় একখানি ট্রেন আসবার সম্ভাবনা আছে, সেই ট্রেন ত্রিবেন্দ্রাম পর্যন্ত যাবে, যদি রাস্তা পরিষ্কার থাকে। আমাদের মাইনাচিতে গাড়ি বদল করে টুটিকোরিণে যাওয়ার গাড়িতে উঠতে হবে।

আমরা দু'খানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে নিয়ে এসে প্লাটফর্মের উপর গাড়ির অপেক্ষায় বসে থাকি। নাই কোন নির্দিষ্ট সময় ট্রেনের যাতায়াতের। কণ্ট্রোল অভাবে জানা যাবে না ট্রেনের আগমনও, যতক্ষণ না ট্রেন ষ্টেশনে এসে পৌছায় ; তাই সাহস হয় অপেক্ষা-গৃহে অপেক্ষা করতে।

বেজে যায় রাত্রি দশটা। অতিবাহিত হতে থাকে সময়, অতিবাহিত হয় মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিন্তু আসে না কোন গাড়ি, শোনা যায় না শ্যামের বাঁশরী, আমরা গাড়ির অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে থাকি। ক্রমে ঘুমিয়ে পড়ে যাত্রীরা, সাড়া মেলে না কুলিদেরও, নিস্তব্ধ হয় প্লাটফর্ম। ধীরে ধীরে আমারও চোখ বুজে আসে, ঠিক পাই না কখন ঘুমিয়ে পড়ি। হঠাৎ এক ভীষণ কলরোলে ভেঙে যায় তন্দ্রা। সমবেত কণ্ঠের 'ঐ গাড়ি এসেছে' চীৎকারে মুখর হয়ে ওঠে প্লাটফর্ম, যাত্রীরা করে ছুটোছুটি। কুলিরা যে যার মাল মাথায় নিয়ে প্রস্তুত হয়। আমরাও উঠে প্রস্তুত হয়ে গাড়ির আগমনের অপেক্ষা করতে থাকি। শেষে সত্যিই একখানি এঞ্জিন এসে প্লাটফর্মে প্রবেশ করে। কিন্তু নয় সেখানি ত্রিবেন্দ্রাম একস্প্রেস, যাত্রীবাহী গাড়িও নয়। দেখি দাঁড়িয়ে আছে একখানি 'পাইলট' এঞ্জিন, দেখতে গিয়েছিল আগের ষ্টেশনে, জানতে গিয়েছিল এসেছে কিনা কোন যাত্রীবাহী গাড়ি।

হতাশ হয়ে বসে পড়ি স্যুটকেশের ওপর। হাত ঘড়িতে দেখি রাত্রি বারোটা বেজে গিয়েছে।

পুনরুক্তি হয় এই প্রহসনের আরও বার-দুই। শেষে রাত্রির অবসান হয়, ভোরের আলো দিগন্তে ফুটে ওঠে। অবসান হয় আমাদের নিদারুণ কষ্টেরও। বেলা তখন ছ'টা, অতর্কিতে ত্রিবেন্দ্রামে যাওয়ার গাড়ি এসে প্লাটফর্মে দাঁড়ায়। আমরাও জিনিসপত্র নিয়ে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে পড়ি।

বিকেল তিনটেয় আমাদের ট্রেন এসে থামে মাইনআচি ষ্টেশনে। হয় না কোন বিপদ পথে। আমরা ট্রেন থেকে নেমে জিনিসপত্র নিয়ে অপেক্ষাগৃহে গিয়ে উপস্থিত হই। শুনি টুটিকোরিণ একস্‌প্রেস পৌঁছাতে তিন ঘণ্টা দেরী আছে। একটি ছোট রেস্তরাঁ থেকে কিছু খাবার ও চা খেয়ে এসে বসি অপেক্ষাগৃহে, ট্রেনের অপেক্ষা করতে থাকি।

এমন সময় পাশে এসে বসেন দু'জন কালো মাদ্রাজী সাহেব। তাঁরাও এই ট্রেনেই মাদ্রাজ থেকে এসেছেন। টুটিকোরিণে তাঁদের বাড়ি, মাদ্রাজ শহরে কর্মস্থল। শুনি মাদ্রাজ থেকে এই ট্রেনে মাইনআচিতে পৌঁছাতে চার দিন চার রাত্রি লেগেছে। ঝড়ের জন্য পথের মধ্যে আটকে যায় ট্রেন, রুদ্ধ হয় তার গতি, দু'দিন দু'রাত্রি দাঁড়িয়ে থাকে এক মাঠের মাঝখানে। নাই খাবার, নাই জল, কাটে তাঁদের দিন নিদারুণ কষ্টে। তার উপর টেলিগ্রাফের পোষ্ট আর রাস্তার গাছে অবরুদ্ধ সামনের রাস্তা, নিশ্চয়তা নেই সামনের ষ্টেশনে পৌঁছাবার। তাই কাটাতে হয় এক অজানা আশঙ্কায়। শেষে পরিষ্কার হয় রাস্তা, ট্রেন চলে মন্থর গতিতে, উপস্থিত হয় এক ষ্টেশনে, মেটে তাঁদের ক্ষুধা তৃষ্ণা। অবশেষে পৌঁছে যান নিজের দেশেও। করমণ্ডল উপকূলে এই ঝড়ের উৎপত্তি, শেষ হয় এসে তিরুচুরাপল্লীর মাইল পঞ্চাশেক দূরে। গত একশ' বছরের মধ্যে হয় নাই না কি এমন সর্বনাশা ঝড়।

তিনিই বলেন, নাই কোন মন্দির টুটিকোরিণে। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই ক্রিশ্চিয়ান। স্যার রামস্বামী না থাকলে বাকী অংশও ক্রিশ্চিয়ানে পরিণত হত, থাকতো না কোন হিন্দু।

রাত্রি সাড়ে সাতটায় টুটিকোরিণে এসে পৌঁছাই।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## কুমারিকা ঃ কন্যা-কুমারীর মন্দির ঃ

টুটিকোরিণে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠি। একেবারে সমুদ্রসৈকতের উপর।

পরের দিন। সেদিন শনিবার। বন্ধু দেন একখানি ভাল মোটর গাড়ি আর একজন গাইড। বেলা বারটায় খাওয়া দাওয়া সেরে কন্যা-কুমারী দর্শনে রওনা হই।

আজীবনের স্বপ্ন আমার কন্যা-কুমারী দেখবো। দেখবো যেখানে ভারতমাতা বিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। দেখবো সেই তিন মহাসাগরের মিলনক্ষেত্র। আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগর। দেখবো সেখানে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত। দেখবো কুমারী গৌরীকে। দেখবো কি তপস্যা করেছিলেন তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে স্বামিরূপে পাওয়ার জন্য। আর দেখবো সাগরের বুকে সেই শীলা—যার উপর দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন বিশ্বজয়ের প্রেরণা। সত্যিই কি সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলে আজ! এতদিনে?

যেতে হবে টিনেভ্যালি হয়ে। টিনেভ্যালি (তিরুন্যালভ্যালি) টুটিকোরিণ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল। সেখান থেকে কন্যা-কুমারী নব্বই মাইল। আমাদের গাড়ি প্রথম থেকেই ছোটে ষাট মাইল বেগে। মাইল কয়েক তু'পাশে ধানের ক্ষেত দেখতে দেখতে যাই। পার হয়ে যাই ছোট গ্রামও মাঝে মাঝে। যেখানেই গ্রাম সেখানেই একটি মন্দির। মনে হয় দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা গড়ে উঠেছে মন্দিরকে কেন্দ্র করে। মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলেছি। তু'ধারে সবুজ ধান ক্ষেত ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। হঠাৎ দূর থেকে দেখা যায় —একটি ছোট গোপুরমের শীর্ষদেশ অথবা মন্দিরের চূড়া। কাছে এসে দেখি একটি ছোট গ্রাম ঘিরে আছে এই গোপুরমকে। মন্দিরকে। মন্দিরের আকার আর গোপুরমের চূড়ার আকার বাড়ে। বাড়ে গ্রামের আকার আর প্রকৃতি। পরিণত হয় বড় গ্রামে। শহরে। রাজধানীতে। এমনই করেই গড়ে উঠেছে চিদাম্বরম্, তাঞ্জোর, তিরুচুরাপল্লী, তিরুন্যালভ্যালি, মাতুরাই, আর

রামেশ্বরম্। লোকেরা মাঠে চাষ করে। আর দু'বেলা পূজা দিয়ে আসে মন্দিরে। যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট। নাই তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার। নাই খাবারের আড়ম্বর। থাকে শুধু পায়ে। পরে একখানি আট হাত ধুতি। লুঙির মত কোমরে জড়িয়ে নেয়। গায়েও জড়ায় না কিছু। একটি ছোট উড়ানি পাট করে রাখে কাঁধের উপর। সম্ভ্রান্তেরা রাখেন তোয়ালে। করেন সর্বত্র যাতায়াত। এতে সঙ্কোচ বা লজ্জা অনুভব করেন না তাঁরা। এই বেশই তাঁরা নিয়েছেন বেছে। এতেই তাঁদের গৌরব। রেলগাড়িতে বহু সম্ভ্রান্ত দক্ষিণ ভারতীয়কে এই বেশেই বহু দূরের পথে যেতে দেখেছি। সারা দক্ষিণ ভারতে শীত না থাকায় এতে মোটেই কষ্ট হয় না তাঁদের। খাওয়াও খুব সাধারণ। কিছু ভাত। একটু ঘি। সম্বরম্ ( পাতলা ডালের মধ্যে কোনও একটি সবজি দিয়ে তৈরী ) আর রসম্ ( তেঁতুল, লঙ্কা ও কিছু মসলা দিয়ে তৈরী ) তাদের দুপুরের ও রাত্রির খাদ্য। ইটুলি, ডোসা, পাকোড়া আর চাটনী খায় সকাল সন্ধ্যায়। জীবনযাত্রায় নাই কোনও বাহুল্য। মন্দিরে গিয়ে পূজা দিতে, হয় না তাদের সময়ের অভাব। ধর্মকেই দিয়েছে প্রধান স্থান। দৈহিক সুখ তাদের কাছে হয়েছে গৌণ। তাই তারা ধার্মিক অতিথি বৎসল আর সদালাপী। যেখানেই গিয়েছি পেয়েছি তাদের কাছে পরম সমাদর। সদাই ব্যগ্র, কি করে আমাদের উপকারে আসবে।

এর ব্যতিক্রম যে নাই তা নয়। সব জায়গাতেই আছে ভাল আর মন্দ। আছে পাশাপাশি। দক্ষিণ ভারতে ভালো'র সংখ্যাই বেশি দেখি। এখানেও এদের মধ্যেই কুম্ভকোণাম্ সম্বন্ধে একটি কৌতুক প্রচলিত আছে। সেখানকার লোকেরা নাকি অতি প্রখর বুদ্ধিশালী। কিন্তু খাটায় সে বুদ্ধি নিজেদের দৈহিক সুখের জন্য। তাই বেশীর ভাগ বড় চাকুরিয়া, বড় আইনজীবী, বড় ব্যবসায়ী কুম্ভকোণাম্ থেকে এসেছেন, আমার দু'চার জন দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধুও এই প্রচলিত বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে দ্বিমত হন নাই।

টিনেভ্যালি বা তিরুন্যালভ্যালি পর্যন্ত রাস্তার দু' পাশের রূপের কোনও পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। এই অঞ্চলকে স্বর্ণপ্রসূ বলা হয়। এমন প্রচুর ধান দক্ষিণ ভারতের আর কোথাও নাকি জন্মায় না। তাই এই জায়গার নাম রাখা হয়েছে তিরুন্যালভ্যালি। সঙ্গের গাইডের কাছে শুনি এই নামকরণের সম্বন্ধে

প্রবাদ আছে যে, পুরাকালে একসময় এখানকার অধিবাসীরা দিয়েছিল ধর্মকর্ম বিসর্জন। লিপ্ত হয়েছিল নানারকমের পাপকার্যে। রুষ্ট হলেন ভগবান। স্থির করলেন। অনাবৃষ্টি এনে দেশের সমস্ত শস্য জ্বালিয়ে দেবেন। লোকগুলি অনাহারে তিল তিল করে মরে যাবে। এইভাবে হবে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এদের মধ্যে ছিলেন এক ধর্মপ্রাণ চাষী। জীবনে একটিও পাপের কাজ করেন নাই তিনি। মন্দিরে গিয়ে ধর্ণা দিলেন ঠাকুরের কাছে। তাঁর প্রার্থনা পৌছুল ভগবানের কানে। আদেশ পেলেন তাঁর জমিটুকু বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলতে। সেখানকার ধানের হবে না কোনও অনিষ্ট। হলও তাই। আশে পাশের জমির ধান গেল পুড়ে। লোকগুলি একে একে মরে গেল অনাহারে। বেড়ার মধ্যকার ধানের হল না কোনও ক্ষতি। ফললো দ্বিগুণ ফসল। সেই থেকে এই জায়গার নাম হল পবিত্র বেড়া দেওয়া ধানের ক্ষেত। তামিল ভাষায় তিরুন্যালভ্যালি।

তিরুন্যালভ্যালি পেরিয়ে কিছু দূর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার রূপ যায় বদলে। আরম্ভ হয় উঁচু-নীচু পাহাড়ের পরিবেশ। তার সঙ্গে জঙ্গল। কখনও পাতলা, কোথাও বা গভীর, দুর্ভেদ্য। রাস্তা চলে গিয়েছে তার ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে। কখনও উঁচুতে, কখনও নীচুতে। দু'ধারে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই। নাই কোনও গ্রাম। অন্য দেশে হলে এমন রাস্তায় থাকতো অনেক রকমের বিপদের আশঙ্কা। চোর ডাকাতের ভয়। দক্ষিণ ভারত সে সবের বহু উর্ধ্বে। এখানকার লোকেরা এমনই নিরীহ ও ধর্মপ্রাণ যে রাহাজানি কথাটাও তাদের জ্ঞানের বাইরে। একখানি গাড়ি, ড্রাইভারকে নিয়ে আমরা চারি জন সওয়ারি। যদি কেউ গাড়ি আটক করে, আমাদের নামিয়ে মেরে মাটিতে পুঁতে রাখে—সে খবর সভ্য জগতে পৌছাবে কিনা সন্দেহ। সেই দিন-দুপুরেও আমরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। কাঁটা দিয়ে ওঠে আমাদের সর্বাঙ্গে। সে ভয় যে কত অমূলক তার পরিচয় পাই ফিরবার সময়। যখন আমাদের গাড়ি পঞ্চাশ মাইল বেগে অতিক্রম করে এই রাস্তা রাত্রি এগারোটায়। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল এই রকম পথ পার হয়ে আসবার পর আমরা আসি আবার সমান রাস্তায়। রাস্তার দু'ধারে শস্যহীন অনুর্বর জমি। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এক একটি প্রকাণ্ড মহীরুহ। ভীতিপ্রদ না হলেও

নয়নমুগ্ধকর নয়। তারপর আসে অনুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী। কখনও অতি দূরে, কখনও পাশে। আবার কখনও একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তা বন্ধ করে। মনে হয় এইখানেই বুঝি হবে যাত্রার শেষ। পৌছান যাবে না কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত। আবার রাস্তার দু'ধারে দেখা দেয় গ্রাম। লোকের মুখ দেখতে পাই আমরা। মনে হয় এ জগতে শুধু আমরা চারিটি প্রাণীই নই, আছে অনেক লোক। দেখা দেয় আবার ছোট ছোট মন্দির রাস্তার দু'ধারে, পাহাড়ের চূড়ায়। দেখা দেয় পাহাড়ের গায়ে লাল মাটি। কি অপূর্ব শোভা তার। গেরুয়া নয়, একেবারে লাল, গাঢ় লাল। এসে পড়ি লাল মাটির দেশে। রাস্তা লাল। দু'পাশের জমির রং লাল। লাল বাড়িগুলির দেওয়াল আর চালার রং। তার মাঝে মাঝে সবুজ পরিচিত গাছ। আম, কাঁঠাল, জাম আর নারিকেল। যেমন ঘোর সবুজ তাদের রং তেমনই সতেজ। পারিপার্শ্বিক লালের সঙ্গে কি অপূর্ব সমন্বয়। সেই শীতকালেও গাছে-গাছে অসংখ্য আম আর কাঁঠাল ফলে আছে। দেখে বিস্ময় জাগে মনে। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মাইল এই রকম চলবার পর এসে পৌছাই এক 'কন্‌ক্রিটে'র রাস্তায়। এই রাস্তা দক্ষিণ ভারতের গৌরব। যোগ করেছে ত্রিবেন্দ্রাম্ আর কন্যা-কুমারীকে। পঞ্চান্ন মাইল এর দৈর্ঘ্য। আর এমন প্রশস্ত যে অনায়াসে চলে যেতে পারে চারিখানি গাড়ি পাশাপাশি এর বুকের উপর দিয়ে। সমস্তটাই 'সিমেণ্ট কন্‌ক্রিটে' তৈরী। আমরা মোড় নিই বাঁদিকে কন্যা-কুমারীতে যাওয়ার জন্য। রাস্তা চলে গিয়েছে উঁচু দিয়ে। পাহাড়ের উপর দিয়ে। দু'দিকে নীচুতে দেখা যাচ্ছে সেই লাল মাটির দেশ। মাঝে মাঝে পরিচিত সবুজ গাছ। নয়নাভিরাম সে দৃশ্য। ভুলে যাই রাস্তার ক্লান্তি। পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকি রাস্তার দু'পাশে। কখন গাড়ি কন্যা-কুমারিকার 'কেপ' হোটেলের পাশে এসে থেমে যায় জানতে পারি না।

ড্রাইভার নেমে গাড়ির দরজা খুলে দেয়। চমক ভাঙে। নেমে পড়ি গাড়ি থেকে। তবে কি সত্যই শেষ পর্যন্ত কন্যা-কুমারীতে এসে পৌছাই। সফল হয় আজীবনের স্বপ্ন।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই সামনে। পৌছাই সেই বিন্দুতে। যেখানে মিলন হয়েছে তিন সমুদ্রের। বাঁদিকে চঞ্চল বঙ্গোপসাগর। প্রচণ্ড গর্জনে

আছড়ে পড়ছে অবিরাম। ডানদিকে ধীর স্থির আরব সাগর, সৌম্য প্রশান্ত। সামনে গম্ভীর ভারত মহাসাগর। বিরাট, অন্তহীন। দিগন্তে গিয়েছে মিশে। মনে হয় বঙ্গোপসাগর উদ্দাম বেগে ছুটতে ছুটতে এসে হঠাৎ হারিয়ে ফেলে তার গতি। এক হয়ে যায় আরবের সঙ্গে। তারপর দু'জনে আশ্রয় নেয় গিয়ে—ভারতের বুকে। হারিয়ে ফেলে নিজেদের পৃথক সত্তা। ছোটে অনন্তের পানে। মিশে যায় নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ। সৃষ্টি করে একটি নীল রং-এর সমুদ্র। ভাবি এ ত বিন্দুতে মিশে যাওয়া নয়। নয় এ পরিসমাপ্তি ভারতমাতার এই তিন সমুদ্রের মিলন ক্ষেত্রে এসে। এইখানেই এই নীল সমুদ্রের নীচেই জন্ম নিয়েছেন তিনি। মস্তকে নিয়েছেন হিমালয়। হাতে ধরেছেন দুই মহাসাগর। আরব সাগর আর বঙ্গোপসাগর। অঙ্গে ঝুলিয়েছেন গঙ্গা যমুনা সিন্ধু, কাবেরী আর গোদাবরীকে। তাই এই স্থানই বেছে নিয়েছেন গিরিকুমারী গৌরী প্রেমের তপস্যার জন্য। হবে দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে মহামিলন। মনে হয় এ তপস্যা কেবল মাত্র তিনিই করছেন না। করছে জগতের সমস্ত কুমারী। করছে তাদের প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের জন্য। এ প্রকৃতির তপস্যা পুরুষকে লাভ করবার জন্য। এ প্রেমের তপস্যার আরম্ভ আদিতে—চলবে যুগযুগান্তর ধরে। শেষ হবে না কখনও। তাই এইখানেই লুকিয়ে আছে সৃষ্টির আদি রহস্য। আজ বুঝতে পারি কেন স্বামীজি পেয়েছিলেন তাঁর বিশ্ব মিলনের প্রেরণা এই কন্যা-কুমারিকা থেকে। কেন আরম্ভ হয়েছিল তাঁর মিলনের যাত্রা এই তিন সাগরের মিলনক্ষেত্র হতে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ দেখি এই অপূর্ব শোভা। প্রণাম করি এর সৃষ্টিকর্তাকে ভক্তিভরে। বসে পড়ি পাড়ের উপর। তখনও সূর্যাস্ত হওয়ার আধ ঘণ্টা বাকী। যেখানে বসি সেটি একটি বালির পাহাড়। সমুদ্রের বালি ঢেউ-এর দোলায় উপরে উঠে জমে গিয়েছে পাড়ের উপর এসে। সৃষ্টি করেছে একটি পাহাড়। সেটি এত উঁচু যে পাড়ের বড় বড় নারিকেল গাছগুলি ডুবে গিয়েছে তার তলায়। বার হয়ে আছে শুধু তাদের পাতা। দেখে খুবই আশ্চর্য হই। এ দৃশ্য এখানে ছাড়া দেখি নাই আর কোথাও।

একটু পরে উঠে গিয়ে বসি এমন একটি জায়গায়, যেখান থেকে সূর্যাস্ত দেখা যাবে ভাল করে।

আমরা বসে আছি বালিয়াড়ির একেবারে চূড়ার উপর। বালিয়াড়ি সোজা নেমে গিয়েছে আমাদের হাত দুই দূর থেকে। নেমে গিয়েছে প্রায় তিন তলা সমান নীচে। মিশেছে সাগরের বুকে। সূর্যদেব রয়েছেন ঠিক সামনে। আকাশের গায়ে। ম্লান হয়ে এসেছে তাঁর তেজ। ছড়িয়ে পড়েছে মাথার উপর, আকাশের গায়ে নানা বর্ণের ছটা। ক্রমে বিস্তৃত হতে থাকে সেই ছটা। ছেয়ে ফেলে সারা আকাশ, সমুদ্রের বুক। দেখতে দেখতে সূর্যদেব একটা লাল থালার আকার ধারণ করতে থাকেন। প্রবেশ করতে থাকেন বৃহৎ কলেবরে আরবের জলে। প্রবেশ করতে থাকেন অতি ধীরে। শেষে বাকী থাকে না একটুও। লাল হয়ে যায় সমস্ত দিগন্ত। মিশে যায় লাল সাগরের জল আর লাল আকাশ। হারিয়ে ফেলে তাদের নিজস্ব রূপ। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ অভিভূত হয়ে থেকে—

ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।

ধান্তারিং সর্বপাপোঘ্নং-কে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিই।

খানিকক্ষণ সমুদ্রের পাড়ের উপর বেড়াবার পর এসে পৌছাই কন্যা-কুমারীর মন্দিরে।

পুরাণে আছে গৌরীমাতা দেবাদিদেব মহাদেবকে স্বামিরূপে পাওয়ার জন্য এইখানে—এই তিন মহাসাগরের মিলন ক্ষেত্রে এসে তপস্যা করেছিলেন। সেইজন্য এই জায়গার নাম হয়েছে কন্যা-কুমারী। গৌরী কন্যারূপে পূজিতা এখানে। কন্যা-কুমারী ভারতের তীর্থসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধা আর পবিত্রতমা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে গৌরাঙ্গদেব এখানে এসে কুমারী মাকে পূজা দিয়ে ভাবাবেশে অভিভূত হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে হতাশ অন্তঃকরণে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন এই দেবী মন্দিরের সামনে এক শিলার উপর বসে পেয়েছিলেন বিশ্ব মিলনের প্রেরণা।

আমরা পূজার উপকরণ কিনে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি। অনেকগুলি ছোট বড় ঘর ও বারান্দা অতিক্রম করে মায়ের দ্বারে এসে পৌছাই। হাত বাড়িয়ে দয়িতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন মা। কখন আসবেন প্রিয়তম। কখন হবে তাঁদের মহামিলন। কিন্তু আসেন না প্রিয়তম, সুচীন্দ্রম পর্যন্ত এসে রুদ্ধ হয় তার গতি। পরিধানে রয়েছে একখানি বাসন্তী রং-এর

শাড়ি। গায়েতেও ঐ রং-এরই জামা। গলায় মুক্তার মালা। সর্বাঙ্গে ফুলের ভূষণ। অপরূপ সে মূর্তি। দেখে হয় না পরিতৃপ্তি। আমরা পূজা দিয়ে ফিরে আসি কেপ হোটেলে।

এই হোটেলটি দাঁড়িয়ে আছে একেবারে সমুদ্রের পাড়ের উপর। এর প্রাঙ্গণ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই মিলিত হয়েছেন তিন মহাসাগর। প্রতিটি ঘর মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত। প্রতি ঘরের সঙ্গে আছে একটি ছোট বারান্দা বা ( ব্যালকনি )। আমাদের টুটিকোরিণের বন্ধুর অনুগ্রহে আগে থেকেই দোতলার উপর একখানি ঘর আমাদের জন্য ঠিক করে রাখা হয়েছিল। সেই ঘরটির দু'দিক থেকেই দেখা যায় দুই সমুদ্র। দেখা যায় ব্যালকনির তিন দিক থেকে তিন সমুদ্র। হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করি কিছুক্ষণ। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে বসি গিয়ে ব্যালকনিতে। ইজিচেয়ারে গা দেই হেলিয়ে। দেখতে থাকি তিন দিকের তিন সমুদ্রের রাত্রির রূপ। অনেক রাত্রিতে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ি। ঘুম কিন্তু আসে না চোখে। অত্যধিক উত্তেজনায়, না স্বপ্ন সফল হওয়ার অবসাদে।

পরের দিন। ভোর হওয়ার আগেই ছুটি সূর্যোদয় দেখতে। মন্দিরের পাশে একটি খোলা জায়গায়। সেখান থেকেই নাকি দেখা যায় সূর্যোদয় সব চাইতে ভাল। কয়েকজন দর্শন অভিলাষী আমাদের আগেই সেখানে হাজির হয়েছেন দেখি। আমরা গিয়ে একটা ভাল জায়গা বেছে নেই। অপেক্ষা করতে থাকি তপনদেবের দর্শন আশায়। দেখতে দেখতে পূবের আকাশ হয়ে উঠতে থাকে লাল। সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠতে থাকে বঙ্গোপসাগরের বুক। ধীরে, অতি ধীরে একটি লাল রেখা ভেসে উঠতে থাকে সাগরের বুকে। মিশেছে যেখানে লাল সাগরের জল আর লাল আকাশ। রেখা ক্রমে একটি থালার আকার ধারণ করতে থাকে। ছড়িয়ে পড়তে থাকে লাল রং দিগন্তে। হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে সেই থালা আকাশের গায়ে। পৃথক হয়ে যায় সাগরের জল আর আকাশের সূর্য। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর অঙ্গ থেকে নানা বর্ণের ছটা। দিগন্ত হয় উদ্ভাসিত। আমরা আর একবার 'জবাকুসুম-সংকাশং'-কে প্রণাম করে হোটেলে ফিরে আসি।

চা আর কিছু জলযোগ করে যাই কাপড় আর তোয়ালে নিয়ে সমুদ্রে স্নান

করতে। মন্দিরের পাশেই স্নানের ঘাট। স্নান করে কাপড় বদলে আর একবার মায়ের মন্দিরে যাই। পূজা দিতে। এবারে দেখি মাকে সম্পূর্ণ অন্য সাজে। পরান হয়েছে আসমানী রং-এর শাড়ি। ফুলভূষণের পরিবর্তে সারা অঙ্গে উঠেছে বহুমূল্য জড়োয়ার অলঙ্কার। কপালে হীরের টিপ। গলায় মতির মালা। এই সাজে মাকে দেখায় রাজরাণীর মত। সেই মন-মোহিনী মূর্তির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি এক দৃষ্টে। পূজারীর মুখে শুনি রোজই মাকে তিন রূপে সাজান হয় তিন প্রহরে। সকালে পরেন তিনি আসমানী রং-এর শাড়ি। ছুপুরে লাল রং-এর। সন্ধ্যাকালে বাসন্তী রং-এর। পূজা দিয়ে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। একে একে দেখি বিবেকানন্দ লাইব্রেরি আর বিবেকানন্দ শিলা। শিলাটি আছে সমুদ্রের বক্ষে। কিনারা থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে। হয়ে আছে পরম পবিত্র। দেখে নেই যাওয়ার আগে একবার শেষবারের মত তিন মহাসাগরের মিলনক্ষেত্র। সেই একই রূপে চলেছে তাঁদের খেলা। বিরামহীন। ভক্তিভরে জানাই প্রণাম। নেই বিদায়, সঙ্গে করে নিয়ে আসি মনের মণিকোঠায় স্মৃতি। যা আজও হয়নি ম্লান। হয়ে আছে অক্ষয়। জাগরণে, শয়নে আর স্বপনে।

হোটেলে ফিরে প্রাতরাশ সেরে নিয়ে রওনা হই সেই গাড়িতেই ত্রিবেন্দ্রামের পথে।

## নবম পরিচ্ছেদ

### ত্রিবেন্দ্রাম ঃ

১। সুচিন্দ্রমের মন্দির ২। পদ্মনাভনের মন্দির।

আবার আমরা ত্রিবেন্দ্রাম কন্যাকুমারিকা রাস্তা দিয়ে চলেছি, শ্রেষ্ঠ রাজপথ দক্ষিণ ভারতের। আবার রাস্তার দু'পাশে দেখা যায় ফলে ভরতি সবুজ আম কাঁঠালের গাছ, দেখা যায় নারিকেল কুঞ্জ, আর কলাগাছের ঝাড়। দেখা যায় লাল প্রাঙ্গণে অবস্থিত লাল টাইলের ছাদে আচ্ছাদিত ঘরও। আমরা এক লাল মাটির দেশ অতিক্রম করি।

দেখতে দেখতে সুচিন্দ্রমের মন্দিরের দরজায় গাড়ি এসে থামে। গাড়ি থেকে নেমে সামনেই দেখি ১৪০ ফিট উঁচু এক মহিমাময় গোপুরম, বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় শিল্প-সম্ভার, নিদর্শন চরম উৎকর্ষের। মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দেখি এই গোপুরমের মহিমাময় রূপ, শিল্পীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি।

এই গোপুরমটি আর সুচিন্দ্রমের মন্দিরটি নির্মিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে, নির্মাণ করেন মাদুরার শিল্পীরা, এই সময়েই দ্রাবিড় মন্দির স্থাপত্য ও গোপুরম স্থাপত্য, উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে উপনীত হয়। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোপুরম, এই গোপুরমটি সমপর্যায়ে পড়ে শ্রীরঙ্গমের, মাদুরার আর কুম্ভোকো-নামের গোপুরমের, পড়ে পরিকল্পনার মহিমাময়ত্বে আর অঙ্গের আর শীর্ষ-দেশের অনবদ্য সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম শিল্প সম্ভারে।

একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে আমরা মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই, দেখি অবাক হয়ে মন্দিরের বিমানের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের কারুকার্য। একটি গম্বুজে পরিণত হয়েছে চূড়ার শীর্ষদেশ, শৃঙ্গে শোভা পায় তিনটি কলসি, বসান হয় একটির পর একটি, সবার উপর শোভা পায় একটি ত্রিশূল। শোভা পান বিমানের অঙ্গে অসংখ্য দেব-দেবী, অনবদ্য তাঁদের গঠন সৌষ্ঠব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় ভাস্কর্যের।

শৈব মন্দির, বিগ্রহ সুচিন্দ্রম। আমরা ভক্তিভরে পূজা দিয়ে মন্দির থেকে

বেরিয়ে আসি, দেখতে যাই নন্দীমণ্ডপম্। দেখি দেবতার দিকে মুখ করে মঞ্চের উপর বসে আছেন নন্দী, অনুরূপ তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দিরের নন্দীর, সমপর্যায়ে পড়ে আকৃতিতে আর গঠন সৌষ্ঠবে। নির্মিত এই নন্দীটিও একটি সম্পূর্ণ স্ফটিক পাথর কেটে। নন্দীমণ্ডপ দেখে আমরা হনুমানের মন্দির দেখতে যাই। দেখি মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন এক অতিকায় হনুমানজি, দাঁড়িয়ে আছেন এক মহিমাময় মূর্তিতে। দেখি নাই এমন বৃহৎ হনুমানের মূর্তি এর আগে। হনুমানজিকে প্রণাম করে আমরা কন্যা-কুমারীর মন্দির দেখতে যাই, এখানেও মন্দিরে বিরাজ করেন কন্যা-কুমারী। শুনি তপস্যা করেন হিমালয়-দুহিতা পার্বতী কুমারিকায়, তিন সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রে। তপস্যা করেন আরবসাগর বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে। তপস্যা করেন দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে মিলনের জন্য, কবে হবে তাঁদের মহামিলন। কৈলাসে বসে জানতে পারেন সেই তপস্যার কথা মহাদেব। তিনি মহামিলনের জন্য ছুটে আসেন, আসেন ব্যাকুল আগ্রহে। কিন্তু এই সুচিন্দ্রমে এসে রুদ্ধ হয় তাঁর গতি ; সম্ভব হয় না আট মাইল দূরে কন্যা-কুমারী পর্যন্ত পৌছান। ছুটে আসেন কন্যা-কুমারী থেকে পার্বতীও, কিন্তু মিলন হয় না দয়িতের সঙ্গে। তিনি হতাশ অন্তঃকরণে কন্যা-কুমারীতে ফিরে গিয়ে আবার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। তাই দাঁড়িয়ে আছেন এই মন্দিরে কন্যা-কুমারীও, দাঁড়িয়ে আছেন পিছন ফিরে।

কন্যা-কুমারীর মন্দির দেখে আমরা টেপাকুলম বা পবিত্র পুষ্করিণী দেখতে যাই। অতি মনোরম এই পুষ্করিণীটি, দাঁড়িয়ে আছে তার কেন্দ্রস্থলেও একটি স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ, অঙ্গে নিয়ে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি, প্রতীক শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় ভাস্কর্যের এক গৌরবময় যুগের, এক সুন্দরতম সৃষ্টির। টেপাকুলমের পবিত্র জল স্পর্শ করে আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি সঙ্গে নিয়ে আসি এক স্মৃতি যা আজও মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে, আছে অম্লান হয়ে।

আবার আমাদের গাড়ি অতিক্রম করে মাইলের পর মাইল সেই অতি রমনীয় পরিবেশ, প্রকৃতির এক সুন্দরতম লীলাভূমি, শেষে সাতচল্লিশ মাইল অতিক্রম করে বেলা সাড়ে দশটায় আমরা ত্রিবেন্দ্রাম শহরে প্রবেশ করি। মিনিট দশেকের মধ্যেই পদ্মনাভনের মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই।

## ২

ত্রিবাঙ্কুরের রাজবংশের কুলদেবতা এই পদ্মনাভন্‌, তাঁরই নামে না কি শাসিত হয় তাঁদের রাজ্য। গাড়ি থেকে নামতেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। দেখি, বন্দুক কাঁধে নিয়ে সশস্ত্র প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে মন্দির। মাঝে মাঝে পরিক্রমণ করছে মন্দিরের চতুর্দিকও। দেখি নাই এমন ব্যবস্থা অন্য কোনো মন্দিরে।

আমরা গোপুরম দেখে মন্দিরে প্রবেশ করি। বিষ্ণুমন্দির বিগ্রহ পদ্মনাভন্‌। খুব সম্ভব মাদুরা যুগেই এই মন্দিরটিও নির্মিত হয়েছে। দেখি রুদ্ধ মন্দিরের দ্বার, শুনি বেলা দশটায় বন্ধ হয় এই দ্বার আবার বিকেল পাঁচটায় খোলে। তাই বঞ্চিত হই দেবদর্শনে, হয় না পূজা দেওয়াও। মনে মনে প্রণাম জানাই দ্বারের অন্তরালে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেবতাকে। তারপর বেরিয়ে আসি মূল মন্দির থেকে, দেখি যা কিছু দর্শনীয় আছে মন্দিরে।

দেখি সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ। দেখি স্তম্ভের অঙ্গে কত বরাহমূর্তি, মূর্তি কত কল্যাণ সুন্দরমের, কত অর্ধনারীশ্বরের, মূতি কত বিষ্ণুর, মূর্তি বিষ্ণুর দশাবতারের, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় ভাস্কর্যের, নিদর্শন এক গৌরবময় স্থষ্টির, এক অনুপম কীর্তির। দেখি কল্যাণমণ্ডপ, বুকে নিয়ে আছে এই মণ্ডপটিও দ্রাবিড় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। প্রণাম জানাই শিল্পীদের, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা আজও হয়নি ম্লান আছে অক্ষয় হয়ে মনের মণিকোঠায়।

সম্রাট অশোকের সময় এই ত্রিবাঙ্কুরেই রাজত্ব করতেন কেরল পুত্র, অন্যতম প্রাচীনতম অধিবাসী দক্ষিণ ভারতের। বাস করতেন তাঁরা পশ্চিম উপকূলে, মালাবারে, কোচিনে আর ত্রিবাঙ্কুরে। বাস করতেন পূর্ব উপকূলে, চোল মণ্ডলে চোলেরা আর প্রত্যন্ত প্রদেশে পাণ্ড্যরা। পরে তারা চের নামে পরিচিত হন, অধিকার করেন এক বিস্তৃত ভূমিকা দক্ষিণ ভারতের রঙ্গমঞ্চে। কখনও হন স্বাধীন, আবার স্বীকার করতে হয় কখনও পরাধীনতা, পল্লবদের, চোলদের, পাণ্ড্যদের অথবা বিজয় নগরের কাছে। এমনই করে কাটে যুগের পর যুগ।

অষ্টম শতাব্দীতে এই মালাবারেই কালাদির এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন আচার্য শ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য এক যুগাবতার। তিনি প্রচার করেন সারা ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদের বাণী, ভাষ্য রচনা করেন ভাগবত গীতার আর ব্রহ্ম-সূত্রের, স্থাপন করেন চারধামে চারিটি মঠ, তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে।

বাণিজ্য করতে আসেন ভারতে ইংরাজ। বন্ধুত্ব স্থাপন করেন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ইংরাজের সঙ্গে। তাই টিপু যখন ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করেন, ইংরাজ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন, পরাজিত হন টিপু তৃতীয় এ্যাঙ্গলো-মহীশূর যুদ্ধে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে। সেই থেকে বন্ধু তাঁরা ইংরাজের। হন মিত্ররাজা।

ত্রিবাঙ্কুর হয় মহা সমৃদ্ধিশালী ইংরাজের আমলে, সমপর্যায়ে পড়ে মহীশূরের সমৃদ্ধিতে, সংস্কৃতিতে আর কৃষ্টিতে। আছে এই উন্নতির মূলে স্যর সি. পি. রামস্বামী আইয়ারের উদ্যম আর প্রচেষ্টা। গড়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত হয় হাইকোর্ট, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা আর 'এ্যাকুইরিয়াম'। শোভিত করা হয় ত্রিবাঙ্কুর শহর অসংখ্য সুন্দর অট্টালিকায় আর প্রাসাদে।

তখন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর ছিল ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সরকারের অধীনে। আজ ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে এইখানেই স্থাপিত হয়েছে ভারতের প্রথম গণতান্ত্রিক কমিউনিষ্ট সরকার।

আমরা পদ্মনাভনের মন্দির দেখে উপনীত হই মাস্কট্ হোটেলে। একটি প্রথম শ্রেণীর হোটেল, সুন্দর আর আধুনিকতম আসবাবে সজ্জিত এই হোটেলটি। সেখানে খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা যাদুঘর দেখতে যাই। আছে এই যাদুঘরে দ্রাবিড় শিল্পের নিদর্শন। বহু মূল্যে আর পরিশ্রমে সংগ্রহ করা হয়েছে এই নিদর্শনগুলি সারা দক্ষিণ ভারত থেকে, প্রতীক তারা দ্রাবিড় স্থপতির আর শিল্পীর বহুশত বৎসরের সাধনার। প্রতীক দ্রাবিড় ভাস্করের সাধনারও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে কত নটরাজনের মূর্তি, কত অর্ধনারীশ্বর আর বরাহের মূর্তি। মূর্তি নটরাজনের বিভিন্ন তাণ্ডবের, আরও কত মূর্তি। পরিচায়ক তারা শিল্পীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, সৃষ্টির এক গৌরবময় যুগের।

যাদুঘর দেখে আমরা চিড়িয়াখানা দেখতে যাই। প্রকৃতির এক সুন্দরতম নিকেতনে এই চিড়িয়াখানাটি স্থাপিত। সবুজ ঘন পল্লবে আচ্ছাদিত হয়ে

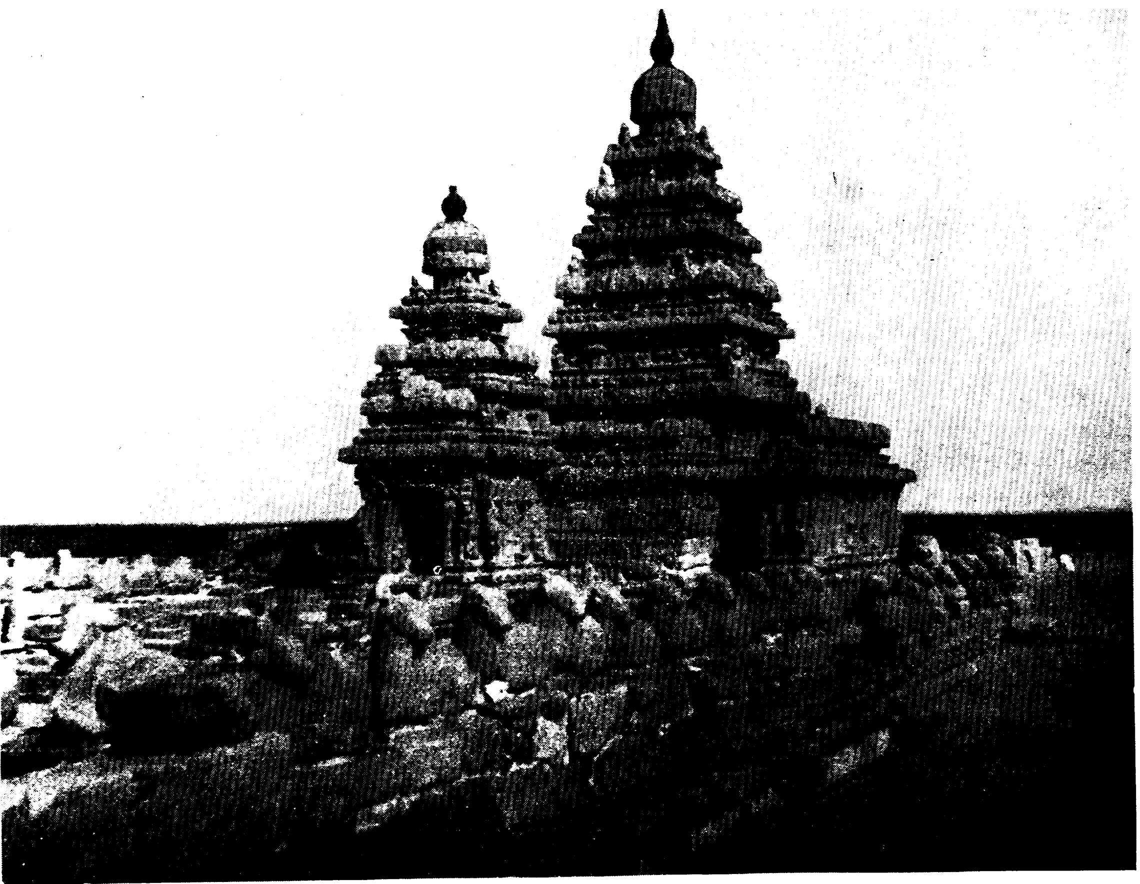
দাঁড়িয়ে আছে একটি ছোট্ট পাহাড়। তার গা দিয়ে চলেছে সর্পিল গতিতে লাল কংক্রীটের রাস্তা, কখন উঁচুতে কখনও নীচুতে, রাস্তার পাশে পাশে এক একটি লাল ইটের বাড়ি, সেই বাড়িতে বাস করে জন্তু জানোয়ার। বাঘের ঘরটি তৈরী হয়েছে একটি উঁচু টিলার ওপর, তার নীচে ঘাসে ভরতি একটি অনতি প্রশস্ত খাদ। একটি মাংসের টুকরো ফেলে দেওয়া হয় সেই খাদে, হঠাৎ একটি গর্জন শুনে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, এক লাফে বেরিয়ে এসে ভক্ষণ করছেন সেই টুকরোটি ব্যাঘ্র পুঙ্গব। শেষ হয় ভক্ষণ, ধীরে সুস্থে ফিরে যান তিনি নিজের বিবরে।

চিড়িয়াখানা দেখে আমরা এ্যাকুইরিয়াম দেখতে যাই। আরব সাগরের সৈকতে দাঁড়িয়ে আছে এ্যাকুইরিয়ামটি এক অতি রমণীয় পরিবেশে। সামনে দিগন্ত প্রসারী আরব সাগর, উত্তাল তরঙ্গ তুলে ছুটে আসছেন কূলের উপর, পিছনে লুকিয়ে আছে কাঁচের ঘরে কত জানা-অজানা মচ্ছিকুল বীভৎস তাদের আকৃতি, বিচিত্র তাদের প্রকৃতি। দেখি ঘুরে ঘুরে। তারপর হোটেলে ফিরে আসি।

চা খেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হই টুটিকোরিণের পথে। যাওয়ার পথে দেখে যাই সরকারী দপ্তর, হাইকোর্ট আর বিশ্ববিদ্যালয়।

যেতে হয় প্রায় দু'শ মাইল রাস্তা। মোটর চলে বিদ্যুৎ গতিতে। গভীর রাত্রিতে ফিরি টুটিকোরিণে। যাওয়ার পথে দেখে যাই তোতাদ্রীর মন্দির।

পরের দিন সকালের ট্রেনে রওনা হই মাদুরা অভিমুখে।

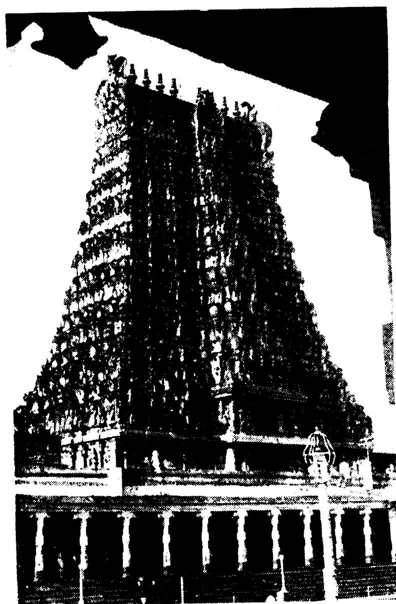


জলশয়ানের মন্দির—মহাবলীপুরম

পৃষ্ঠা ৫১

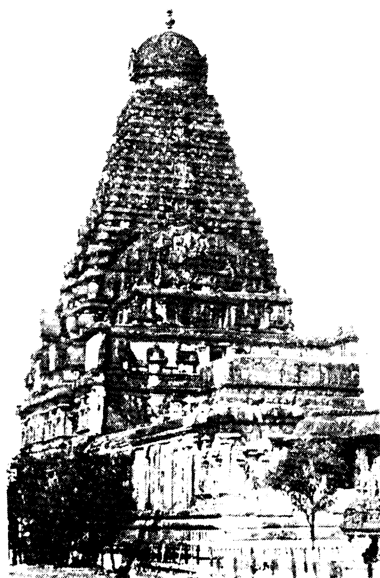


হোয়েসলেশ্বরের মন্দির—দ্বারসমুদ্র　　　　পৃষ্ঠা ১৫৫



মীনাক্ষী মন্দিরের গোপুরম

মাদুরা　　　　পৃষ্ঠা ১০০



বৃহদেশ্বরের মন্দির

তাঞ্জোর　　　　পৃষ্ঠা ৬০

## দশম পরিচ্ছেদ

### মাদুরা ঃ

১। মীনাক্ষী মন্দির ২। বসন্ত মণ্ডপম্

বেলা তিনটেয় আমাদের গাড়ি মাদুরা ষ্টেশনে এসে থামে। ষ্টেশনের বিপরীত দিকেই একটি চৌল্ট্রি বা ধর্মশালা আছে। আমরা সেই ধর্মশালায় জিনিসপত্র রেখে, টাঙায় চড়ে দেব দর্শনে রওনা হই। সঙ্গে নিয়ে যাই একজন গাইড্ বা প্রদর্শক। মিনিট দশেকের মধ্যেই মন্দিরের সামনে পৌছে যাই। প্রবেশ করি মন্দিরে।

মাদুরা দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম রাজধানী, স্থাপন করেন এই রাজধানী দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী পাণ্ড্য রাজারা। সম-পর্যায়ে পড়ে উত্তর ভারতের মথুরার।

প্রথম শতাব্দীতে এক পাণ্ড্য রাজা রোম সম্রাট অগাষ্ট্যাসের সভায় দূত প্রেরণ করেন। মহাপরাক্রমশালী হন পাণ্ড্য পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে। নবম শতাব্দীতে চোল, কেরল আর সিংহল পাণ্ড্যের অধিকারে আসে। তাঁদের বাণিজ্য পোত বয়ে নিয়ে যায় পণ্যের সম্ভার সুদূর বিদেশে। মহান্ সমৃদ্ধশালী হয় মাদুরা। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই চোল রাজা পরান্তক অধিকার করেন মাদুরা, স্বাধীনতা হারায় পাণ্ড্য রাজারা পরবর্তী তিনশ' বছর। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবার পাণ্ড্য হয় স্বাধীন, ছিন্ন করে অধীনতার পাশ। মাদুরা ফিরে পায় তার পূর্বগৌরব, পরিণত হয় দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরে, হয় সংস্কৃতি আর কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল। ১৩১১ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুর অধিকার করেন মাদুরা। ধ্বংসে পরিণত হয় মাদুরা, পরিণত হয় কত অসংখ্য মন্দির, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় স্থাপত্যের। রক্ষা পায় না রামেশ্বরমের প্রাচীন মন্দিরও। অন্তর্হিত হয় পাণ্ড্য দক্ষিণ ভারতের রঙ্গমঞ্চ থেকে।

মালিক কাফুরের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন একে একে দেবগিরির যাদব, তেলিঙ্গানার রাজা, বরঙ্গলের কাকতীয়, দ্বারসমুদ্রের হোয়সল বল্লাল

রাজারা। পরাজিত হন দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম চের, আর চোল রাজারাও। তাঁর ধ্বংসের লীলা ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ভারতের দিকে দিকে।

সৌভাগ্য ভারতের, এই সময়ে স্থাপিত হয় এক হিন্দুরাজ্য দক্ষিণ ভারতে। দুই ভাই, হরিহর আর বুক্ক, নিকটতম আত্মীয় মহীশূরের হোয়সল রাজাদের, কাজ করেন তাঁরা বরঙ্গলের রাজা কাকতীয় প্রতাপরুদ্রের অধীনে। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান জয় করে বরঙ্গল, পলায়ন করেন দুই ভাই, আনাগুণ্ডিতে গিয়ে আশ্রয় নেন। নিযুক্ত হন সেখানকার রাজার অধীনে। মালিক কাফুর অধিকার করেন আনাগুণ্ডি। বন্দী হন দুই ভাই। তাঁদের রাজধানী দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। উত্তেজিত হন দিল্লীর হিন্দুরা, করেন বিদ্রোহ সম্রাটের বিরুদ্ধে। মুক্তি লাভ করেন দুই ভাই। নিযুক্ত হন আনাগুণ্ডির শাসনকর্তা। শাসন করেন খিলজীর প্রতিনিধি হয়ে।

সহায় হন তাঁদের বিদ্যারণ্য, এক খ্যাতিমান পণ্ডিত আর জ্যোতিষী। তারই পরামর্শে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে, স্থাপিত হয় রাজধানী বিজয় নগর। হরিহর হন বিজয় নগরের প্রথম স্বাধীন রাজা, রাজত্ব করেন ১৩৩৬ থেকে ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি একে একে পুনরুদ্ধার করেন মুসলমান অধিকৃত হিন্দু রাজ্যগুলি। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা উত্তরে কৃষ্ণা নদী থেকে দক্ষিণে কাবেরী আর পূর্বে পূর্ব ঘাট থেকে পশ্চিমে পশ্চিম ঘাট পর্যন্ত।

মৃত্যু হয় হরিহরের, তাঁর ভাই বুক্ক অধিরোহণ করেন সিংহাসনে। অলঙ্কৃত করেন সিংহাসন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হরিহর ১৩৭৯ থেকে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। হন মহারাজাধিরাজ। তিনিই সংস্কার করেন দ্রাবিড়স্থানের মন্দির, সংস্কৃত হয় শ্রীরঙ্গমের আর মাদুরার মন্দিরও। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় বিজয় নগরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজত্ব করেন ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনিই সর্ব শ্রেষ্ঠ রাজা বিজয় নগরের, শ্রেষ্ঠতম সমসাময়িক ভারতের রাজাদেরও, বীরত্বে, পাণ্ডিত্যে, কৃষ্টিতে আর রাজনীতিতে। পরাজিত করেন, বিজাপুরের আদিল সাহকে আর উড়িষ্যার রাজাকে। অন্ধ্র, তামিলনাদ, দক্ষিণ দেশ, রয়লাসীমার অংশ, মহীশূর, সালসেট আর ত্রিবাঙ্কুর কোচীন তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পৃষ্ঠপোষক তিনি নিজের মাতৃভাষা তেলেগুর, পৃষ্ঠপোষক সংস্কৃত ভাষারও।

অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা, আটজন কবি, খ্যাত তাঁরা অষ্টদিগ্গজ নামে। তিনি নির্মাণ করেন বহু মন্দির, মন্দির দিয়ে শোভিত করেন সারা দক্ষিণ ভারত, শোভিত হয় কাঞ্চীপুরম, চিদাম্বরম আর ভেলোর। বুকে নিয়ে আছে এই সব মন্দির শ্রেষ্ঠ বিজয় নগরের স্থপতির শিল্প-সম্ভার, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় স্থপতিরও। প্রতীক এক অনুপম সৃষ্টির, এক গৌরবময় কীর্তির। উপনীত হয় বিজয় নগর সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ শিখরে, পরিণত হয় সভ্যতা, সংস্কৃতি আর কৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে। পরিচিত হয় বিজয় নগর এশিয়ার সুন্দরতম নগর বলে। দ্রাবিড় স্থপতি, দ্রাবিড় ভাস্কর আর দ্রাবিড় শিল্পী ফিরে পায় হৃত গৌরব।

১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথ, বিজয় নগরের এক সেনা নায়ক, অধিকার করেন মাদুরার সিংহাসন, স্থাপিত হয় মাদুরাতে নায়ক বংশ। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অলঙ্কৃত করেন মাদুরার সিংহাসন। তিরুমল নায়ক, সর্ব শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের। তিনিই নির্মাণ করেন মন্দির, মাদুরাতে, ত্রিচিনোপল্লীতে, শ্রীরঙ্গমে, চিদাম্বরমে, আর তাঞ্জোরে। নির্মাণ করেন মাদুরাতে, বসন্ত-মণ্ডপম্, বুকে নিয়ে আছে এই সব মন্দিরগুলি শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক এক গৌরবময় সৃষ্টির। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নায়করা রাজত্ব করেন মাদুরাতে আর ত্রিচিনোপল্লীতে। শেষে কর্ণাটকের নবাবের ষড়যন্ত্রে সিংহাসন-চ্যুত হন শেষ নায়ক নৃপতি রাণী মীনাক্ষীদেবী। লুপ্ত হয় মাদুরার গৌরব, অবসান হয় দক্ষিণ ভারতের এক গৌরবময় যুগের।

শৈব মন্দির, বিগ্রহ সুন্দরেশ্বর আর দেবী মীনাক্ষী। শুনি পার্বতীর অবতার এই মীনাক্ষীদেবী। বিবাহ হয় তাঁর সুন্দরের সঙ্গে। তাই সহপূজিতা সুন্দরের। মন্দিরটিও মীনাক্ষীর মন্দির নামে খ্যাতি লাভ করে।

একটি বিশাল আয়তক্ষেত্রের মধ্যে এই মন্দিরটি অবস্থিত, তার দুই বাহুর পরিধি ৭২০ × ৭২৯, অপর দুই বাহুর ৮৩৪ × ৮৫২ ফিট। একটি উঁচু প্রাচীর প্রাঙ্গণটিকে বেষ্টন করে আছে। দাঁড়িয়ে আছে বাইরের প্রাঙ্গণের চার প্রবেশ দ্বারে চারিটি ১৫০ ফিট্ উঁচু বিশাল গোপুরম, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় শিল্প-সম্ভার। আছে আরও ছয়টি ক্ষুদ্রতর গোপুরম। তিনটি আছে দ্বিতীয় প্রাকারে, দুইটি মীনাক্ষী প্রাকারে, একটি শোভা করে আছে অষ্টশক্তির প্রবেশ দ্বার। তারাও অনুপম শিল্পসম্পদে।

সুন্দরেশ্বর আর মীনাক্ষীর মন্দির ছাড়াও আছে হু'টি গণেশের মন্দির, সুব্রমনিয়ামের মন্দির, নন্দীমণ্ডপ বেদী আর যবনদ্বীপেশ্বরের মণ্ডপ। মন্দির নবগ্রহের, নটেশ্বরের আর অষ্টলক্ষ্মীর। আছে মুডালি পিলাই মণ্ডপম্, ষোল-স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপম্ আর সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপম্। আর আছে বীর বসন্ত রায়ের মণ্ডপম্, কল্যাণ সুন্দর মণ্ডপম্, নির্মিত হয় ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে, সর্ববৈয়াকরণ মণ্ডপম্ ও চিত্র মণ্ডপম্। আছে তত্ত্ব শুদ্ধির মন্দির, নির্মিত হয় ১৭০০ খৃষ্টাব্দে, আর মাদুরা নায়কের মন্দির। শোভা করে আছে একটি টেপাকুলম বা পবিত্র পুষ্করিণী। তার নাম সোনার পদ্মের পুষ্করিণী।

আমরা বিস্ময়ে মুগ্ধ হই, স্তব্ধ হই দেখে গোপুরমের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প-সম্ভার। দেখি তাদের অঙ্গে কত অনবদ্য গঠন, দেব-দেবীর মূর্তি, কত সূক্ষ্মতম লতাপাতা আর ফুল। যেমন মহিমময় তাদের পরিকল্পনা, তেমনই অনবদ্য রূপদান। দেখি মাদুরার স্থপতির এক অনুপম সৃষ্টি, সৃষ্টি এক গৌরবময় যুগের। এইখানেই, নয় কাঞ্চীপুরমে, নয় চিদাম্বরমে, নয় শ্রীরঙ্গমেও, গোপুরম স্থাপত্য পায় পূর্ণ পরিণতি, লাভ করে চরম উৎকর্ষ। রেখে যান তাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রতীক দ্রাবিড় গোপুরমের, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দেখে হয় না পরিতৃপ্তি, মেটে না আশ শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের সৃষ্টি কর্তাকে, জানাই শিল্পীদেরও। ঘুরে ঘুরে দেখি আরও তিনটি গোপুরম, তারা শোভা করে আছে বাইরের প্রাকারের প্রবেশ পথগুলি। সমপর্যায়ে পড়ে প্রথম দেখা গোপুরমটির, সবগুলিই অপরূপ, মহিমময়। বিস্ময় বাড়ে মনে। পাণ্ডা একটি ছোট্ট ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে একটি গোপুরমের অঙ্গ। বার হয়ে আসে স্বর, ক্রমে পরিবর্তিত হয় সুরে, শোনা যায় সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। অবাক হই শুনে।

প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে প্রবেশ করি সুন্দরেশ্বরের মন্দিরে। প্রবেশদ্বারে শোভা পায় অপরূপ স্তম্ভ। তার অঙ্গে বিরাজ করেন স্বামী-লিঙ্গনাথম, প্রকৃষ্ট নিদর্শন প্রতিমূর্তির। দেখে মুগ্ধ হয়ে ভক্তিভরে পূজা দিয়ে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। সুন্দরেশ্বরের প্রাকার অতিক্রম করে আমরা উপস্থিত হই মীনাক্ষীর প্রাকারের প্রবেশদ্বারে। শোভা করে আছে প্রবেশদ্বার একটি গোপুরম, ক্ষুদ্রতর, কিন্তু তার অঙ্গে আর চূড়াতেও আছে অনবদ্য

শিল্প-সম্ভার। দেখে মোহিত হই। মন্দিরে প্রবেশ করে পূজা ও আরতি দিয়ে দেখি নন্দী মণ্ডপ। দেখি দেবতার দিকে মুখ করে মঞ্চের উপর বসে আছেন এক জীবন্ত নন্দী।

নন্দী মণ্ডপ দেখে আমরা একে একে দেখি সুব্রমনিয়ামের মন্দির, গণেশের মন্দির, কবির কলেজ, নটেশের মন্দির আর বেদী। দেখি নবগ্রহের মন্দিরও। দেখি যবনদ্বীপেশ্বরের মণ্ডপম্, মুদালি পিলাই মণ্ডপম্, বীর বসন্ত মণ্ডপম্, কল্যাণ সুন্দর মণ্ডপম্ আর চিত্রা মণ্ডপম্। অঙ্গে নিয়ে আছে এই সব মণ্ডপম্ অপরূপ শিল্পসম্পদ, মাদুরার স্থপতির শ্রেষ্ঠ দান, সুন্দরতম দান দ্রাবিড়স্থানের স্থপতিরও।

একটি সুন্দর গোপুরম অতিক্রম করে আমরা প্রবেশ করি অষ্টলক্ষ্মীর মণ্ডপে। বুকে নিয়ে আছে এই মণ্ডপটিও অপরূপ শিল্প-সম্ভার। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

একটি প্রাকার অতিক্রম করে আরও একটি ক্ষুদ্র গোপুরমের নীচে দিয়ে উপস্থিত হই সোনার-পদ্মের পুষ্করিণীর পাড়ে। বুকে নিয়ে আছে এই গোপুরমটিও অপরূপ কারুকার্য। রুদ্ধ হয় আমাদের গতি, স্তম্ভিত হই এই পুষ্করিণীর সৌন্দর্য দেখে। একটি আচ্ছাদিত তোরণে বেষ্টিত হয়ে আছে পুষ্করিণীটি। দেখে মুগ্ধ হই তার সুষমা। অনবদ্য গঠন এই তোরণের স্তম্ভগুলির, আর অনুপম তাদের অঙ্গের ভূষণ। তৈরী করেন শিল্পী এই স্তম্ভগুলি যুগ যুগ ধরে, মিশিয়ে দেন মনের সবখানি মাধুরী, ঢেলে দেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য। সৃষ্টি করেন এক সৌন্দর্যের নিকেতন, এক স্বপ্নপুরী, এক ইন্দ্রলোক। তার কাছে পরাজয় স্বীকার করে চিদাম্বরমের পার্বতীর মন্দিরের অলিন্দ, হার মানে জম্বুকেশ্বরের অপরূপ অলিন্দও। তাই এই তোরণ নিদর্শন দ্রাবিড়স্থপতির শ্রেষ্ঠ কীর্তির, প্রতীক এক গৌরবময় সৃষ্টির। অপরূপ দর্শন এই পুষ্করিণীটিও। হয় এক অনবদ্য সমন্বয় পুষ্করিণীতে আর তার চারপাশের তোরণেতে। সৃষ্টি হয় এক স্বর্গীয় পরিবেশ। আমরা বসে পড়ি সেই পুষ্করিণীর পাড়ে, বসে বসে দেখতে থাকি তার অনুপম রূপ। দেখে হয় না পরিতৃপ্তি, মেটে না আশ, দেখি স্তব্ধ হয়ে। সংবিৎ ফিরে পাই গাইডের ডাকে। ধীরে ধীরে প্রাকারের বাইরে আসি, নিবেদন করে আসি শ্রদ্ধার অঞ্জলি, ডালি উজাড় করে দিয়ে আসি।

অনেকগুলি প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে আমরা সভাপতির মন্দিরে উপস্থিত হই। ষোলটি অনবদ্য স্তম্ভে শোভিত হয়ে আছে মন্দিরটি। বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মাদুরার স্থপতির শিল্প-সম্ভারের। দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে।

সবশেষে দেখতে যাই সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপম্। নির্মাণ করেন এই মণ্ডপম্‌টি অরীয়নায়কম মুডালি, বিশ্বনাথ নায়কের মন্ত্রী ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে। অপরূপ স্তম্ভ বুকে নিয়ে আছে এই মণ্ডপটি। পরিণত হয়ে আছে এক স্বপ্নলোকে, এক ইন্দ্রপুরীতে। এক একটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে নির্মিত হয়েছে স্তম্ভগুলি। তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে কত অশ্ব, পৃষ্ঠে নিয়ে কত নর, কত নারী। কারও অঙ্গে শোভা পান দেব-দেবী, বিরাজ করেন কত বিভিন্ন মূর্তিতে আর বিচিত্র ভঙ্গিতে। গড়েন স্থপতি এই সব মূর্তি স্তম্ভের অঙ্গে, ঢেলে দিয়ে মনের সমস্ত মাধুরী, উজাড় করে দেন হৃদয়ের সবখানি ঐশ্বর্য। সৃষ্টি করেন এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ। প্রতীক চরম উৎকর্ষতার, এক গৌরবময় যুগের। এই সময়েই দ্রাবিড় স্থাপত্য, দ্রাবিড় ভাস্কর্য উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, লাভ করে চরম উৎকর্ষতা।

দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে শ্রদ্ধানিবেদন করি অরীয়নায়কম মুডালিকে। জানাই শিল্পীদেরও। অমর তাঁরা ইতিহাসের পাতায়। অমরত্ব লাভ করে মাদুরাও, অমর হয় ভারতবর্ষ, পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের শিল্পের দরবারে। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা আজও মনের মন্দিরে অম্লান হয়ে আছে।

২

পরের দিন সকালে উঠে চা ও জলযোগ সেরে, বসন্ত মণ্ডপম্ দেখতে যাই। খ্যাতিলাভ করে এই মণ্ডপম্ পেরুমল নায়কের চৌণ্ট্রী নামে, পরিচিত পুড়ু মণ্ডপম্ নামেও।

ঘুমিয়ে আছেন পেরুমল নায়ক, শ্রেষ্ঠ রাজা নায়ক বংশের, সোনার পালঙ্কে। তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়ান মন্দিরের দেবতা সুন্দরেশ্বর। অপরূপ তাঁর মূর্তি। বলেন দেবতা, "নির্মাণ কর রাজা একটি সভাগৃহ, রচনা কর একটি মণ্ডপ, যা হবে ঐশ্বর্যময়ী, অতুলনীয় হবে শিল্প-সম্ভারে। হবে আমার মর্যাদার

উপযুক্ত, যোগ্য হবে আমার মহিমারও। বাস করবো আমি সেই মণ্ডপে, প্রতি বছরে কাটাব দশদিন, যখন আসবে গ্রীষ্মঋতু, কষ্টদায়ক হবে মন্দিরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অবস্থান। আমি ত্যাগ করে আসবো মন্দির, মণ্ডপে বসেই রাজার পূজা গ্রহণ করবো। পূজা দেবে প্রজারাও, হবে মহা আড়ম্বর, সমারোহের হবে না কোন ত্রুটি।”

নিদ্রা ভাঙ্গে রাজার, ডাকেন পাত্র-মিত্রদের, সভাসদেরাও এসে হাজির হন। হয় পরামর্শ পরের দিন থেকেই সুরু হয় মণ্ডপের নির্মাণ। উইলসন সাহেবের মতে ঘটে এই ঘটনা ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে, পেরুমল নায়কের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে। লাগে দীর্ঘ বাইশ বছর, সম্পূর্ণ হয় মন্দির নির্মাণ ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে। ব্যয় হয় প্রায় এক মিলিয়ান ষ্টার্লিং। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে, নির্মাণ সুরু হয় এই মণ্ডপের ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে, শেষ হয় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে, লাগে এক লক্ষ পন বা দু'লক্ষ ষাট হাজার টাকা। শ্রেষ্ঠ কীর্তি পেরুমল নায়কের, সমসাময়িক এই মণ্ডপটি, রামেশ্বরমের মন্দিরের দরদালানের, নির্মাণ করেন রামনাদের সেতুপতি বংশের রাজা উদয়ন। অনুরূপ গঠনে আর শিল্প-সম্ভারে। উন্নত আর মহান্ সংস্করণ-চিদাম্বরমের পার্বতীর মন্দিরের, নির্মিত হয় দু'শ বছর আগে। কিন্তু সুশ্রী নয় পার্বতীর মন্দিরের মত, নয় তেমন রমণীয়ও।

সাজান স্থপতি এই মণ্ডপের সম্মুখভাগকে অপরূপ সাজে, ক্ষোদিত করেন কত সিংহ মূর্তি। তারা কত হস্তিকে পদদলিত করে। অশ্বপৃষ্ঠে বসে আছে একদল সৈন্য। দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে অনেকগুলি পদাতিক সৈন্য হাতে নিয়ে ঢাল। অশ্বের পা পদাতিকের হাতের ঢাল স্পর্শ করে। শিকার করে তারা কত ব্যাঘ্র। বিস্মিত হই দেখে।

মণ্ডপটির দালানের দৈর্ঘ্য ৩৩৩ ফিট, প্রস্থ ১০৫ ফিট। প্রান্তদেশে একটি মন্দির। মন্দিরকে তিনটি গলিপথ বেষ্টন করে আছে। রামেশ্বরমের দর-দালানে আছে একটিমাত্র গলিপথ। রচিত হয় একটি অলিন্দ, অপরূপ স্তম্ভ দিয়ে শোভিত সেই অলিন্দটি। চার সারিতে দাঁড়িয়ে আছে এই স্তম্ভগুলি। বিভিন্ন প্রতিটি স্তম্ভের গঠন, বিভিন্ন তাদের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প সম্ভার। তাদের বুকে আর চূড়ায় শোভা পায় অনবদ্য, সূক্ষ্মতম আর বিস্তৃত ভাস্কর্যের নিদর্শন, নিদর্শন এক মহিমময় এক গৌরবময় সৃষ্টির, প্রতীক চরম

উৎকর্ষতার। কঠিন স্ফটিক পাথর কেটে নির্মিত হয় মন্দিরটি ও তার স্তম্ভগুলি। অনবদ্য কেন্দ্রস্থলের সারির স্তম্ভগুলি, অনুপম শিল্প-সম্ভারে আর মহিমময় পরিকল্পনায়। আছে প্রতিটি স্তম্ভের অঙ্গে একটি করে, প্রমাণ আকৃতির প্রতিমূর্তি। যেমন তাদের গঠন সৌষ্ঠব, তেমনই প্রাণবন্ত তারা। আরও সূক্ষ্মতম আরও সুদূরপ্রসারী তাদের অঙ্গের শিল্প-সম্ভার। পরিচয় দেয় শ্রেষ্ঠ শিল্পজ্ঞানের। সৃষ্টি করে এক সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, এক নন্দনকানন, এক স্বপ্নলোক, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, স্তব্ধ হয়ে দেখি। মনে মনে বরণ করি এই মহিমময় সুন্দরকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করি পেরুমল নায়ককে, আর অমর শিল্পীদের, অমর আজ মাদুরা ইতিহাসের পাতায়, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ভারতের স্থাপত্য শিল্প বিশ্বের দরবারে। তাই আজ আসে দলে দলে, আসে দেশ-বিদেশ থেকে যাত্রী, দিয়ে যায় শ্রদ্ধার অঞ্জলি, ডালি উজাড় করে দিয়ে যায়। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা উজ্জ্বল হয়ে থাকে জাগরণে, শয়নে আর স্বপনে।

বসন্ত মণ্ডপের বিপরীত দিকেই দাঁড়িয়ে আছে এক অতিকায় গোপুরম। পরিচিত রায় গোপুরম নামে।

পেরুমল নায়কই এই গোপুরমটির নির্মাণ সুরু করেন। দুর্ভাগ্য ভারতের, মৃত্যু হয় অন্তরায়, সুযোগ হয় না গোপুরমটিকে সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া, রয়ে যায় অসম্পূর্ণ অবস্থায়। হত যদি সম্পূর্ণ রচিত, হত এই গোপুরমটি ভারতের বিশালতম আর প্রকৃষ্টতম গোপুরম। পরাজয় স্বীকার করতে হত শ্রীরঙ্গমের অসমাপ্ত গোপুরমদেরও।

অঙ্গে নিয়ে আছে এই গোপুরমটি সূক্ষ্মতম লতাপাতা আর ফুল, ভূষিত হয়ে আছে অনবদ্য আর সুন্দরতম শিল্প-সম্ভারে। প্রতীক এক গৌরবময় যুগের, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

আর একবার পেরুমল নায়ক ও শিল্পীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। তারপর টাঙায় চড়ে ধর্মশালায় ফিরে আসি।

ভোরের ট্রেনে ধনুষ্কোটি অভিমুখে রওনা হই।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

## রামেশ্বরম্ঃ রামলিঙ্গেশ্বরমের মন্দির

ট্রেন অতিক্রম করে মাদুরা ষ্টেশন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি ছবি, চিত্র এক পুরাকাহিনীর। "দুই ভাই রাম আর লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন সমুদ্রের এপারে, হাতে নিয়ে ধনুর্বাণ। লুটিয়ে পড়েছে তাঁদের পায়ের উপর সমুদ্র। পাথরের টুক্‌রো মাথায় নিয়ে অসংখ্য বানরসেনা নিযুক্ত আছে সমুদ্রবন্ধনের কাজে। নির্মাণ করছে একটি সেতু। ওপারে উৎসবে মুখরিত স্বর্ণলঙ্কা। প্রতি ঘরে জ্বলছে আলো, চলেছে আনন্দের উৎসব। তার ধ্বনি প্রকম্পিত হয়েছে সারা লঙ্কার আকাশে, বাতাসে। জ্বলে নাই আলো শুধু অশোক কাননে। নাই সেখানে কোন উৎসবের আয়োজন। নিভৃতে একাকিনী অন্ধকারে বসে আছেন সীতাদেবী। চোখের জলে প্লাবিত হচ্ছে তাঁর বুক। তিনি প্রিয়তমের আগমনের প্রতীক্ষা করছেন, কবে আসবেন শ্রীরামচন্দ্র, উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন তাঁকে দুরাত্মা রাবণের কবল থেকে।"

রামনাদ জেলায় পামবাম দ্বীপে ধনুষ্কোটি আর রামেশ্বরম্ অবস্থিত। অনেকগুলি ছোট বড় ষ্টেশন অতিক্রম করে আমাদের ট্রেন রামনাদে এসে পৌঁছায়। এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে পামবাম ষ্টেশন। সেখান থেকে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ষোল মাইল গেলে ধনুষ্কোটি, উত্তর-পূর্বে সাত মাইল দূরে রামেশ্বরম্।

রামনাদ ষ্টেশন ছেড়ে কিছুদূর আসবার পরই আমাদের ট্রেন চলতে থাকে একটি সেতুর উপর দিয়ে। দেখি দক্ষিণে, বামে, সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধুই জল। মাঝে মাঝে পাথরের স্তূপ, কোথাও জলের উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা জলের নীচে। আমার স্ত্রী বলেন, "এইটিই সেতুবন্ধের সেতু, আমরা চলেছি সমুদ্রের উপর দিয়ে—" সমর্থন করেন এক সহযাত্রীও। বলেন, "এইখানেই ছিল সেতুবন্ধের সেতু, তার উপর ইংরাজ নির্মাণ করেছে এই পুল।"

গাড়ি এসে পামবাম ষ্টেশনে থামে, আমাদেরও ভুল ভাঙে। সমুদ্র নয়,

—আমরা অতিক্রম করি একটি "ব্যাক্ ওয়াটার" বা খাড়ি। পূর্ব উপকূলের বৈশিষ্ট্য এই খাড়ি। সমুদ্রের জল এসে ভিতরে প্রবেশ করে, তারপর সমান্তরালে প্রবাহিত হতে থাকে, সৃষ্টি হয় খাড়ির। দূর থেকে দেখে মনে হয় সমুদ্রই বুঝি। এই খাড়ির বুকের উপর দিয়ে যাতায়াত করে বড় বড় নৌকা, যায় ষ্টীমারও, বয়ে নিয়ে পণ্য, দক্ষিণ ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

বেলা বারোটায় আমাদের ট্রেন ধনুষ্কোটি ষ্টেশনে এসে থামে। গাড়ি থেকে নেমে ষ্টেশনে জিনিসপত্র রেখে, আমরা সঙ্গমস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হই, যেতে হয় পদব্রজে, খালি পায়ে। প্রায় দু'মাইল পরিধি নিয়ে একটি ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়েছে। তার দু'পাশ দিয়ে গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে বঙ্গোপসাগর, বিন্দুতে এসে মিশেছে। নাই সেখানে কোন উদ্দামতা সাগরের, আছে প্রশান্ত আর সৌম্য মূর্তিতে। এই ত্রিভুজেরই আর এক বিন্দুতে, ধনুষ্কোটি পিয়ার, দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একখানি জাহাজ, যাচ্ছে সিংহলে। যেতে হয় এখান থেকেই।

সহজ নয় বালির উপর দিয়ে পথ চলা, তাই আমাদের যেতে হয় একেবারে তটের উপর দিয়ে। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তরই সমুদ্রের বুক থেকে ছুটে আসে এক বিপুল তরঙ্গ, প্লাবিত করে তটভূমি, ভিজে যায় আমাদের সর্বাঙ্গ, ব্যহত হয় গতি। শেষে অতিকষ্টে সঙ্গমস্থলে উপনীত হই।

দূরে, সাগরের বুকে, একটি সেতুর মত দেখা যায়, ঐ সেতুই নাকি বানরেরা তৈরী করেছিল, আর, ঐ সেতুর উপর দিয়েই নাকি শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্র অতিক্রম করে লঙ্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন। রাবণকে হত্যা করে সীতাদেবীকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। তাই বুঝি সমুদ্র এখানে এত প্রশান্ত, জগৎবাসীকে বলছে, "এখানে কি আমি ক্ষুব্ধ হতে পারি, এই কূলেই আমি শ্রীরামচন্দ্রের পদধূলি লাভ করে, ধন্য হয়েছি, হয়েছি পরম পবিত্র।" তাই আজ সেতুবন্ধ মহা-তীর্থের অন্যতম।

আমরা কিছুক্ষণ সমুদ্রের তীরে বসে থাকি। ওপারেই স্বর্ণলঙ্কা ভেসে ওঠে, একে একে মনের পর্দায় কত ছবি, চিত্র কত পুরা কাহিনীর। তারপর স্নান করে, পূজা দিয়ে ষ্টেশনে ফিরে আসি। মিনিট পাঁচেক পরেই গাড়ি ছাড়ে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের ট্রেন রামেশ্বরম্ ষ্টেশনে এসে পৌঁছায়। একটি টাঙায় চড়ে মন্দিরের দরজায় উপস্থিত হই। থাকবার ব্যবস্থা হয় একটি 'রেষ্ট হাউসে', দাঁড়িয়ে আছে রেষ্ট হাউসটি মন্দিরের পশ্চিম গোপুরমের একেবারে গায়ে। আছে এখানে খান তিনেক ঘর, একটি রান্নার জায়গা আর বারান্দা। বারান্দা থেকে দেখা যায় বঙ্গোপসাগর, দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, মিশেছে নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, চায়ের পর্ব শেষ করে মন্দির দর্শনে বেরিয়ে পড়ি। মন্দিরের সামনে গিয়ে আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাই। যেমন উঁচু গোপুরম্, তেমনই বিরাট মন্দির, একেবারে কল্পনার অতীত। পদতলে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলে বঙ্গোপসাগর ঝাঁপিয়ে পড়ছে কূলে, ছুটে আসছে অন্ধ আবেগে, অবিরাম গতিতে, আসছে শ্রীরামচন্দ্রের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়বার জন্য, যেমন পড়েছিল ত্রেতাযুগে। কিন্তু সহ্য হল না কলির মানবের, সেতুপতি বংশের রাজাদের। তারা নির্মাণ করলো একটি মন্দির, প্রতিষ্ঠা করলো দেবতাকে সেই মন্দিরে। তারপর মন্দিরকে বেষ্টন করে রচিত হল এক প্রাচীর, যেমন উঁচু, তেমনই দুর্ভেদ্য। সুরক্ষিত হল প্রবেশদ্বারও এক সুমহান গোপুরম্ দিয়ে। দাঁড়িয়ে রইল মুখোমুখি হয়ে এক বিশাল মহিমময় মন্দির আর অসীম, অন্তহীন সমুদ্র। মাথা কুটতে লাগলো সমুদ্র বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, যদি পায় একটুখানি পায়ের পরশ, ধন্য হবে জীবন।

শুনি সীতাদেবীকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরবার পথে শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ তর্পণ করবার জন্য প্রথমে এই সমুদ্রের তীরে এসেই পুষ্পক রথ থেকে নামেন। কিন্তু মেলে না চাল, চালের অভাবে বালি দিয়েই বানান পিণ্ড। সমুদ্রের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেন সেই পিণ্ড, পিতা দশরথ। তার স্মৃতি বুকে নিয়ে আছে এখানকার সমুদ্র তীরের বালি, ধরে আছে চালের আকার।

বাসনা জাগে মনে সীতাদেবীরও শিবপূজা করবার। শোনামাত্র ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমান ছোটেন বারানসীতে, বিশ্বনাথকে আনতে যান। কিন্তু আসেন না বিশ্বনাথ, আনতে হয় অন্য শিব, তাই তার ফিরতে বিলম্ব হয়। এ দিকে সীতাদেবীর ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে। রামচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে তিনিও সমুদ্রের বালি দিয়েই গড়েন এক শিব লিঙ্গ। তাঁকে ভক্তি ভরে পূজা করেন।

প্রতিষ্ঠা করেন সেই শিবকে এই সমুদ্রের তীরে, রামলিঙ্গেশ্বরম্ নামে পরিচিত হন সেই শিব। প্রতিষ্ঠা করেন এক দেবীকেও, পরিচিতা সেই দেবী পর্বত বর্ধিণী নামে।

এমন সময় হনুমানও বারাণসী থেকে শিব নিয়ে ফিরে আসেন। ক্ষুব্ধ হন তিনি সীতাদেবীর আচরণে, হন ক্রোধে উন্মত্ত। প্রতিষ্ঠা করেন সীতাদেবী তাঁর আনিত শিবকেও, প্রশমিত হয় ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমানের ক্রোধ, হন সন্তুষ্টও। প্রতিষ্ঠিত হন এক দেবীও। কাশী থেকে নিয়ে আসা হয়, তাই বিশ্বনাথ স্বামীন নামে খ্যাত এই শিব লিঙ্গটি। বিশালাক্ষী নামে খ্যাতি লাভ করেন দেবীও। যাত্রীদের আগে বিশ্বনাথ স্বামীন্ আর বিশালাক্ষীকে পূজা দিয়ে পরে রামলিঙ্গেশ্বরম আর পর্বত বর্ধিণীকে পূজা দিতে হয়। বজায় থাকে ভক্তের অভিমান, প্রমাণিত হয় ভক্তই শ্রেষ্ঠ এ জগতে। পূজিত হন এই মন্দিরে ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমানও, বিরাজ করেন এক মহিমময় মূর্তিতে। পরিচিত হয় এই স্থান রামেশ্বরম নামে, পরিণত হয় মহাতীর্থে।

মন্দিরের ভিতরের শিলালিপি থেকে জানা যায় কঠিন চুনের পাথরের তৈরী রামলিঙ্গেশ্বরমের লিঙ্গ ও দেবী আর গোপুরমটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়, নির্মাণ করেন সেতুপতি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা উদয়ন। সিংহলের রাজা পররাজ শেখর তাঁকে সাহায্য করেন। ত্রিকোন মালাইতে তৈরী হয় নতুন পদ্ধতির পাথর। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে সেতুপতি বংশের অন্য রাজারা নির্মাণ করেন মন্দিরের বাকী অংশ, লাগে একশ সত্তর বছর। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রঘুনাথ তিরুমালাই, বিজয় রঘুনাথ তেবাঁর, আর মণ্ডরামলিঙ্গ তেবার। আছে এই মন্দিরে তাঁদের প্রস্তরে নিমিত প্রতিমূর্তি। এই সময়েই তাঁরা বিভিন্ন শিল্প-সম্ভারে সাজান এই মন্দিরকে। সমৃদ্ধিশালী হয় মন্দির। সমৃদ্ধিশালী হন রামনাদের সেতুপতি বংশের রাজারা, উপনীত হন উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। উপনীত হয় দ্রাবিড় স্থাপত্যশিল্পও এক গৌরবময় যুগে, রেখে যায় ভারতের বুকে শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম নিদর্শন। শোভা পায় অনুরূপ অপরূপ মন্দিরে, মাদুরা আব শ্রীরঙ্গম, নির্মাণ করেন নায়ক শ্রেষ্ঠ তিরুমল নায়ক।

দুইটি বৃহৎ প্রাঙ্গণে বেষ্টন করে আছে মন্দিরটিকে, বেষ্টিত হয়ে আছে সমস্ত মন্দিরটি একটি কুড়ি ফিট উঁচু দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়েও। রচিত হয়েছে

মন্দিরের তৃতীয় প্রাকার। তিন প্রবেশ পথে শোভা পায় তিনটি গোপুরম, অঙ্গে নিয়ে আছে গোপুরমগুলি সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার।

উত্তীর্ণ হয় সন্ধ্যা। রাত্রির অন্ধকার ছেয়ে ফেলে দিগন্ত। আমরাও 'রেষ্ট হাউসে' ফিরে আসি। দেখি ইতি মধ্যেই সেখানে সমাগত হয়েছেন জনকতক পাণ্ডা। তাঁরা সৌজন্যের প্রতিমূর্তি, বিনয়ের অবতার, তাঁদের একমাত্র কামনা কিসে হবে আমাদের মঙ্গল, বাসনা অন্তরতম প্রদেশের। বলবামাত্র তাঁরা আমাদের ব্যবহারের জন্য কিছু রান্নার বাসন আর দু'টি হ্যারিকেন লণ্ঠন তাঁদের বাসা থেকে নিয়ে আসেন।

তারপর সুরু হয় রামেশ্বরমের মহিমা কীর্তন, বলেন, "পাঁচশ টাকা দিলেই হবে নাকি আমাদের অক্ষয় স্বর্গলাভ।" সমস্তই তাঁরা করবেন, আমরা শুধু টাকা দিয়েই খালাস। যত বলি, নই আমরা পুণ্য লোভাতুর, বাসনা নাই অক্ষয় স্বর্গ লাভের। এসেছি মন্দির দর্শনে, মন্দির দর্শন করে ফিরে যাব দেশে, ততই তাঁদের জিদ্ বাড়ে। বলেন, "পতিত হবেন তাঁরা ; হবেন পাণ্ডার ধর্মচ্যুত যদি আমরা মোক্ষলাভের ব্যবস্থা না করেই দেশে ফিরে যাই।" শেষে কমতে থাকে স্বর্গলাভের দর্শনীর হারও। এক ঘণ্টার দরাদরির পর পাঁচশ থেকে নেমে আসে পঁচিশে। কিন্তু তাতেও আমরা সম্মত হই না, ভাঙে না আমাদের পণ। তখন তাঁদের চীৎকারে আর তিরস্কারে মুখর হয়ে উঠে চতুর্দিক। শেষে সত্যিই প্রস্থান করেন তাঁরা। যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে যান, যা কিছু আমাদের দিয়েছিলেন। কসুর করেন না শাসিয়ে যেতেও।

আমরা কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বসে থাকি, পরিসীমা থাকে না আমার স্ত্রীর আতঙ্কেরও। রাজী নন তিনি এই গুণ্ডার দেশে এক মুহূর্তও কাটাতে। বলেন, "দেবদর্শনের চাইতে প্রাণ বড়, প্রাণের চাইতে সম্মান।" শেষে অনেক বোঝানোর পর শান্ত হন তিনি। আমরাও তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে, খিল এঁটে দিয়ে শয্যায় শুয়ে পড়ি। নির্বিঘ্নেই কেটে যায় রাত্রি, দর্শন মেলে না হানাদারদের।

ভোরে উঠে গৃহিণীকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে স্নান করে 'টিকিট' ও কয়েক প্রস্থ পূজার উপকরণ কিনে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি। পূজা দেই একে একে বিশ্বনাথ ও বিশালাক্ষীকে আর রামেশ্বরম্ ও পর্বত বর্ধিণীকে। দেখতে যাই

গন্ধমাদনেশ্বরের মন্দির। এইটিই এখানকার প্রাচীনতম মন্দির, দাঁড়িয়ে আছে বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি উদ্যানের মধ্যে এক মহিমময় মূর্তিতে। খুব সম্ভব একাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়।

অবশেষে আমরা দরদালান দেখতে যাই। দেখেছি অনুরূপ দরদালান বা অলিন্দ মাদুরায় বসন্ত মণ্ডপমেও। কিন্তু কি বিশালতায়, কি অঙ্গের শিল্প-সম্ভারে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান পায় এই অলিন্দটি। দৈর্ঘ্যে চারহাজার ফিট, অর্ধচন্দ্রাকারে মূল মন্দিরকে বেষ্টন করে আছে এই দরদালানটি, মিশেছে এসে একটি অপরূপ মঞ্চে। সাজিয়েছেন স্থপতি এই দরদালানকে অনবদ্য স্তম্ভ দিয়ে, শোভিত করেছেন মঞ্চটিকেও, যেমন তাদের গঠন সৌষ্ঠব, তেমনই তাদের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প সম্পদ। যেমন মহিমময় পরিকল্পনা, তেমনই অনবদ্য রূপদান। কোনটি দাঁড়িয়ে আছে কেশর যুক্ত সিংহের মস্তকের উপর, কোনটি হাতির। অঙ্গে শোভা পাচ্ছে কত বিচিত্র সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম লতা, পাতা আর ফুল। তাদের মাঝে মাঝে বিরাজ করেন কত দেব-দেবী, অপরূপ তাঁদের গঠন ভঙ্গিমা, জীবন্ত প্রতিমূর্তি তাঁরা। অঙ্কিত হয়েছে আবক্ষ প্রতিমূর্তি, সেতু পতি বংশের রাজাদেরও। মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেছেন স্থপতি ভারতের মহাতীর্থে এক ইন্দ্রপুরী। দিয়েছেন স্থাপত্য জ্ঞানের শেষ আর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। রেখে গিয়েছেন এক মহাগৌরবময় সৃষ্টির প্রতীক। তাই অমর আজ রামেশ্বরম্, অমর ভারতবর্ষ, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের দরবারে। অমর সেতুপতি বংশের রাজারা আর শিল্পীরাও।

মনে মনে বরণ করি এই মহিমময় সুন্দরকে। প্রণাম জানাই শ্রীরামচন্দ্র আর সীতাদেবীকে, সঙ্গে করে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মন্দিরে চিররাত্রি চিরদিন।

মন্দির দেখা শেষ করে আমরা টাঙায় চড়ে রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, ও সীতাকুণ্ড দেখতে যাই। আছে এইসব কুণ্ডতে একটি করে পুষ্করিণী. আছে তাতে সোপানের শ্রেণী ও একটি ছোট মন্দির। সেই মন্দিরে দেবতা বিরাজ করেন। আমরা একে একে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে পূজা দিয়ে রেষ্ট হাউসে ফিরে আসি।

তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে জিনিসপত্র গুছিয়ে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হই। তখনও গাড়ি ছাডবার ঘণ্টাদেড়েক দেরী। কিন্তু অকারণে আমার স্ত্রী এই গুণ্ডার দেশে একমুহূর্তও থাকতে রাজী নন। তখনও তিনি আতঙ্কের হাত থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করতে পারেন নাই।

শেষে নিরাপদেই উঠে পড়ি গাড়িতে, গাড়িও ছাড়ে। আমরা পামবামে এই ট্রেন থেকে নেমে কইম্বাটুর এক্সপ্রেসে চড়ে বসি। ভোর পাঁচটায় কৈম্বাটুরে গিয়ে উপনীত হই। জিনিসপত্র নিয়ে স্থান সংগ্রহ করি একটি পান্থনিবাসে।

বাজার থেকে ফিরে এসে দেখি আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন আমার এক বন্ধু। তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনে, বোম্বাইতে আমার প্রতি-বেশী ছিলেন, আমরা দীর্ঘ দু'বছর সেখানে একত্রে কাটিয়েছি। সম্প্রতি তিনি কৈম্বাটুরে বদলি হয়েছেন, সঙ্গে আছেন তাঁর স্ত্রীও আর ওখানকার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক-এর ম্যানেজার। তিনিও বাঙালী। অতিকষ্টে তাঁদের বাড়িতে চা খাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের বিদায় করি।

তাড়াতাড়ি সেখানকার কাজ শেষ করে বেলা পাঁচটায় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে উপস্থিত হই। সেখানে সমাগত হয়েছেন আরও একজন বাঙালী মহিলা। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত তাঁর স্বামীও। গল্পগুজবে চায়ের পর্ব শেষ হয়। কিন্তু ছুটী মেলে না আমাদের, নিষ্কৃতি পাই না বন্ধু ও বান্ধবীর হাত থেকে। রাত্রির আহারও বন্ধুর বাড়িতে সমাপন করতে হয়। ফিরবার পথে তাঁর বাড়িতে উঠবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাত্রি এগারটায় রেষ্ট হাউসে ফিরে আসি। এগিয়ে দিতে আসেন বন্ধুও। রাত্রি বারোটায় বাসায় ফিরে যান।

ভোরের ট্রেনেই আমরা কালিকাট অভিমুখে রওনা হই।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### কালিকাট ঃ

আমরা চলেছি মালাবারের ভিতর দিয়ে। এখানকার ভাষা মালায়ালাম। প্রচলিত আছে আরও তিনটি ভাষা দক্ষিণ ভারতে। অন্ধ্রে তেলেগু, তামিলনাদে তামিল, আর মহীশূরে ক্যানেরিজ্। মাঙ্গালোর এক্সপ্রেস যাচ্ছে এঁকে বেঁকে, নীলগিরি পর্বতমালার ভিতর দিয়ে, সবুজ বনানী আর পাহাড়ের শ্রেণীকে কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে রেখে। এই নীলগিরির শীর্ষদেশেই আছে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শৈল নিবাস, উটাকামণ্ড বা উটি, দাঁড়িয়ে আছে সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে। এই স্থানই পালঘাট নামে খ্যাত। এইখানেই এক পাহাড়ের চূড়ায় আছে অগস্ত্য মুনির আশ্রম। তাঁর তপঃপ্রভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল বিন্ধ্য পর্বতকেও, মাথা নীচু করে পথ করে দিতে হয়েছিল তাঁকে—যেতে দিতে হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। দিতে হয়েছিল উত্তর আর দক্ষিণের সংযোগ স্থাপন করবার জন্য। কথা দিতে হয়েছিল যতক্ষণ ঋষি ফিরে না আসেন, ততক্ষণ মাথা উঁচু করতে পারবেন না পর্বত-প্রধান। ঋষিও ফিরলেন না, বিন্ধ্যরও উঁচু মাথা নীচুই রয়ে গেল। সুগম হয়ে রইল উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার পথ। ক্রমে, সেই পথ দিয়ে উত্তরের আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবেশ করলো দক্ষিণে, দ্রাবিড় স্থানে। সমৃদ্ধিশালী হল দক্ষিণ ভারত সভ্যতায় ও কৃষ্টিতে। উত্তর ভারত পেল জগতগুরু শঙ্করাচার্য, পেল তাঁর অসামান্য প্রতিভা, শিক্ষা আর বাণী। রক্ষা পেল হিন্দুধর্ম বৌদ্ধের কবল থেকে। পেল আচার্য শ্রেষ্ঠ রামানুজকে। ধন্য হল উত্তর। মিলন হল দক্ষিণে, উত্তরে। দ্রাবিড়ে, আর্যে।

আজ পালঘাট সারা দক্ষিণ ভারতকে সরবরাহ করে কাঠ। দক্ষিণে আর কোথাও এমন সুন্দর আর শক্ত কাঠ নাই। পাহাড়ের গা ছুঁয়ে প্রবাহিত হয় অনেক প্রশস্ত খাড়ি বা ব্যাক ওয়াটার, আর বেগবতী স্রোতস্বিনী। কাঠ কেটে, পাহাড় থেকে নামিয়ে এনে, চালান দেওয়া হয় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, এই নদী আর খাড়ি দিয়ে। যায় বড় বড় নৌকা বোঝাই হয়ে।

ওড্যালকোট ষ্টেশনে নীলগিরি পর্বতমালা সামনে এসে পথ জুড়ে দাঁড়ায়। মনে হয় এইখানেই হবে বুঝি যাত্রার শেষ। সম্মুখে সুউচ্চ পাহাড় ছ'পাশে সবুজ বৃক্ষ শ্রেণী সৃষ্টি করে এক অতি রমণীয় পরিবেশ। বড় ভাল লাগে দেখতে। গাড়ি ছাড়তেই বদলে যায় রাস্তার রূপ। নীলগিরির পর্বতমালা পশ্চাতে রেখে আমরা এগিয়ে চলি সমুদ্রের দিকে। রাস্তার ছ'পাশেই বড় বড় নদী আর খাড়ি এত প্রশস্ত, দেখে মনে হয় সমুদ্রই বুঝি। মনে হয় খুব কাছেই আছে সমুদ্র। কিছুক্ষণ পরে গাড়ি এসে থামে সেরোনূরে। এইখান থেকেই গাড়ি বদল করে যেতে হয় কোচিনে। গাড়ি এসে দাঁড়ায় একটি সেতুর ওপর, নীচে দিয়ে বয়ে যায় একটি বেগবতী স্রোতস্বতী, বুকে নিয়ে অসংখ্য মাছের নৌকা, এসেছে তারা মাছ চালান দিতে। সেতুর পাশ দিয়ে নেমে গিয়েছে একটি সিঁড়ি, মিশেছে গিয়ে নদীর বুকে। মাছের টুকরি মাথায় নিয়ে জেলেরা একে একে উঠে আসে সেতুর উপর, মাছ দিয়ে ভরতি করে ওয়াগন। সুন্দর সে দৃশ্য।

আমরা যাই ম্যাঙ্গালোরের পথে। এবারে আমাদের বাঁ দিকে দেখা যায় এক একটি বিশাল-কায়া খাড়ি, তাদের বুকের উপর দিয়ে চলে কত রকমের নৌকা, বয়ে নিয়ে যায় পণ্য, নিয়ে যায় কাঠ। মাঝে মাঝে দেখা যায় সমুদ্রও, কখনও দূরে, কখনও অতি নিকটে, অপরূপ সে দৃশ্য।

বেলা বারোটায় আমরা কালিকাটে নামি। গাড়ি চলে যায় ম্যাঙ্গালোরে, আরও ছিয়াত্তর মাইল দূরে, সেইখানেই পরিসমাপ্তি এই লাইনের।

স্বাধীনতা লাভের পর, কালিকাট পরিবর্তিত হয়েছে কোজিকোটে, যেমন হয়েছে ভিজাগাপট্টম বিশাখাপত্তনমে, ত্রিচিনোপল্লী তিরুচুরাপল্লীতে, আর টিনাভ্যালি তিরুন্যাল ভ্যালিতে।

এই সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কালিকাট! বন্দর শ্রেষ্ঠ কালিকাট। দক্ষিণে মামাল্লাপুরম (মহাবলীপুরম)-এর পরেই ছিল এর স্থান। বাস করতেন এখানে কত শ্রেষ্ঠী, কত ধনী। তাঁদের নৌকা বহন করে নিয়ে যেত ভারতের পণ্য সম্ভার, এই বন্দর থেকে সুদূর পশ্চিমে। সঙ্গে করে নিয়ে যেত ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টি। ফিরে আসতো নিয়ে রূপা, সোনা, হীরে, জহরৎ নিয়ে আসতো নৌকা বোঝাই করে। তেমনই সমাগত হত এখানে নানা দেশের

নানা লোক, বিচিত্র তাদের পণ্য সম্ভার, বিভিন্ন তাদের ভাষা। বিনিময় হত পণ্যে পণ্যে, পণ্যে স্বর্ণে। মুখরিত হয়ে থাকতো এর সমুদ্র তীর, মুখর হত এর পথ ঘাট, অট্টালিকা আর রাজপ্রাসাদ, নানা ভাষায় আর আনন্দের কোলাহলে।.

এলো সপ্তদশ শতাব্দী, মহাশক্তিশালী হল আরব আফ্রিকা মহাদেশে। বন্ধ হয়ে গেল যাতায়াত ভারতে পশ্চিমে। বন্ধ হল সহজ বাণিজ্য। মুনাফা চায় আরব। তাদের চাহিদা মিটিয়ে অবশিষ্ট যা থাকে, তাতে লাভের অংশ যায় অনেক কমে। সহ্য হয় না পশ্চিম দেশের লোকেদের। উপায় খুঁজতে থাকে। কোথায় পাবে দ্বিতীয় রাস্তা, বাধা দিতে পারবে না যেখানে আরব। সহজ হবে যাতায়াত। বেড়ে যাবে লাভের অঙ্ক। পর্তুগাল হল অগ্রণী। তাদের রাজা দিলেন অসংখ্য টাকা। নির্মাণ করা হল জাহাজ, ভরা হল নাবিকে, খাদ্যে আর পানীয়ে। এগিয়ে এলেন কলোম্বাস, দুঃসাহসী, কিন্তু বুদ্ধিমান্। একটা বড় কিছু করবেন এই ছিল তাঁর মনের একান্ত অভিলাষ, বাসনা অন্তরতম প্রদেশের। তিনিই হলেন পুরোধা। বহু কষ্টে, অনেক রকমের বিপদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আবিষ্কার করলেন এক দেশ। ভাবলেন ভারতবর্ষই নিশ্চয়। কিন্তু সে ভারতবর্ষ নয়, তাই নাম রাখা হল New India. নতুন ভারতবর্ষ। তাঁর কৃতকার্যতায় সাহস বেড়ে গেল পশ্চিম দেশের লোকদের। যত ছিল দুঃসাহসী, ছুটে এলো রাজার কাছে। যাবে ভারতবর্ষ আবিষ্কারে, যাবে নতুন পথের সন্ধানে। রাজারও বাড়লো লোভ। নতুন দেশ আবিষ্কার, নতুন সম্পত্তি, নতুন উপনিবেশ, নতুন বাণিজ্য। মুক্ত হস্তে খরচ করতে লাগলেন অর্থ। নির্মিত হল কত জাহাজ, সংগ্রহ করা হল কত নাবিক, কত দুঃসাহসী অধিনায়ক। তারা জাহাজ নিয়ে ছুটলো সমুদ্রের বুকে, পাড়ি দিল অজানার পথে।

এদেরই মধ্যে ছিলেন Vas-co-da-gama, ভাস্কো-ডা-গামা, এক পর্তুগীজ নাবিক। তিনিই সাহসে বুক ভরে নিয়ে ভীষণ, ভয়াল, তরঙ্গসঙ্কুল উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে প্রথমে এসে পৌছলেন এই মহাভারতের সাগরতীরে। নামলেন এসে কালিকাটে, জামরীনের রাজধানীতে। সেদিন ছিল সাতাশে মে, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ। আবিষ্কার হল ভারতের বাণিজ্য পথ পশ্চিমের সঙ্গে। মিলন হল

পর্তুগীজে ভারতবাসীতে, পশ্চিমে পূরবে। জন্ম নিল সভ্য জগতের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী এক সম্ভাবনা। অমর হয়ে রইল এই তারিখটি ইতিহাসের পাতায়, সেই সঙ্গে অমর হলেন ভাস্কো-ডা-গামা আর জামরীন। কালিকাট ফিরে পেল তার হৃতগৌরব। তার বন্দর হল দ্বিগুণ মুখর, দেশ বিদেশের কত বিচিত্র নৌকায় আর জাহাজে ভরে গেল সাগরের বুক। বিভিন্ন দেশের লোকের ভীড়ে সাগরতীরে সহজ চলা-ফেরা হয়ে উঠলো কঠিন। বিভিন্ন ভাষার কোলাহলে পরিপূর্ণ হল দিগন্ত। আলোয় আলোকিত হল সমুদ্র-সৈকত। গড়ে উঠলো একে একে শহরের বুকে কত প্রাসাদ, কত অট্টালিকা, রচিত হল রাস্তার পাশে পাশে কত ফুল ভরতি উদ্যান।

গাড়িতে বসে বসে স্বপ্ন দেখছিলাম। মনের মণিকোঠায় ভেসে উঠেছিল ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের স্মরণীয় দিনটির কথা, চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল একটি ছবি, সে চিত্র কালিকাটের পূর্ব গৌরবের। ভাবছিলাম কিছুই কি নাই অবশিষ্ট! নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা স্মরণ করিয়ে দেবে সমৃদ্ধিশালী কালিকটের কথা, জানিয়ে দেবে, সে ছিল একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা নগরীর অন্যতমা, ছিল এক স্বপনপুরী। এক রূঢ় বাস্তবের ধাক্কায় স্বপ্ন যায় টুটে। সম্ভব হতে পারে কি ইতিহাসে এতবড় পরিবর্তন? এমন করে সর্বস্ব হারিয়ে, এমন দৈন্যমূর্তি নিয়ে কেমন করে দাঁড়িয়ে আছে কালিকাট বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ পৃথিবীর বুকের ওপর? বন্দর আছে, নাই একখানিও জাহাজ। রাস্তা অপরিষ্কার, দুপাশের বাড়িগুলি ক্ষুদ্র আর জরাজীর্ণ, নাই কোন চিহ্ন প্রাসাদের বেশিরভাগ বাড়িরই খড়ের চাল, লাল মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। তাদের দেওয়াল। তার ওপর, বিষাক্ত তার জল।

ব্যথায় ভরে যায় বুক। মনে হয় যত শীঘ্র এখান হতে চলে যেতে পারি ততই মঙ্গল। একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়ে সমুদ্র তীর, শহর আর বাজার ঘুরে উপস্থিত হই ষ্টেশনে। তিনটের গাড়ি ধরে যাত্রা করি কোচিনে।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## কালাদি ঃ শঙ্করাচার্যের মন্দির

কালিকাট থেকে রওনা হয়ে সেরোনূরে এসে যখন গাড়ি থেকে নামি, তখনও সন্ধ্যা হতে অনেক দেরী। কোচিনের গাড়িও ছাড়বে ঘণ্টাখানেক পরে। জিনিসপত্র গাড়িতে উঠিয়ে পিওনের জিম্মায় রেখে চা পান করতে যাই। তারপর, ঘুরতে থাকি প্লাটফর্মে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য। দাঁড়িয়ে আছে ষ্টেশনটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, হয়ে আছে সৌন্দর্যের লীলাভূমি। চতুর্দিকে ঘিরে আছে বিশাল ব্যাক্-ওয়াটার বা খাড়ি, দেখে মনে হয় সমুদ্র। দূরে পর্বতমালা। মাঝখানে লাল টাইলে তৈরী ষ্টেশনের বাড়িখানি আর লাল কাঁকর বিছান প্লাটফর্ম। সৃষ্টি করে এক অতি মনোরম পরিবেশ।

গাড়ি ছাড়ে। দেখা যায় রাস্তার দু'পাশে দিগন্ত-বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। তার মাঝে মাঝে নারিকেলের কুঞ্জ আর কলাগাছের গুচ্ছ। দেখা যায় আম কাঁঠালের গাছ। দেখতে পাওয়া যায় কাজু বাদামের গাছও। স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলা মায়ের পরিচিত পরিবেশ। সন্ধ্যা নামে দিগন্তে। দেখা যায় না বাইরের দৃশ্য, একে একে হয়ে যায় অদৃশ্য। রাত্রি এগারোটায় গাড়ি পৌছায় সাউথ আরনা-কিউলামে। এটি এই লাইনের সব শেষের আগের ষ্টেশন। আগের ষ্টেশনটির নাম নর্থ আরনা-কিউলাম। খাড়ির পাড় দিয়ে গড়ে উঠে শহর, দক্ষিণ অংশকে বলা হয় সাউথ আরনা-কিউলাম, উত্তর অংশ পরিচিত নর্থ আরনা-কিউলাম নামে।

আমরা প্রথমে ট্রাভেলার্স বাংলোর খোঁজ করি। খোঁজ নেই দক্ষিণে উত্তরে। একে একে উপস্থিত হই সবগুলি বাংলোতে। দেখি, সবগুলিই যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে আছে। নাই স্থান অন্য যাত্রীর। আসছে সপ্তাহে নেহেরুজি পদার্পণ করবেন এই শহরে, তাই এত ভীড়। অগত্যা উঠতে হয় এক হোটেলে। আছে ষ্টেশনের একেবারে নিকটে। মেলে একটি মাঝারি

আকারের ঘর। হোটেলে পৌঁছে খাওয়া-দাওয়া সারি। তারপর আশ্রয় নেই শয্যায়। তখন ভোর হতে আর বেশি দেরী নাই।

তিনভাগে বিভক্ত হয়ে আছে কোচিন। খাড়ির কিনারা দিয়ে তৈরী হয়েছে সাউথ আর নর্থ আরনা-কিউলাম। সমুদ্রের পাড়ে আছে কোচিন। মাঝখানে মাটি ফেলে বানান হয়েছে ওয়েলিংডন আইল্যাণ্ড, হয়েছে গত যুদ্ধের সময়। প্রথমটি ছিল কোচিনের রাজার অধীনে, এখন এসেছে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সরকারের। দ্বিতীয় আর তৃতীয়টি ছিল বৃটিশের অধীনে, এখন ভারত সরকারের। প্রথমটিতে আছে রাজপ্রাসাদ, স্কুল, কলেজ, বাজার, হোটেল ইত্যাদি। খাড়ির কিনারা দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে একটি প্রশস্ত রাজপথ। তার এক প্রান্তে শোভা পায় নানারকমের ফুলে ভরতি একটি উদ্যান, যেমন শোভন তেমনই সাজান। অন্য প্রান্ত মিশেছে গিয়ে বাজারে। বেড়ায় সেখানে অধিবাসীরা সকাল সন্ধ্যায়। বেড়াতে যাই আমরাও যে কদিন থাকি কোচিনে। সামনেই দেখা যায় সমুদ্র ও খাড়ির সংযোগস্থল। একটি বিরাট নদীর মত বেরিয়ে আসে সমুদ্র থেকে, চলে সমান্তরালে। সেই পথেই যাতায়াত করে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ। নোঙর ফেলে এসে ওয়েলিংডন আইল্যাণ্ডে। এইটিই এখানকার বন্দর। আছে সমুদ্র থেকে দূরে, তাই হয়ে আছে নিরাপদ। এইখানেই আছে প্রসিদ্ধ নেভ্যাল কলেজ বা নৌ-বিদ্যা শিক্ষায়তন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৌ-বিদ্যাপীঠ। আছে এখানে রেলের আর ভারত সরকারের দপ্তর। আছে কয়েকটি ব্যবসায়ীদের দপ্তরও। নাই এখানে একটিও বসত বাড়ি। বৃটিশ-কোচিনে আছে কাষ্টম্‌স্ অফিস আর কতকগুলি কুড়ে ঘর, জেলেরা বাস করে।

আরনা-কিউলামে আছে দুইটি মন্দির। নাই এই মন্দিরে স্থাপত্য-শিল্পের কোন প্রকৃষ্ট নিদর্শন। একদিন দেখতে যাই মন্দির। দেখি বিগ্রহ। দিয়ে আসি পূজা। একদিন দেখি শহর, বাজার, রাজপ্রাসাদ। দেখি যা কিছু আছে দর্শনীয় শহরে। বাজারটি বেশ বড়। আমদানী হয় এখানে নানারকমের বিদেশী সিল্কের কাপড়। চালান যায় সারা মালাবারে। একদিন ঘুরতে যাই খাড়ি দিয়ে। যাই একখানি ছোট জাহাজে চড়ে। সুরু হয় আমাদের যাত্রা উদ্যানের নিকটবর্তী একটি ছোট জেটি থেকে। প্রথমে ঘুরি আইল্যাণ্ডের

চারিদিকে। দেখি বন্দরটি আর নৌ-বিদ্যাপীঠ। তারপর, বৃটিশ-কোচিনের কিনারা দিয়ে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি। ছোট জাহাজ, তাই ফিরে আসতে হয় সংযোগস্থল থেকেই। এই সংযোগস্থলটি প্রকৃতির একটি অপরূপ লীলা নিকেতন। সম্মুখে আর দক্ষিণে আরব সাগর, উত্তাল তরঙ্গ বুকে নিয়ে ছুটে চলেছে অসীমের পানে, মিশেছে গিয়ে দিগন্তে। মিশেছে নীল সাগরের জল আর নীল আকাশ। সৃষ্টি হয়েছে এক নীল রং-এর সমুদ্র। বামে বৃটিশ-কোচিনের বালুতট। মিলিয়ে যায় কিছুদূর গিয়ে। মিশে যায় সমুদ্রের সঙ্গে। এক হয়ে যায় বালুতট, সমুদ্র আর দিগন্ত। হারিয়ে ফেলে নিজেদের স্বরূপ। পাড়ের উপর লুটিয়ে পড়ে আরব সাগর। বিরাম নাই সেই লুটিয়ে পড়ার। জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে যায় খাড়ি দিয়ে। যায় এ্যালেপ্যির দিকে। এ্যালেপ্যি এখান থেকে ছিয়াত্তর মাইল দূরে। তখন পড়ে আসে বেলা। জলের ধার থেকে দু'ধারে উঠে যায় বড় বড় গাছ, তাদের ছায়া এসে পড়ে জলের বুকে। মাঝে মাঝে দেখা যায় এক একটি অট্টালিকা, দাঁড়িয়ে আছে পাড় ঘেঁসে। মাইল তিরিশ এইরকম পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চলবার পর, আমরা ফিরে আসি আরনা-কিউলামে। পৌঁছাই সন্ধ্যার পর।

যোগাড় হয় অনেক কষ্টে একখানি মোটরগাড়ি। আমরা রওনা হই কালাদি অভিমুখে। দেখবো জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান। সৌভাগ্য হয় শ্রীপ্রেমেন্দুরে রামানুজ আচার্যের জন্মস্থান দেখবার। সেই থেকেই এক তীব্র বাসনা জাগে, জাগে মনের অন্তরতম প্রদেশে। দেখবো কালাদি। পূর্ণ হয় সে বাসনা এতদিনে। কালাদি কোচিন থেকে ২৪।২৫ মাইল দূরে। রাস্তায় পড়ে আলোয়াই নদী। এই নদী পার হয়ে ৮।৯ মাইল গেলে পৌঁছানো যাবে কালাদিতে। একমাত্র আলোয়াইতেই পানের উপযুক্ত জল আছে। নাই কোচিনের অন্য কোন স্রোতস্বতীতে। সারা কোচিনবাসিদের জীবনধারণ করতে হয় এই একটি মাত্র নদীর জল পান করে। তাই এত পবিত্র তার জল। এই নদীই প্রবাহিতা হয়েছেন শঙ্করাচার্যের বাড়ির নীচে দিয়ে। হয়েছেন শঙ্করের আদেশে, তাঁর মাতার অনুরোধে, পরিচিত প্যারেরা নামে। এইবারে আমরা যাই মালাবারের একেবারে বুকের উপর দিয়ে। পথের দু'ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত, মিশেছে গিয়ে দিগন্তে। মাঝে মাঝে কলা ও নারিকেল

গাছের শ্রেণী। কোথাও বা দাঁড়িয়ে আছে আম কাঁঠালের বৃক্ষ। সৃষ্টি করে এক অতি রমণীয় পরিবেশ। তার সঙ্গে সঙ্গে গাছে ঘেরা খড়ের ঘর। আঙিনায় আঙিনায় বাঁধা গরু। মাটির দাওয়ায় বসে লোকেদের হুকা হাতে তামাক খাওয়া। কর্মব্যস্ত মেয়েদের ইতস্তত ঘোরা-ফেরা। প্রাঙ্গণে ছোট ছেলে-মেয়েদের ছুটোছুটি। পড়ে গিয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠা। মায়েদের দৌড়ে গিয়ে কোলে তুলে নেওয়া। বুকের মধ্যে চেপে ধরে সান্ত্বনা দেওয়া। মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে এক অতি পরিচিত স্মৃতি। সে স্মৃতি পূর্ববঙ্গের পল্লীমায়ের। স্মৃতি আমার দেশের গ্রামের। তাই এত মধুর। কোথায় পূর্ববঙ্গ! আর কোথায় এই মালাবারের প্রান্তদেশ। প্রায় দু'হাজার মাইলের ব্যবধান। কিন্তু কি আশ্চর্য সাদৃশ্য। সাদৃশ্য শুধু ঘরবাড়িতেই আবদ্ধ নয়। আছে তাদের অধিবাসীদের চেহারায়, আছে তাদের মুখে। আছে বেশি করে মেয়েদের মুখের সঙ্গে। শাড়ি পরিয়ে দিলে বোঝা কঠিন হবে, তারা বাঙালী কি মালাবারী। খুঁজে পাওয়া যায় না কোন সঙ্গত কারণ এই রহস্যের। মনে হয় কোন এক অতীতকালে এসেছিলেন এক বাঙালী দম্পতি। এসে বসবাস করেছিলেন এইখানে। তাঁদেরই বংশধর এরা।

একটি সরু রাস্তা দিয়ে, এক ফুলে ভরতি সূর্যমুখীর কুঞ্জের একেবারে গা ঘেঁসে, আমাদের গাড়ি কালাদির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে প্রবেশ করে। তখন সূর্যদেব পশ্চিম গগনের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছেন। উপনীত হয়েছেন প্রাঙ্গণের নীচে দিয়ে প্রবাহিতা প্যারেরা নদীর অপর পারের পাহাড়ের শীর্ষ-দেশে। একটি মৃদু লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের চূড়ায় আর অঙ্গে। পড়েছে নদীর বুকেও। লাল হয়ে উঠেছে প্রাঙ্গণের ভিতরে অবস্থিত মন্দিরের চূড়া। মনে হয় এসেছি কোন এক মহাতীর্থে। গাড়ি থেকে নেমেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই। স্পর্শ করি নদীর জল। নিজেদের পবিত্র করে নেই। ধীরে ধীরে তীরে উঠে আসি। এসে বসি এক অতি সুন্দর সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধান চাতালের উপর। বসে বসে দেখি সূর্যাস্ত। দেখি অস্তাচলে যান সূর্যদেব। যান অতি ধীরগতিতে। শেষে পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যান। মিলিয়ে যায় লাল আভা একে একে পাহাড়ের চূড়া থেকে, যায় অঙ্গ থেকে। মিলিয়ে যায় নদীর বুক থেকেও।

এই সেই পুণ্যভূমি কালাদি, এই সেই পবিত্র নদী প্যারেরা। এইখানেই জন্ম নিয়েছিলেন জগদ্‌গুরু। এই নদীর ধারেই কেটেছিল তাঁর শৈশবের দিনগুলি। তখন কি এখানকার অধিবাসীরা জানতে পেরেছিল কি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই শিশু। জানতে পেরেছিল কি এই শিশুই হবে একদিন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত। তাঁর জ্ঞানে আর গরিমায় মুখরিত হবে সারা ভারত। প্রতিধ্বনিত হবে বাণী ভারতের আকাশে বাতাসে। প্রকম্পিত হবে ভূস্বর্গ কাশ্মীর। রক্ষা পাবে সেখানকার হিন্দু আর হিন্দুধর্ম মুসলমানের অত্যাচার থেকে। হতে হবে না তাদের মুসলমান। করতে হবে না ধর্মান্তর গ্রহণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে। রক্ষা পাবে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধের কবল থেকেও। প্রতিষ্ঠা করবে মঠ চার ধামে। দ্বারকায় শারদা, পুরীতে গোবর্ধন, বদরিকায় জ্যোতি আর মহীশূরে শৃঙ্গেরী। সেখান থেকে প্রচারিত হবে হিন্দুধর্মের গূঢ়তত্ত্ব। প্রচার হবে সারা ভারতবর্ষে। প্রচার হবে হিন্দুধর্মের মহিমা দিকে দিকে, হবে পুনর্জীবিত ফিরে পাবে শ্রেষ্ঠত্বের আসন।

মূর্খ তারা। নইলে কেন দিল তারা এত কষ্ট, এমন অপবাদ তাঁর মাকে। মুমূর্ষু মা। পুত্রের বিচ্ছেদে কেঁদে কেঁদে নিজেকে সঁপে দিলেন মৃত্যুর হাতে। দিলেন তিল তিল করে। এত করেও শান্তি পেলো না তারা। মিটলো না তাদের আক্রোশ। স্পর্শ করলো না সেই মৃতদেহ। সাহায্য করলো না দাহ করতে। রয়ে গেল অদাহ অবস্থায়। সুদূর বিদেশে শঙ্করাচার্যের কানে পৌঁছাল এই খবর। ছুটে এলেন তিনি। এলেন এক ঘোর উন্মাদ। কোলে তুলে নিলেন মায়ের প্রাণহীন দেহ। অতি সন্তর্পণে নিয়ে গেলেন প্যারেরার কূলে। স্নান করালেন পবিত্র জলে। আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন দেহ। নিয়ে এলেন তীরে। কারও কাছে চাইলেন না সাহায্য। ভিক্ষা করলেন না দয়া। কাটলেন মায়ের দেহ টুকরো টুকরো করে। সমাধিস্থ করলেন সেই টুকরোগুলি প্যারেরার পবিত্র কূলে। তারপর ছুটে চলে গেলেন। ছেড়ে চলে গেলেন আত্মীয় স্বজন, পরিত্যাগ করে গেলেন প্রিয়তম জন্মস্থান। গেলেন চিরদিনের মত। আজ এইখানেই গড়ে উঠেছে একটি ক্ষুদ্র স্মৃতিসৌধ। শ্রদ্ধা নিবেদন করে যায় সেখানে দেশ-বিদেশের যাত্রী। আমরাও চাতাল থেকে উঠে দেখি সেই স্মৃতিসৌধ। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি চিত্র। বড়ই মর্মন্তুদ।

মনে হতে থাকে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের কাহিনী। সেগুলির মূলে থাকে কত না ভুল। কত না অজ্ঞানতা।

স্মৃতিসৌধকে প্রণাম জানিয়ে আমরা শঙ্করাচার্যের মন্দির দেখতে যাই। আজ শঙ্করাচার্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। আজ তিনি জগদ্‌গুরু। পৃথিবীর মানুষ দিয়েছে তাঁকে দেবতার আসন। গড়েছে মূর্তি। প্রতিষ্ঠা করেছে সেই মূর্তি। তাঁকে ঘিরে নির্মাণ করেছে এক সুন্দর মন্দির। সকাল সন্ধ্যায় পূজা হয় সেই মন্দিরে। পূজা হয় দুপুরেও। হয় ষোড়শ উপচারে। হয় ঘণ্টা বাজিয়ে। হয় আরতিও ধূপ দীপ জ্বেলে। যেমন হয় অন্য দেবতার। সামনেই নির্মিত হয়েছে আর একটি মন্দির। সেখানে পূজিতা হন তাঁর মা। তৈরী হয়েছে এখানে একটি যাত্রীনিবাসও। আজ দলে দলে আসে যাত্রী। আসে দেশ-বিদেশ থেকে। শ্রদ্ধা নিবেদন করে যায় জগদ্‌গুরুকে। নিবেদন করে তাঁর মাকেও। স্থান পায় এই যাত্রীনিবাসে।

আমরা একে একে দু'জনকে পূজা দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। এসে বসি আবার সেই চাতালের উপর। তখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। রাত্রির অন্ধকারে দিগন্ত ছেয়ে ফেলে। স্তব্ধ হয়ে ভাবতে থাকি এই সেই কালাদি। এইখানেই জন্ম নিয়েছিল এক অসামান্য প্রতিভা, যা করেছিল বিশ্বজয়। এক মহামানব, যাঁর জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েছিল আসমুদ্র হিমাচল। এক যুগাবতার, যাঁর কণ্ঠের বাণী প্রকম্পিত করেছিল ভারতের আকাশ বাতাস। পরিণত করেছিল তাঁকে আচার্যশ্রেষ্ঠে। পরিণত হয়েছিলেন তিনি জগদ্‌গুরুতে। তাই আজ তুমি মহাতীর্থের অন্যতম। শ্রদ্ধা নিবেদন করে যাই তোমার প্রতি বালুকণাকে, যা হয়ে আছে মহাপবিত্র। প্রণাম জানাই সেই দেবশিশুকে. সেই মহামানবকে, সেই যুগাবতারকে, যে ভূমিষ্ঠ হয় এই বালুকণার উপর। যাঁকে বক্ষে ধারণ করে ধন্য হয়েছো তুমি। ধন্য হয়েছে ভারতবর্ষ। আজ ধন্য আমি। ধন্য হই তোমার দর্শন পেয়ে।

গভীর রাত্রিতে ফিরে আসি কোচিনে। পরের দিন বেলা দু'টার গাড়িতে রওনা হই কোচিন থেকে। রাত্রি দশটায় কৈম্বাটুরে ফিরি।

কৈম্বাটুরে এসে বন্ধুর বাড়িতে উঠি। বন্ধু আগে থেকেই একটি মোটর গাড়ি যোগাড় করে রেখেছিলেন।

আমরা চা পান ও প্রাতরাশ শেষ করে শহর দেখতে রওনা হই। আছে এখানে একুশটি কাপড়ের কল, তাই দক্ষিণের ম্যান্‌চেষ্টার বলে খ্যাতিলাভ করে কৈম্বাটুর। পরিচিত দক্ষিণ ভারতের কানপুর নামেও। বাস করেন এখানে মহা ধনশালী চেট্টিরা। বাসস্থান সম্মুখম চেট্টিরও। তাঁরাই এই সব কাপড়ের কলের মালিক। চারিদিকে পর্বতে বেষ্টিত হয়ে এক অতি সুন্দর মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে শহরটি দক্ষিণ ভারতের শৈল রাণী উটাকামণ্ডের পদতলে। হয়ে আছে এক সৌন্দর্যের লীলাভূমি।

আমরা শহর দেখে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। তারপর বিকেলের বাঙ্গালোর এক্সপ্রেসে চড়ে বাঙ্গালোর অভিমুখে রওনা হই। বন্ধু আমাদের ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে যান।

পরিত্যাগ করি দ্রাবিড়স্থান, এগোতে থাকি চালুক্যভূমের দিকে।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

### দ্রাবিড় স্থাপত্যের ধারা ঃ

ঐতিহাসিক পার্শী ব্রাউন দ্রাবিড় স্থাপত্যের ধারাকে পাঁচ ভাগে বা যুগে ভাগ করেছেন—পল্লব, চোল, পাণ্ড্য, বিজয় নগর আর মাদুরা যুগ।

১। পল্লব যুগ ঃ—( ৬১০-৯০০ খৃষ্টাব্দ )

বিস্তৃত এই যুগ ৬১০ থেকে ৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। কাঞ্চীপুরমের পল্লব রাজা মহেন্দ্র বর্মণই দ্রাবিড় স্থাপত্যের আদি স্রষ্টা। তিনিই ৬১০ থেকে ৬৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মাণ করেন পাহাড় কেটে মণ্ডপ।

তাঁর পুত্র নরসিংহ বর্মণ মহামল্লম, শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অলঙ্কৃত করেন সিংহাসন ৬৪০ খৃষ্টাব্দে।

নির্মিত হয় পাহাড় কেটে সাতটি রথ আর আর দশটি মণ্ডপ মামাল্লাপুরম্ বা বা মহাবলীপুরমের সমুদ্রসৈকতে। শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে ধর্মরাজার রথ আর মহিষাশূরের মণ্ডপ।

মামাল্লাপুরম্, শ্রেষ্ঠ বন্দর কাঞ্চীর রাজাদের, বেষ্টন করেছিল তার সমুদ্র সৈকত এক শৈলমালা, উপযুক্ত মন্দির নির্মাণের। এই রথগুলিই শৈব মন্দির, প্রতিমূর্তি আছে তাতে শিবের আর দুর্গার। পল্লবরাই আদি ভাস্কর, সুন্দরতম দেব-দেবীর মূর্তি দিয়ে শোভিত করেন এই সব রথ বা মন্দির আর মণ্ডপের অঙ্গ। শোভা পায় মণ্ডপে অপরূপ স্তম্ভ, দাঁড়িয়ে আছে কেশরযুক্ত সিংহের মাথার উপর। সীমাহীন তাঁদের দান।

৬৭৪ খৃষ্টাব্দে নরসিংহ বর্মণের মৃত্যু হয়, বন্ধ হয় পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণ। তাঁর উত্তরাধিকারী, রাজসীমা প্রবর্তন করেন এক নতুন পদ্ধতি। পাথর দিয়ে নির্মিত হয় ছয়টি মন্দির ৬৯০ থেকে ৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। নির্মিত হয় মামাল্লাপুরমে 'সোর' (জলশয়ান) ঈশ্বর আর মাকুন্দের মন্দির, কাঞ্চীপুরমে বৈকুণ্ঠ পেরুমলের আর কৈলাসনাথের মন্দির আর দক্ষিণ আরকটে পানামালাই এর মন্দির। তাদের মধ্যে মহাবলীপুরমের জলশয়ানের মন্দিরটিই প্রাচীনতম, নির্মিত হয় ৭০০ খৃষ্টাব্দে। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি

সাগরকূলের একেবারে শেষ প্রান্তে, সমুদ্রের মুখোমুখি হয়ে আছে, নাই তাই তার সামনে কোন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের বুকের ওপর। বর্ষিত হয় প্রথম সূর্যের আলো গর্ভগৃহে অবস্থিত দেবতার মস্তকে। ধন্য হয় সাগর পেয়ে তাঁর পায়ের স্পর্শ। মন্দিরের চূড়ার আলো রাত্রিতে নির্দেশ করে পথ, জানায় বিপদের বার্তাও। মন্দিরকে বেষ্টন করে আছে একটি পাথরের প্রাচীর, তার মধ্যে আছে একটি আয়তক্ষেত্র প্রাঙ্গণ, বানান হয় সেই প্রাঙ্গণে পয়ঃপ্রণালী, ব্যবস্থা আছে জোয়ারের জল নিষ্কাসনেরও। আছে এই মন্দিরে দুইটি চূড়া, এইগুলি দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের আদি চূড়া। রূপ লাভ করে ধর্মরাজের মন্দিরের সম্ভাবনা, উপনীত হয় দ্রাবিড় স্থাপত্য এক সীমাহীন অগ্রগতির পথে।

প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে আছে কত সিংহ, হাঁটুমুড়ে বসে আছে কত নন্দী। পশ্চিমদিকে রচিত হয়েছে এক শিল্প-সম্ভারে শোভিতে প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথটি মিশেছে এসে একটি অলিন্দে, তার পাশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে কত মূর্তি, মূর্তি কত দেব-দেবীর। বঙ্গোপসাগর সহস্রফণা বিস্তার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে মন্দিরের বুকের উপর। অর্ধনিমজ্জিত হয় মন্দির সাগরের উত্তাল তরঙ্গের নীচে, আবার ভেসে ওঠে সমুদ্রের বুকে। চলেছে এই খেলা বিরামহীন, চলেছে সহস্র বৎসরেরও উপর, কিন্তু আজও অক্ষত মন্দিরের চূড়া, হয়নি কোন ক্ষতি মন্দিরের দেবতার। পল্লবদের এক অপরূপ কীর্তি এই মন্দির, দাঁড়িয়ে আছে এক মহিমময় মূর্তিতে।

কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথের মন্দির, এই মন্দিরের সমসাময়িক। একই পদ্ধতিতে নির্মিত তার চূড়াও, কিন্তু আরও মার্জিত, আরও রমণীয় আর সুষ্ঠু গঠন। উন্নত সংস্করণ এই মন্দিরের চূড়ার। এই কৈলাসনাথের মন্দিরেই নির্মিত হয় প্রথম গোপুরম, বুকে নিয়ে সুন্দর শিল্প-সম্ভার।

কৈলাসনাথের মন্দিরের দশ বছর পরে বিষ্ণু-কাঞ্চীতে বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির নির্মাণ সুরু হয়। পূর্ণ পরিণতি লাভ করে পল্লব স্থাপত্য। অপরূপ এই মন্দিরের সিংহের কেশরযুক্ত স্তম্ভ শ্রেণী, অনবদ্য এই মন্দিরের অলিন্দের আর চূড়ার শিল্প-সম্ভার, পল্লব স্থপতির চরম উৎকর্ষের নিদর্শন, প্রতীক এক গৌরবময় সৃষ্টির।

নির্মিত হয় মন্দির নন্দী বর্মণ আর তাঁর পরবর্তী রাজাদের আমলেও। নির্মিত হয় কাঞ্চীপুরমে মুক্তেশ্বরের আর মাতঙ্গেশ্বরের মন্দির। ভাদমল্লিশ্বরের মন্দির চিঙ্গলপেটে, বিরাওনেশ্বরের মন্দির ত্রিতুতানিতে, রেনিগুণ্টাতে পরশুরামেশ্বরের মন্দির ও আরও অনেক মন্দির ৪০০ থেকে ৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তারা নিকৃষ্ট অনুকরণ কৈলাসনাথের আর বৈকুণ্ঠ পেরমলের। নন্দী বর্মণের সময়েই গোপুরম লাভ করে প্রধান স্থান। নির্মিত হয় মন্দিরের চার প্রবেশ পথে চারটি গোপুরম। শেষে গোপুরমকেই দ্রাবিড় স্থপতি করেন মধ্যমণি, নির্মিত হয় আকাশচুম্বী গোপুরম, তাদের অঙ্গ আর শীর্ষদেশ শোভিত করেন স্থপতি অনবদ্য আর সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভারে।

যে স্থাপত্যের শিখা জ্বালান বৌদ্ধ স্থপতি ২৬০ খৃষ্টপূর্বে মহারাজা অশোকের রাজত্বকালে, প্রজ্জ্বলিত হয় যে শিখা বিরুতে, সাঁচীতে, অমরাবতীতে আর অজন্তাতে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ আর সপ্তম শতাব্দীতে, অস্তমিত হয় যে শিখা অষ্টম আর নবম শতাব্দীতে, জ্বালিয়ে রাখেন পল্লব রাজারা আর পল্লব স্থপতি সেই শিখা দক্ষিণ ভারতে। উজ্জ্বলতর হয় সেই শিখা চোলেদের রাজত্বকালে, উজ্জ্বলতম হয় বিজয়নগরের আর নায়ক রাজাদের যুগে, দিগন্ত হয় উদ্ভাসিত। ক্রমে সেই শিখা সাগর অতিক্রম করে প্রবেশ করে ইন্দোনেশিয়ায়, ছড়িয়ে পড়ে তার নগরে নগরে। আজ সারা ইন্দোনেশিয়া বুকে নিয়ে আছে তার স্মৃতিচিহ্ন, চিহ্ন এক অনবদ্য সৃষ্টির, এক অপরিসীম কৃষ্টির, এক গৌরবময় কীর্তির। ম্লান হয়ে যায় তার কাছে ভারতের পূর্ব গৌরব, ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের সভ্যতা।

## ২। চোল যুগ ( ৯০০-১১৫০ খৃষ্টাব্দ )

সাম্রাজ্য নিয়ে যুদ্ধ হয় পল্লব, চোল, পাণ্ড্য, চালুক্য আর রাষ্ট্রকূট রাজাদের মধ্যে। শেষে ৯০০ খৃষ্টাব্দে চোল হন মহা প্রবল, হন তামিলনাদের সার্বভৌম রাজা। রাজত্ব করেন প্রবল প্রতাপে প্রায় ২৫০ বছর। উত্তরে গঙ্গা আর দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত তাঁদের সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হয়।

আবার নির্মিত হয় মন্দির দক্ষিণ ভারতে ৯০০ থেকে ১১৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, হয় পাড়ুকোটাই-এ, নর্থমালাই-এ, কান্নুর আর তিরুমায়ান তালুকে ও আরও অনেকস্থানে। আকৃতিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু সম্পূর্ণ মন্দির এগুলি, পরিচয় দেয়

আদি চোল স্থাপত্যের। পৃথক পল্লব স্থাপত্যের থেকেও। নির্মিত হয় এই সব মন্দিরের চূড়া চালুক্য স্থপতির নির্মিত পট্টদকলের আর বাদামির অনুকরণে, শৃঙ্গে নিয়ে জোড়া গম্বুজ।

নির্মাণ করান রাজা প্রথম প্রান্তক শ্রীনিবাসনালূরে তিরচূরাপল্লীতে কোরঙ্গ নাথের মন্দির দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে। স্থপতি ক্ষোদিত করেন এই মন্দিরের দেওয়ালে আর বিমানের শীর্ষদেশে অপরূপ প্রমাণ মূর্তি, মূর্তি দেব-দেবীর। মূর্তি লক্ষ্মীর, সরস্বতীর আর দক্ষিণা কালীর। স্বরু হয় মন্দিরের অঙ্গে মূর্তি নির্মাণ।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে আর একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজারাজ চোল অলঙ্কৃত করেন চোল সিংহাসন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা চোল বংশের, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও। নির্মাণ করান নটেশের মন্দির চিদাম্বরমে, অঙ্গে নিয়ে প্রকৃষ্টতম স্থাপত্যের নিদর্শন।

তিনিই নির্মাণ করেন ১০০০ খৃষ্টাব্দে রাজধানী তাঞ্জোরে বৃহদীশ্বরের মন্দির। বিশালতম মন্দির দক্ষিণ ভারতের, উচ্চতমও, দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরটি এক মহামহিমময় মূর্তিতে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় স্থাপত্যের, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভারতীয় স্থাপত্যেরও। অনবদ্য এই মন্দিরের চূড়ার আকৃতি আর তার অঙ্গের আর শীর্ষ দেশের শিল্প-সম্ভার, অনুপম এই মন্দিরের বিমানের শিল্পসম্পদ, পরিচয় দেয় চোল স্থপতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, এক অমর কীর্তির।

১০২৫ খৃষ্টাব্দে রাজারাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র চোল নির্মাণ করেন গঙ্গাকোণ্ড চোল পুরমের মন্দির। প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহদীশ্বরের মন্দিরের, নির্মিত হয় মন্দিরটি কুম্ভকোনাম থেকে সতের মাইল দূরে, এক উঁচু দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণের একেবারে কেন্দ্রস্থলে। ১৫০ ফিট এই মন্দিরের বিমানের উচ্চতা। এই মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথ মিশেছে গিয়ে একটি স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপে। আছে এই মণ্ডলে ১৫০টি স্তম্ভ। কিন্তু নয় তারা সুষ্ঠু গঠন, শোভিত করা হয় নাই তাদের অঙ্গ আর শীর্ষদেশ সুক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভারে। এইখানেই পত্তন হয় সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহের বা মণ্ডপের। পরবর্তীকালে পরিণত হয় এই সহস্র স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ দ্রাবিড় মন্দিরের অন্যতম প্রধান অঙ্গে। তাই এই বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের। অনবদ্য এই মন্দিরের বিমানের

অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প-সম্ভারও, সমপর্যায়ে পড়ে বৃহদীশ্বরের বিমানের শিল্প-সম্ভারের, প্রতীক শ্রেষ্ঠ চোল স্থাপত্যেরও।

ভাস্কর শোভিত করেন এই মন্দির দু'টির ভিত্তিগাত্র অপরূপ প্রতিমূর্তি দিয়ে। গড়েন এক একটি প্রতিমূর্তি এক একটি কুলুঙ্গির মধ্যে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নৃত্য করেন নটরাজ। পশ্চিম কোণে প্রদীপ্ত লিঙ্গমের মধ্যে বিরাজ করেন শিব। দক্ষিণে গণেশ আর উত্তরে চণ্ডীকেশ্বর বিরাজ করেন। আরও অনেক দেবতা। তাঁদের বেষ্টন করে আছে কত উড়ন্ত অপ্সরা, কত হামাগুড়ি দেওয়া গণদেবতা, কত রাক্ষস, কত যক্ষ। নিখুঁত এই মূর্তি-গুলির গঠন, প্রাণবন্ত তারা, পরিচায়ক চোল স্থপতির শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য জ্ঞানের। এই সময়েই চোল স্থাপত্য উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে।

৩। পাণ্ড্য যুগ ( ১১৫০-১৩০০ খৃষ্টাব্দ।

পাণ্ড্যরা দক্ষিণ ভারতে প্রবল হন, হন সার্বভৌম সম্রাট, ১১০০ থেকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। নন তাঁরা স্রষ্টা। নির্মাণ করেন তাঁরা একটি মাত্র সম্পূর্ণ মন্দির, তাঞ্জোরে দ্বারাপুরমে, পরিচিত ঐরাবতেশ্বরের মন্দির নামে। উল্লেখযোগ্য নয় এই মন্দিরের কারুকার্য। নিবদ্ধ থাকে তাঁদের প্রচেষ্টা গোপুরম নির্মাণে। তাই দ্বাদশ আর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠে অনেকগুলি গোপুরম দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে, শোভা করে মন্দিরের প্রবেশদ্বার। নির্মাণ করেন মন্দিরে মন্দিরে উঁচু প্রাচীরও, নাই তাতে কোন কারুকার্য, নাই শিল্প সম্পদ।

সুরুতে তাঁরা নির্মাণ করেন অতি সাধারণ গোপুরম। সামান্য তাদের অঙ্গের কারুকার্য, নাই ভাস্করের হাতের প্রতিমূর্তিও। ক্রমে তাঁদের অভিজ্ঞতা বাড়ে, তাঁরা সফলতা লাভ করেন গোপুরম নির্মাণে। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয় প্রকৃষ্টতম গোপুরম তিরুচুরাপল্লীতে, জম্বুকেশ্বরের মন্দিরে। নির্মাণ করেন সুন্দর পাণ্ড্য। তিনিই নির্মাণ করেন চিদাম্বরমে নটেশের মন্দিরের পূর্ব প্রবেশদ্বারে একটি অপরূপ গোপুরম, সমসাময়িক জম্বুকেশ্বরের গোপুরমের। লেখা আছে সুন্দর পাণ্ড্যের নাম এই গোপুরমের অঙ্গে।

শ্রেষ্ঠ গোপুরম পাণ্ড্য স্থপতির চিদাম্বরমের গোপুরম, অঙ্গে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন। উচ্চতায় ৯০ ফিট আর প্রস্থে ৬০ ফিট, আছে

এই গোপুরমে সাতটি তলা। শোভিত করেন স্থপতি এর সর্বনিম্ন তলার বাইরের অঙ্গ তাঞ্জোরের বিমানের ভিত্তি গাত্রের অনুকরণে। কিন্তু আরও বিস্তৃত, আরও সূক্ষ্ম এর স্তম্ভযুক্ত কুলঙ্গির আর পল্লবে শোভিত চন্দ্রাতপের শিল্প-সম্ভার। পরিমিত ও অতিক্রম করে নাই সংযমের মাত্রা। তাই নিদর্শন শ্রেষ্ঠ গোপুরমের। নির্মিত হয় অনুরূপ গোপুরম তিরুভন মালাই-এর মন্দিরে ১৩০০ খৃষ্টাব্দে। নির্মাণ করেন ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে কুম্ভোকোনামের প্রসিদ্ধ মন্দিরেও এক অপরূপ গোপুরম।

৪। বিজয়নগর যুগ ( ১৩৫০-১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ )

মহাপরাক্রমশালী হন দক্ষিণ ভারতে বিজয় নগরের রাজারা, হন সার্বভৌম সম্রাট। প্রবল :প্রতাপে রাজত্ব করেন দু'শ বছরেরও উপর, ১৩৫০ থেকে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিস্তৃত হয় তাঁদের রাজ্যের সীমানা কৃষ্ণা থেকে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগরে স্থাপিত হয় রাজধানী। পরিণত হয় বিজয়নগর এক মহাসমৃদ্ধিশালী নগরে, হয় সভ্যতা, সংস্কৃতি আর কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল। পরিণত হয় এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরে, এক স্বপ্নপুরীতে। বিতাড়িত হয় মুসলমান দক্ষিণ ভারত থেকে। রুদ্ধ হয় তাদের আক্রমণের গতি।

আবার দ্বিগুণ বেগে প্রজ্জ্বলিত হয় দ্রাবিড় স্থাপত্যের শিখা দক্ষিণ ভারতে, উদ্ভাসিত হয় সারা দক্ষিণ ভারত। তার দিকে দিকে শোভা পায় অপরূপ, মন্দির আর গোপুরম, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন। নিখুঁত তাদের পরিকল্পনা, আর অনবদ্য রূপদান। স্থপতি নির্মাণ করেন শিল্পের সমষ্টি, সমৃদ্ধিশালী করেন তাদের সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম আভরণে। শোভিত হয় মন্দিরের অঙ্গ সুন্দরতম লতা, পাতা আর পুষ্পে। পাথরের বুকে রচিত হয় কত বিভিন্ন আর বিচিত্র ভাবের সমাবেশ। কত সম্ভব আর অসম্ভব মূর্তি। কত সুন্দরতম পরিবেশ। কত মহিমময় পরিকল্পনা রচনা করেন স্থপতি হৃদয়ের সবখানি ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী। করেন এক অনুপম সৃষ্টি, নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের।

বিজয় নগরের স্থপতি নির্মাণ করেন সুন্দরতম স্তম্ভ। রচিত হয় সুন্দরতম খিলানও মন্দিরে মন্দিরে। শোভিত করেন তাদের অঙ্গ বিভিন্ন আর বিচিত্র

শিল্প-সম্ভারে। নির্মিত হয় কত অপরূপ চন্দ্রাতপ। শোভিত করেন সেই সব চন্দ্রাতপ কত অনবদ্য আর সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে। তাদের অঙ্গে শোভা পায় কত অশ্ব, দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন ভঙ্গিতে, উঁচু করে আছে সামনের পা দু'খানি। পশ্চাতের পা স্থাপিত স্তম্ভের অঙ্গে। যেমন বীরত্ব ব্যঞ্জক তাদের আকৃতি, তেমনই তাদের গঠন সৌষ্ঠব। একেবারে জীবন্ত প্রতিমূর্তি এক অলৌকিক পরিবেশের।

কেন্দ্রস্থলের স্তম্ভকে বেষ্টন করে আছে ক্ষুদ্র স্তম্ভের সমষ্টি, অঙ্গে নিয়ে সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার। সৃষ্টি হয় এক স্বপনপুরী, এক রহস্যলোক, শ্রেষ্ঠ আর অভিনব দান বিজয় নগরের স্থপতির। বন্ধনী দিয়ে শোভিত করেন এই সব স্তম্ভের শীর্ষদেশ, বিভিন্ন অলঙ্কার দিয়ে ভূষিত করেন তাদের অঙ্গ। যেমন সুন্দরতম তাদের পরিকল্পনা, তেমনই অনবদ্য রূপদান। নির্মিত হয় অষ্টকোণ আর ষোলকোণ স্তম্ভ দণ্ডও।

আসে ২৩শে জানুয়ারী ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ, ঘনিয়ে আসে এক মহাদুর্দিন দক্ষিণ ভারতের আকাশে। যুক্ত হন দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মুসলমান সুলতান, একযোগে আক্রমণ করেন বিজয় নগর। পরাজিত আর নিহত হন বিজয় নগরের রামরায়। ধ্বংসে পরিণত হয় মহাসমৃদ্ধিশালী বিজয় নগর, এশিয়ার সুন্দরতম নগর। আজও বুকে নিয়ে আছে পরিত্যক্ত নগর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিজয় নগরের স্থপতির, বিত্থাল আর হাজারা রামের মন্দির।

বিত্থালই শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম প্রতীক বিজয় নগরের স্থপতির। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ সুরু করেন এই মন্দির রাজা কৃষ্ণদেব রায়, শ্রেষ্ঠ রাজা বিজয় নগরের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও। নির্মাণ করেন কিছু অংশ তাঁর উত্তরাধিকারী অচ্যুত রাজাও, তিনি রাজত্ব করেন ১৫২৯ থেকে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তবুও অসমাপ্ত থেকে যায় এই মন্দিরের নির্মাণ।

একটি ৫০০ ফিট দীর্ঘ আর ৩১০ ফিট প্রস্থ আয়তক্ষেত্র প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে, বেষ্টিত হয়ে আছে তিন সারি স্তম্ভের বেষ্টনী দিয়ে। তিন প্রবেশ দ্বার শোভা করে আছে তিনটি গোপুরম। নির্মিত হয় ছয়টি স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপম্ এই বেষ্টনীর মধ্যে, বৃহত্তম তাদের মধ্যে মূল মন্দির। এই মূল মন্দিরে বিরাজ করেন বিত্থাল-রূপী বিষ্ণু। তিন অংশে ভাগ করা হয়

এই মূল মন্দিরকে, পিছনে গর্ভগৃহ, এখানে দেবতা বিরাজ করেন, মাঝখানে মণ্ডপ, তার সামনে অর্ধ মণ্ডপ, এক স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ।

আছে এই স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপে ছাপ্পান্নটি স্তম্ভ, প্রতিটি বার ফিট উঁচু, নির্মিত সম্পূর্ণ এক একটি স্ফটিক পাথর কেটে। অনবদ্য তাদের অঙ্গের শিল্প-সম্ভার। অনুপম কেন্দ্র-স্থলের মণ্ডপটি, রচিত অনবদ্য গঠন স্তম্ভ দিয়ে। পরিণত হয় এক স্বপ্ন-লোকে। ক্ষোদিত হয় সমতল ছাদেও একটি অপরূপ পদ্মফুল। দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন।

রচিত হয় বাইরের দেওয়ালে অসংখ্য কুলুঙ্গি, বিরাজ করেন সেখানে দেবতা, অপরূপ তাদের গঠন সৌষ্ঠব। বিমানটি ৭৫ ফিট দীর্ঘ আর ৭২ ফিট প্রস্থ, অপরূপ শিল্প-সম্ভারে শোভিত তার অঙ্গ আর শীর্ষদেশও।

অনুরূপ শিল্প-সম্ভারে আরও চারিটি মণ্ডপ। কিন্তু অতুলনীয় কল্যাণ মণ্ডপের শিল্প-সম্ভার। অনবদ্য এর অর্ধ মণ্ডপ, এক উন্মুক্ত চন্দ্রাতপ বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ বিজয় নগরের স্থপতির শিল্প-সম্ভার, এক মহিময় সৃষ্টি, এক অমর কীর্তি।

কৃষ্ণদেব রায়ই নির্মাণ করেন হাজারা রামের মন্দির, নির্মিত হয় ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে। এক সম্পূর্ণ মন্দির। বিরাজ করেন এই মন্দিরে অমন দেবতা, আছে এই মন্দিরেও একটি কল্যাণ মণ্ডপ, সমপর্যায়ে পড়ে বিথাল-মন্দিরের কল্যাণ মণ্ডপের।

পূর্বদিকের প্রবেশ পথ দিয়ে এক সুন্দরতম আচ্ছাদিত তোরণ অতিক্রম করে উপনীত হতে হয় একটি সভাগৃহে, শোভা করে আছে এই সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলের চারি কোণ চারিটি অতিকায় কালো পাথরের স্তম্ভে, অভিনব এই স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষ দেশের বন্ধনীর শিল্প-সম্ভার।

আছে এই সভাগৃহের দুই প্রান্তে দু'ইটি প্রবেশ পথ, আছে প্রতিটি প্রবেশ পথের সামনে একটি করে তোরণ। প্রবেশ পথের সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটি দুর্ভেদ্য উঁচু প্রাচীর অতিক্রম করে উপস্থিত হতে হয় প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে মূল মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। অপরূপ তার বিমান আর চুড়ার আকৃতি, অনবদ্য তাদের অঙ্গের কারুকার্যও। শোভিত হয়ে আছে বিভিন্ন অলঙ্কারে-অলঙ্কৃত কুলুঙ্গিতে। বৌদ্ধ চৈত্যের আকারে রচিত হয়

শিকারার শৃঙ্গ, নাই কোন গম্বুজ। বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি বিজয় নগরের স্থপতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, হয়ে আছে অমর।

এই মন্দিরের দেবতা রামই কুলদেবতা বিজয় নগরের রাজাদের, এই মন্দিরেই পূজা দিতেন রাজা আর তাঁদের পরিবারবর্গ।

বিজয় নগরের রাজাদের মন্দির নির্মাণের কাজ নিবদ্ধ থাকে না শুধু বিজয় নগরে রাজধানীতে, ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ভারতের নগরে নগরে। নির্মিত হয় মন্দির ভেলোরে, কুম্ভকোনামে, কাঞ্চীপুরমে, তদ্‌পত্রীতে, বিরিঞ্চিপুরমে আর শ্রীরঙ্গমে। তাদের মধ্যে ভেলোরের মন্দিরই প্রসিদ্ধতম, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন। অপরূপ এই মন্দিরের কল্যাণ মণ্ডপম্, সুন্দরতম আর প্রকৃষ্টতম কল্যাণ মণ্ডপ সারা দ্রাবিড়স্থানের। অপরাজেয় এই কল্যাণ মণ্ডপের স্তম্ভগুলির অঙ্গের পক্ষীরাজ ঘোড়াগুলির সৌন্দর্য। তুলনাহীন সর্পের সৌন্দর্যও, বেষ্টন করে আছে স্তম্ভের অঙ্গ। সীমাহীন সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম ভূষণে ভূষিত করেন এই স্তম্ভগুলি, নাই এই আতিশয্য অন্য কোন মন্দিরের স্তম্ভে। শোভিত করেন চন্দ্রাতপের কেন্দ্রস্থলের স্তম্ভগুলিকে কেশরযুক্ত সিংহ দিয়ে। ফিরে যান বিজয় নগরের স্থপতি ৬০০ বছরের ফেলে আসা পল্লব যুগে, মহাবলীপুরমের যমপুরীর মন্দিরে, দেন তাদের অপরূপ রূপ, ভূষিত করেন তাদের বিভিন্ন আর বিচিত্র অলঙ্কারে, হয় তারা সৌন্দর্যময়। সমন্বয় হয় পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যের সঙ্গে।

অনবদ্য সৌন্দর্য বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরের গোপুরমগুলিও। শ্রেষ্ঠ প্রতীক ষোড়শ শতাব্দীর নির্মিত গোপুরমের। শোভিত করা হয় তাদের অঙ্গ পদ্মপাতায় আর পদ্মফুলে। রচিত হয় কত কুলুঙ্গি আর অলঙ্কৃত চন্দ্রাতপ, বিরাজ করেন কত দেব-দেবী তাদের মধ্যে।

অপরূপ বিরিঞ্চিপুরমের মার্গসকেশ্বরের মন্দিরের স্তম্ভের অশ্বগুলির গঠন ভঙ্গিমাও, অনুপম সৌন্দর্য বুকে নিয়ে আছে বিচ্ছিন্ন স্তম্ভগুলিও। বিজয় নগরের স্থপতিই নির্মাণ করেন কাঞ্চীপুরমে ভরদ্বাজ স্বামীর মন্দিরে শত স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ। একাম্বরনাথের মন্দিরে নির্মিত হয় সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ। মূর্তি দিয়ে সাজান এই সব স্তম্ভের অঙ্গ, সৃষ্টি করেন এক স্বপ্ন লোক।

নির্মিত হয় তদ্‌পত্রীতে রামেশ্বরমের মন্দিরে তুইটি গোপুরমও, অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য শিল্প-সম্ভার, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিজয় নগরের স্থাপত্যের।

তুলনাহীন কিন্তু তিরুচুরাপল্লীর শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের শেষাগিরির মণ্ডপের অশ্বসভার অশ্বগুলি, শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিজয় নগরের স্থপতির। ন' ফিট উঁচুতে অশ্বগুলি তাদের সামনের পা বিস্তৃত করে আছে, স্থাপিত আছে পিছনের পা স্তম্ভের অঙ্গে। দাঁড়িয়ে আছে বিচিত্র ভঙ্গিতে, জীবন্ত মূর্তিতে, বীরত্বের প্রতীক হয়ে আছে। পরিণত হয়ে আছে শ্রেষ্ঠ অশ্বসভায়, এক গৌরবময় কীর্তিতে, এক সুন্দরতম সৃষ্টিতে। পল্লবদের জান্তব স্থাপত্য পায় সম্পূর্ণ রূপ, মহাবলীপুরমের অঙ্কুর পরিণত হয় মহীরূহে।

৪। নায়কযুগ বা মাতুরাযুগ। ( ১৬০০ খৃষ্টাব্দ )

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তালকোটার যুদ্ধে বিজয় নগরের পতন হয়। অন্তর্হিত হয় তাদের প্রবল প্রতাপ দক্ষিণ ভারতের রঙ্গমঞ্চ থেকে। মাতুরায় আশ্রয় নেয় তামিল সভ্যতা আর সংস্কৃতি, আশ্রয় দেন নায়করা। ছিলেন তাঁরা সামন্ত রাজা বিজয় নগরের অধীনে। তাঁরা রাজধানী স্থাপন করেন মাতুরায়। তিরুমল নায়ক শ্রেষ্ঠ রাজা নায়ক বংশের, অলঙ্কৃত করেন মাতুরার সিংহাসন ১৬২৩ থেকে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এই বংশের। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়স্থানের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের অন্যতম। শোভা পায় মন্দির দক্ষিণ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, নিমিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। দ্রাবিড় স্থাপত্য লাভ করে পূর্ণ আর শেষ পরিণতি, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। সমৃদ্ধিশালী হয় তামিল, বাড়ে পূজার অনুষ্ঠান, পাল-পার্বণ আর উৎসবের সংখ্যা, প্রয়োজন হয় মন্দিরের কলেবর বৃদ্ধির। তাই নায়ক রাজারা প্রথমেই সচেষ্ট হন মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধির কাজে। উঁচু প্রাচীরের পর প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত হয় বড় বড় মন্দির, মূল মন্দিরকে বেষ্টন করে নির্মিত হয় একাধিক আয়তক্ষেত্র উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা প্রাকার। থাকে এক একটি প্রাকারে তু'টি করে প্রবেশ পথ। অপরূপ গোপুরম দিয়ে শোভিত করেন সেই সব প্রবেশ পথ। নির্মিত হয় বাইরের প্রাকারে পূর্ব আর পশ্চিমদিকের প্রধান প্রবেশ পথেও তুইটি করে আকাশচুম্বী গোপুরম, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় শিল্প-সম্ভার। নির্মাণ করেন এই সব প্রাকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির, বিরাজ করেন অন্য

দেবতারা। নির্মিত হয় অপরূপ স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ, সুন্দর মণ্ডপ, অনবদ্য সহস্র স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ আর অশ্বসভা এই সব প্রাঙ্গণের মধ্যে। রচিত হয় অনুপম স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ আর চন্দ্রাতপও। রচিত হয় তোরণ। নির্মিত হয় পূজারীর থাকবার ঘর, জিনিসপত্র রাখবার ঘর, আরও অনেক ঘর। কাটা হয় একটি করে পবিত্র পুষ্করিণী বা টেপাকূলম, আছে তাতে সোপান শ্রেণী, বেষ্টিত হয়ে আছে টেপাকূলম অপরূপ খিলানে আচ্ছাদিত পথ দিয়ে। সুন্দরতম আর বিশালতম হয় দ্রাবিড় মন্দির, হয় মহিমময়।

মূল বিগ্রহ বিরাজ করেন মূল মন্দিরে। সোনা দিয়ে মোড়া এই মন্দিরের শীর্ষদেশ। বাস করেন নিভৃতে মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশে, বেষ্টিত হয়ে থাকেন ক্ষুদ্রতম প্রাকারে। নাই কোন আড়ম্বর এই প্রাকারে, নাই মন্দিরের দেওয়ালেও। সমৃদ্ধিশালী নয় স্থপতির শিল্প-সম্ভারে। কিন্তু মহা পবিত্র এই স্থান।

সাজান মাদুরার নায়ক স্থপতি মন্দিরের বাকি অংশ, শোভিত করেন প্রকৃষ্টতম শিল্প-সম্ভারে। সৃষ্টি হয় এক একটি স্বপ্নলোক। রাজত্ব করেন মন্দিরের এই অংশে সচল দেবতা, অংশ গ্রহণ করেন উৎসবে, রথে চড়ে যান শোভাযাত্রায়, পরিক্রমণ করেন নগর। আছে প্রতিটি মন্দিরে একটি করে রথ, মূল্যবান ভূষণে সজ্জিত সেই রথ।

নায়কদের আমলেই গোপুরম পায় সুন্দরতম রূপ, লাভ করে শেষ পরিণতি, উপনীত হয় উন্নতির চরম শিখরে।

নির্মিত হয় ১৫০ ফিট থেকে ২০০ ফিট উঁচু গোপুরম, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্ভার। শোভা পায় তাদের অঙ্গে কত দেব-দেবী, অনবদ্য তাঁদের গঠন সৌষ্ঠব, আকৃতিতে তাঁরা প্রমাণ মানুষের সমান।

মন্দিরের ভিতরের স্তম্ভই প্রধান বৈশিষ্ট্য নায়কদের মন্দিরের। সংখ্যাতীত এই স্তম্ভ। আছে এক মাদুরার মীনাক্ষীর মন্দিরেই দু'হাজার অপরূপ স্তম্ভ অঙ্গে নিয়ে রাজাদের প্রতিমূর্তি, নানা আকৃতির কল্পিত জন্তু, উড়ন্ত ঘোড়া আর অনবদ্য লতা, পল্লব আর পুষ্পের সম্ভার। নির্মিত এই সব স্তম্ভ বিজয় নগরের স্থপতির অনুকরণে, কিন্তু ক্ষুদ্রতর, নয় তারা বার ফিটের বেশি উঁচু।

মাদুরার স্থপতি নির্মাণ করেন প্রায় তিরিশটি মন্দির, প্রসিদ্ধতম আর সুন্দরতম তাদের মধ্যে মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির আর বসন্ত মণ্ডপম্ পরিচিত তিরুমলাই চৌল্ট্রি নামেও। শ্রেষ্ঠ শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথনের, জম্বুকেশ্বরের, তিরুভারুরের, রামেশ্বরমের, চিদাম্বরমের, টিনেভ্যালির, তিরুভনমালাই-এর আর শ্রীবিল্লপত্তুরের মন্দিরও।

এই সব মন্দিরের মধ্যে একমাত্র মাদুরার সম্পূর্ণ মন্দিরটিই নির্মিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে, বুকে নিয়ে আছে সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতীক। নির্মিত হয় বসন্ত মণ্ডপম্ও ১৬২৬ থেকে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে, নির্মাণ করেন তিরুমলাই নায়ক। প্রতীক হয়ে আছে বসন্ত মণ্ডপম্ও শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের।

নায়কদের বৃহত্তম মন্দির কিন্তু তিরুচুরাপল্লীর নিকটে অবস্থিত শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথনের মন্দির। বৃহত্তম মন্দির দক্ষিণ ভারতেরও। বহুশত বর্ষ ধরে নির্মিত হয় এই মন্দিরটি, তবুও হয় না সমাপ্ত, রয়ে যায় অসম্পূর্ণ অবস্থায়। ক্ষোদিত আছে এই মন্দিরের অঙ্গে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পাণ্ড্য শিলালিপি, আছে চতুর্দশ শতাব্দীর বিজয় নগরের শিলালিপিও। ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁরাই নির্মাণ করেন এই মন্দিরের অশ্বসভা, শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিজয় নগরের স্থপতির। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নায়ক রাজারা তিরুচুরাপল্লীতে স্থাপন করেন দ্বিতীয় রাজধানী, অপরূপ সাজে সাজান এই মন্দিরকে, নির্মাণ করেন কত অপরূপ মণ্ডপ আর স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ, অঙ্গে নিয়ে দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের প্রতীক। কাটা হয় সূর্য আর চন্দ্র পুষ্করিণী, দুই পবিত্র সরোবর। বাড়তে থাকে মন্দিরের কলেবর, শেষে বিস্তৃত হয় এক চতুর্থ স্কোয়ার মাইলেরও উপর পরিধি নিয়ে। আছে এই মন্দিরে একুশটি গোপুরম, আছে একটি অসমাপ্ত অবস্থায়ও, হত যদি সমাপ্ত, উঁচু হত ৩০০ ফিট, উচ্চতম গোপুরম দক্ষিণ ভারতের।

অনবদ্য পরিকল্পনায় আর অপরূপ রূপদানে জম্বুকেশ্বরের মন্দির, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় স্থাপত্যের। অনিন্দ্যসুন্দর এই মন্দিরের কেন্দ্রস্থলের প্রাঙ্গণের পরিকল্পনাও। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দ্রাবিড় স্থপতির।

মহিমময় রামেশ্বরমের মন্দিরের স্তম্ভযুক্ত অলিন্দও। বেষ্টন করে আছে অলিন্দ সম্পূর্ণ মন্দিরকে, সৃষ্টি হয়েছে একটি গমনের পথও, প্রবেশ পথ মন্দিরের।

অনবদ্য এর স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প-সম্ভার, নিদর্শন এক গৌরবময় সৃষ্টির, এক অমর কীর্তির।

বহুশত বর্ষ ধরে নির্মিত হয়েছে চিদাম্বরমের নটরাজনের মন্দিরটিও, অঙ্গে নিয়ে আছে প্রতিটি শতাব্দীর শিল্প-সম্ভার, প্রতীক হয়ে আছে সারা দ্রাবিড়-স্থাপত্যের নিদর্শনের।

দক্ষিণ ভারতের পবিত্রতম মন্দির, দশম খৃষ্টাব্দে নির্মাণ সুরু করেন এই মন্দির রাজারাজ চোল, শ্রেষ্ঠ রাজা চোলবংশের। মন্দিরের অঙ্গে লেখা আছে কিছু অংশ নির্মিত হয় একাদশ শতাব্দীতেও। নিমিত হয় এই মন্দিরের পূর্ব প্রবেশ দ্বারের গোপুরম ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে পার্বতীর মন্দির, উত্তর প্রবেশ পথের গোপুরম ষোড়শ শতাব্দীতে আর সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ সপ্তদশ শতাব্দীতে। অপরূপ এই মন্দিরের সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহের স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প-সম্ভার, নিদর্শন নায়ক স্থপতির চরম উৎকর্ষতার।

অনুরূপ পরিকল্পনায় তিরুভারুরের আর তিরুভনমালাই-এর মন্দির, নিদর্শন পরবর্তী দ্রাবিড় স্থপতির শ্রেষ্ঠ কীর্তির। সুন্দরতম তিরুভারুরের মন্দিরের পূর্ব প্রবেশ পথের শিল্প-সম্ভার। রচিত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড়স্থাপত্যের।

এই যুগের শ্রেষ্ঠতম আর সুন্দরতম নিদর্শন বুকে নিয়ে আছে সুব্রমনিয়ামের মন্দির। নির্মিত হয় এই মন্দির, তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ১২০ ফিট দীর্ঘ আর ৩৫ ফিট প্রস্থ এক পরিধি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি, শীর্ষে নিয়ে আছে ৫৫ ফিট উঁচু চূড়া। অনুপম এই মন্দিরের আর চূড়ার অঙ্গের শিল্প-সম্ভার, অনবদ্য এর অঙ্গের ভাস্কর্য। অপরূপ আলোছায়ার সমন্বয়, পরিচয় এক গৌরবময় সৃষ্টির, শ্রেষ্ঠ কীর্তি এক গৌরবময় যুগের।

মহাবলীপুরমের ( মামাল্লাপুরমের ) সমুদ্র সৈকতের ঋষির ষষ্ঠ শতাব্দীর সম্ভাবনা লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, পায় সম্পূর্ণ রূপ সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে। সফল হয় পল্লব রাজা সিংহ বিষ্ণু আর প্রথম মহেন্দ্র বর্মণের স্বপ্ন। যুদ্ধ বাধে রাজায় রাজায়, যুদ্ধ বাধে পল্লবে চালুক্যে, পল্লবে চোলে,

চোলে পাণ্ড্যয়, যুদ্ধ বাধে চোলে আর রাষ্ট্রকূটে, বাধে রাজ্যের সীমানা নিয়ে, বাধে দক্ষিণ ভারতের প্রভুত্ব নিয়েও। হয় না কোন ক্ষতি সভ্যতার, অক্ষত থাকে দ্রাবিড় সংস্কৃতি। অটুট থাকে তাদের মন্দির, হয় না ম্লান। অলঙ্কৃত করেন সিংহাসন এক এক বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা, সংস্কার করেন মন্দির, নির্মিত হয় নতুন মন্দিরও, বুকে নিয়ে নতুন পরিকল্পনা, নব নব শিল্প সম্ভার। উন্নতির পথে অগ্রসর হয় দ্রাবিড় স্থাপত্য, দ্রাবিড় ভাস্কর্য আর দ্রাবিড় শিল্প। হয় অব্যাহত গতিতে, হয় যুগে যুগে, শেষে পায় সম্পূর্ণ রূপ, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় দ্রাবিড়স্থান, লাভ করে অমরত্ব। গৌরবান্বিত হয় ভারতবর্ষও, পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে।

# তৃতীয় অধ্যায়

## চালুক্যভুম

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### মহীশূর ঃ

### ১। নববৃন্দাবন। ২ সোমনাথ পুরায় কেশবের মন্দির

### ৩। চামুণ্ডার মন্দির

ভোর সাড়ে পাঁচটায় বাঙ্গালোর এক্সপ্রেস বাঙ্গালোর ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে এসে দাঁড়ায়। আমরা জিনিসপত্র নিয়ে নেমে পড়ি প্লাটফর্মে। শীতের হাওয়ায় কাঁপতে থাকে আমাদের সর্বাঙ্গ। সারা মাদ্রাজে আছে তিনটি ঋতু, গরম, গরমতর আর গরমতম। তাই নভেম্বর ডিসেম্বরেও আমাদের সর্বত্র পাখা চালাতে হয়েছে। এইখানেই তার ব্যতিক্রম, না আছে গরম না আছে শীতাধিক্য। ব্যতিক্রম এখানকার শৈল নিবাস উটিতেও। তাই বোধহয় মহীশূরের রাজারা এইখানেই তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেছেন।

বাঙ্গালোরে ভ্রাতা শৈলেনের বন্ধু হাজরা মহাশয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠি। তাঁর ভ্রাতা গাড়ি নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মুগ্ধ হই তাঁদের সৌজন্যে আর আদর যত্নে, সম্ভব শুধু প্রবাসী বাঙালীর দ্বারাই। চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে এখানকার বিজ্ঞান মন্দিরের শিক্ষকতা নিয়ে তিনি প্রথম বাঙ্গালোরে আসেন। এখন একটি রাসায়নিক কারখানার মালিক, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে।

তখন বিলেতে যাওয়ার পথে কলিকাতা থেকে বন্ধুর ছোট ভাইও বাঙ্গালোরে এসেছেন। তিনিও মহীশূর দেখেননি। সেই দিনই বেলা দেড়টায় খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা সকলে তার মোটরে চড়ে মহীশূর অভিমুখে রওনা হই। সেদিন ছিল শনিবার। একমাত্র শনিবারেই আলোকিত করা হয় মহীশূরের নববৃন্দাবন, তাই যেতে হয় সেই দিনই।

একটি আশী মাইল দীর্ঘ রেলপথ বাঙ্গালোরের সঙ্গে মহীশূরকে সংযুক্ত করেছে। তার পাশে পাশে চলেছে একটি সুন্দর পীচের প্রশস্ত রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ি বিদ্যুৎ গতিতে ছোটে।

দু' ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত, প্রসারিত হয়েছে দিগন্তে। মাঝে মাঝে

দাঁড়িয়ে আছে এক একটি চন্দন বৃক্ষ, বৈশিষ্ট্য মহীশূরের। আমরা গাড়ি থেকে নেমে দেখি একটি চন্দনবৃক্ষ। তারপর, আবার গাড়ি পঞ্চাশ মাইল গতিতে চলে।

ষাট মাইল অতিক্রম করবার পর, আমাদের গাড়ি বাঁদিকের রাস্তায় মোড় নেয়। সেই রাস্তায় আরও সাতাশ মাইল গেলে মিলবে শিবসমুদ্রম্। আবার এই সংযোগস্থলে ফিরে এসে পঁয়ত্রিশ মাইল অতিক্রম করলে মহীশূর শহরের প্রান্তদেশে উপনীত হব। শহর পেরিয়ে আরও বারো মাইল গেলে নববৃন্দাবনে পৌছাব। পরিসমাপ্তি হবে আজকের যাত্রার। দর্শন হবে নববৃন্দাবন। পূর্ণ হবে বহুদিনের এক অভিলাষ, যা লুক্কায়িত ছিল মনের মণিকোঠায়।

অন্তর্হিত হয় মনের আনন্দ গাড়ি শিবসমুদ্রমের রাস্তায় প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই। সংস্কার অভাবে শিথিল হয়েছে রাস্তার পীচ, বিচ্ছিন্ন হয়েছে রাস্তার বুক থেকে, হয়েছে বিচূর্ণও, অধিকার করে আছে সমস্ত রাস্তা। দেখে মনে হয় রাস্তা সংস্কারের জন্য খোয়া ঢালা হয়েছে, কিন্তু সময় হয় নাই পেটাবার, পড়ে আছে অসংস্কৃত অবস্থায়। গাড়ির ঝাঁকানিতে ব্যথা হয়ে যায় সর্বাঙ্গ। আশঙ্কা হয়, কখন অমসৃণ পাথরের ঘর্ষণে, এক ভীষণ আর্তনাদ করে ফেটে যাবে টায়ার, বন্ধ হবে গাড়ির গতি। সবাইকে পথের মাঝে পড়ে থাকতে হবে। থাকবে না কেউ সাহায্য করবার। এক অজানা আতঙ্কে ছেয়ে ফেলে অন্তঃকরণ। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ঠিক এইরকমই একটি রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করেছিলাম আসাম প্রান্তে। মাকুম থেকে ডিগবয় হয়ে লেডোতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে ছিল জীপ, কষ্টছিল আরও বেশী, কিন্তু ভয় ছিল না গাড়ীর গতি রুদ্ধ হওয়ার, আশঙ্কা ছিল না মাঝ রাস্তায় আটকে থাকার। শেষ পর্যন্ত গাড়ি অচল হয় না, কিন্তু প্রশমিত হয় তার গতি। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে শিবসমুদ্রমে পৌছাই।

দূর থেকে দেখে সমুদ্র বলেই মনে হয়। তাই বুঝি শিবসমুদ্রম্ নামে পরিচিত। একটি বৃহৎ জলপ্রপাত এই শিবসমুদ্রম্, পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে স্তরে স্তরে নেমে এসেছে। এসেছে সর্পিল গতিতে, বর্ধিত হয়েছে গতি আর বিস্তৃতি যত এসেছে নীচের দিকে। বেড়েছে গর্জনও। সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ের উপত্যকায় এক বিশাল নিস্তরঙ্গ জলাশয়, পরিচিত সমুদ্র নামে।

এইখানেই এর অন্য প্রপাতের সঙ্গে পার্থক্য, প্রভেদ শিলঙের, বিশপ আর বিডনের সঙ্গে, চেরাপুঞ্জির মুস্‌মাই-এর আর দার্জিলিং-এর পাগ্‌লা ঝোরার সঙ্গেও। তাদের আছে গতি, আছে স্ফীতিও, কিন্তু নাই এই বিশালতা, নাই রূপ নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের।

শিলঙের মতই এখানেও একটি বিরাট জল বিদ্যুতের কারখানা বসান হয়েছে। নীচে যাওয়ার জন্য আছে একটি চলমান বিদ্যুতের সিঁড়ি। তার উপরে বসে বোতাম টিপে দিলেই সবসুদ্ধ নীচে গিয়ে হাজির হয়। আবার বোতাম টিপেই উপরে উঠিয়ে আনা হয়। শিলঙের মত যেতে হয় না পদব্রজে। তাই নাই কোন কষ্ট যাতায়াতের, হয় সহজ আর সুন্দর।

এইখানেই পুণ্যতোয়া কাবেরী জন্ম নিয়েছেন। এখানকার জল নিয়ে গিয়েই মহীশূরের সুযোগ্য মন্ত্রী স্যার মীর্জা ইস্‌মাইল মহীশূরে এক সুবৃহৎ 'এ্যানিকাট' নির্মাণ করেছেন। খালকেটে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে মহীশূর রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। উর্বরা হয়েছে তার জমি, হয়েছে শস্য-শ্যামল। আর সেই এ্যানিকাটের বুকের উপর তৈরী হয়েছে নববৃন্দাবন ( বৃন্দাবন গার্ডেনস্‌ ) আধুনিক বিজ্ঞানের এক সুন্দরতম দান, প্রতীক এক অলৌকিক সৃষ্টির। সমৃদ্ধিশালী হয়েছে মহীশূর শিল্পে, বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়েছে মহীশূরের নগর, গ্রাম। আছে আরও একটি বিদ্যুৎ তৈরীর কারখানা মহীশূরে, পেয়েছে অগ্রণীর আসন ভারতে।

প্রপাতের ঠিক বিপরীত দিকে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর গিয়ে বসি। বসে দেখতে থাকি তার অপরূপ রূপ। রাশি রাশি সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে প্রকৃতি একেবারে সৌন্দর্যের লীলা নিকেতনে পরিণত করেছেন এই শিব-সমুদ্রম্‌কে। সম্মুখে নীলগিরির পর্বতমালা, দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। পদতলে শিবসমুদ্রমের বিস্তীর্ণ জলরাশি, নিথর, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ। পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে ছুটে আসছে প্রপাত লক্ষ শত ধারায়। শোনা যায় তার গর্জন, কানে আসে তার অন্তরের ধ্বনি। মনে হয় সেই নির্জন পরিবেশে কানে ভেসে আসে অসীমের সুর। ছেড়ে যেতে চায় না মন। এক মধুর আবেশে শিথিল হয়ে আসে অঙ্গ। বুঝি এখানেই পরিসমাপ্তি হবে সব চাওয়ার সব পাওয়ার।

ভেঙ্গে যায় সে আবেশ। স্বপ্ন যায় ছুটে ভাই-এর ডাকে। উঠতে হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও। দেখতে হবে নববৃন্দাবন। ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়ে উঠি। গাড়ি আবার সেই প্রাণঘাতী রাস্তায় ছোটে।

কমতি হয়েছে হাতের সময়ের। তাই প্রতিযোগিতা হয় সময়ে আর গাড়ির গতিতে। নিবদ্ধ হয় দৃষ্টি ঘড়ির কাঁটায় আর অপস্রিয়মান মাইল পোষ্টে। পশ্চাতে ফেলে যাই একে একে কত গ্রাম, কত শহর, কত কলকারখানা। দেখতে দেখতে নিভে যায় দিনের আলো। জ্বলে ওঠে বিদ্যুতের আলো কখনও দূরে, কখনও কাছে।

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে রাত্রির অন্ধকার। কিন্তু চিহ্ন নাই মহীশূর শহরের, দেখা যায় না শ্রীরঙ্গপট্টমও। ক্রমে লুপ্ত হতে থাকে নববৃন্দাবন দেখবার সম্ভাবনা, অন্তর্হিত হয় আশা। মনে হয় ব্যর্থ হবে যাত্রা, সার হবে শুধু কষ্টের। হতাশায় পরিপূর্ণ হয় মন।

হঠাৎ দূরে ভেসে ওঠে আলোর মালা। ড্রাইভার বলে ঐ দেখা যায় চামুণ্ডা পাহাড়ের আলো। মহীশূরের রাজা বিদ্যুতের আলো দিয়ে পাহাড়কে সাজিয়েছেন, অলঙ্কৃত করেছেন তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। তার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছেন আলোর মালা। উজ্জ্বলতর আলো দিয়ে সাজিয়েছেন পাহাড়ের শীর্ষদেশ। দূর থেকে মনে হয় পাহাড়ের শিরে শোভা পায় এক আলোর মুকুট। কণ্ঠে শোভা পায় মালা, শিরে মুকুট। কি অপরূপ সমন্বয়। সৃষ্টি হয় এক অলোকসামান্য পরিবেশ। দেখি মুগ্ধ হয়ে চামুণ্ডার এই অপরূপ রূপ। দেখি বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে। দেখি স্তব্ধ হয়ে। ভাবি সার্থক মহীশূরে আসা।

গাড়ি নক্ষত্রবেগে এগুতে থাকে, স্পষ্টতর হতে থাকে চামুণ্ডার আলোও। আমরা কাবেরীর সেতু অতিক্রম করে শ্রীরঙ্গপত্তনমে উপনীত হই। দেখতে দেখতে একটি মোড় নিয়ে আমাদের মোটর মহীশূর শহরে প্রবেশ করে।

বিস্মিত হই রাস্তার রূপ দেখেও। যেমন প্রশস্ত, তেমনই মসৃণ এই রাস্তাগুলি, বুকে নিয়ে আছে অতি সুন্দর আলোর পোষ্ট। স্কন্ধে নিয়ে আছে আলোর পোষ্ট দুই বা ততোধিক বৃত্ত। সুন্দর রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলিও। রচিত হয় এক স্বপ্নপুরী।

অবশেষে আমাদের গাড়ি নববৃন্দাবনের সুউচ্চ প্রবেশ পথের সামনে এসে দাঁড়ায়। অঙ্গে নিয়ে আছে এই প্রবেশ পথটি মোগল স্থপতির প্রতীক।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে দ্বার অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করি। মুগ্ধ বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাই দেখে তার অপরূপ রূপ। এত মর্ত্যভূমি নয়, নয় এ ব্রজধামে ষোল শ' গোপিনী সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা। এ যে স্বর্গপুরী, ইন্দ্রলোক।

কাবেরীর জল নিয়ে এসে রচিত হয়েছে একটি ড্যাম। ড্যামের বুকে একটি এ্যানিকাট। তার বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি বৃহৎ সেতু। সেতুর ফাঁক দিয়ে অমিতবেগে অতিক্রম করে জল, দিগন্তে গিয়ে মিশে রূপ ধারণ করে সাগরের। তাই পরিচিত কৃষ্ণসাগর নামে। মহীশূরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ই নির্মাণ করেন এই ড্যাম। নির্মিত হয় স্যার মীর্জা ইস্‌মাইলের প্রচেষ্টায়।

অপর পারে, ড্যামের কিনারা দিয়ে রচিত হয়েছে একটি সরু কন্‌ক্রীটের রাস্তা, পৌঁছেছে গিয়ে একটি স্বর্গোদ্যানে, পরিচিত বৃন্দাবন গার্ডেন্‌স্ বা নববৃন্দাবন নামে। আছে এই উদ্যানে তিনটি স্তর। উচ্চতম স্তরে নির্মিত হয়েছে এক রমণীয় শ্বেতপাথরের নাট মন্দির। নির্মিত এই নাটমন্দিরটিও মোগল পদ্ধতিতে, তার শিরে শোভা পায় চারটি 'কুপলা'। মন্দিরের এক প্রান্তে বেদীর উপর বিরাজ করেন রাধা-কৃষ্ণ। অপরূপ তাঁদের মূর্তি, দেখে মুগ্ধ হয় নয়ন। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুটি অতিকায় ফোয়ারা। মন্দিরকে বেষ্টন করে আছে একটি সুন্দর শ্বেতপাথরের অলিন্দ, বেষ্টিত হয়ে আছে অলিন্দটির তিন দিক শ্বেতপাথরের জালির প্রাচীরে।

বৃহত্তর দ্বিতীয় স্তরটিও বেষ্টিত হয়ে আছে সারি সারি ফোয়ারা আর নয়নাভিরাম বৃক্ষ দিয়ে। তার প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে আছে দুটি অতিকায় ফোয়ারা।

বৃহত্তম কিন্তু তৃতীয় স্তরটি, রচিত হয়েছে তার বুকে একটি ত্রিভুজাকৃতি সরোবর, অনুরূপ ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সালিমারবাগের। শোভা পায় তার দু'পাশে ত্রিভুজাকৃতি ক্ষুদ্র বৃক্ষ, দাঁড়িয়ে আছে দূরত্বের সমতা বজায় রেখে। রচিত হয়েছে তিন সারিতে সারি সারি ফোয়ারা এই সরোবরের বুকেও।

শ্বেতপাথরের জালির প্রাচীরে বেষ্টিত হয়ে আছে সরোবরের প্রান্তদেশও। রচিত হয়েছে সারি সারি ফোয়ারা সেতুর উপর, তার অঙ্গে আর উদ্যানের প্রান্তদেশেও। বিভিন্ন তাদের আকার। ড্যামের জলের বুকে শোভা পায় পদ্মফুল।

বিদ্যুতের বাল্ব পরান হয়েছে ফোয়ারার অঙ্গে, হয়েছে পদ্মফুলের বুকেও। বিভিন্ন তাদের রং। মুক্ত হয় ফোয়ারার মুখ, নির্গত হয় জল সহস্র ধারায়। জ্বালান হয় বিদ্যুতের আলোও, আলোয় আলোকিত হয় চারিদিক। দিগন্ত হয় উদ্ভাসিত। বিচ্ছুরিত হয় নানা বর্ণের ছটা ফোয়ারার অঙ্গ থেকে। সাদা লাল নীল বেগুনে হলদে। স্বরু হয় অপ্সরার নৃত্য। সেজে এসেছেন তাঁরা নানাবর্ণের সাজে। দ্বিতীয় স্তরের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে পরিচালনা করেন সেই নৃত্য উর্বশী আর মেনকা। মন্দিরে বসে শচীদেবীকে পাশে নিয়ে দেখেন দেবরাজ ইন্দ্র।

আমরা দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে সেতুর এপার থেকে। সেতু অতিক্রম করে উপনীত হই অপর পারে। এ্যানিকাটের কিনারা দিয়ে প্রবেশ করি উদ্যানে। যাই নাটমন্দিরে, সেখান থেকে দ্বিতীয় স্তরে। দ্বিতীয় স্তর থেকে সরোবরের ধার দিয়ে উপনীত হই একেবারে প্রান্তদেশে। ফিরে এসে প্রথম স্তরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি সমস্ত পরিবেশটি, যত দেখি, বিস্ময় বাড়ে তত। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকি সুরসভায় অপ্সরার নৃত্য, অপরূপ তাদের ছন্দ, নিখুঁত তাদের তাল। অনবদ্য তাদের বেশ।

এমন সময় বেজে ওঠে দশটার ঘণ্টা, নিভে যায় আলো, থেমে যায় অপ্সরার নৃত্য। তাদের ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয় কোন যাদুকরের কঠিন রূপোর কাঠির স্পর্শে। অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে ইন্দ্রলোক, নিস্তব্ধ হয় সভা, পরিয়ে দেওয়া হয় একটি কালো পর্দার অবগুণ্ঠণ। পতন হয় যবনিকা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি, দশটার ঘণ্টার কর্কশ শব্দে টুটে যায় সে স্বপ্ন। ফিরে আসি বাস্তবে।

সামান্য যা আলো ছিল তার সাহায্যে কোন রকমে উদ্যান থেকে বেরিয়ে এসে মোটরে উঠে বসি। স্থান সংগ্রহ করি ষ্টেশনের সংলগ্ন একটি হোটেলে।

২

মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে, খৃষ্টের জন্মের দু'শ ষাট বছর আগে মৌর্য সাম্রাজ্য মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অস্তমিত হয় মৌর্য ক্ষমতা। মহীশূর, উড়িষ্যার রাজা চেতবংশের খারবেলের অধিকারে আসে। দাক্ষিণাত্যে মহাপরাক্রমশালী হ্‌ন সাতবাহন বা অন্ধ্রেরা, মহীশূর সাতবাহনদের অধিকারে আসে। পতন হয় সাতবাহনদের, গঙ্গরাজারা অধিকার করেন মহীশূর। ৫৫০ খৃষ্টাব্দে বাতাপির চালুক্যবংশের প্রথম পুলকেশী স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য দাক্ষিণাত্যে। প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁদের রাজধানী বিজাপুরের কাছে বাতাপি বা বাদামি নগরে। তাঁর পুত্র কীর্তি বর্মণ অধিকার করেন কানাড়া আর কোঙ্কন, বাড়ে রাজ্যের সীমানা। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ রাজা ভারতেরও। অলঙ্কৃত করেন সিংহাসন ৬০৯ থেকে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি পরাজিত করেন উত্তর কানাড়ার কদম্বরাজা, মহীশূরের গঙ্গরাজা আর কোঙ্কনের মৌর্যরাজাকে। পরাজয় স্বীকার করতে হয় কাঞ্চীর পল্লব রাজা মহেন্দ্র বর্মণকে, হয় চোল কেরল আর পাণ্ড্যদেরও। তাঁর অনুগত হন দক্ষিণ গুজরাট আর মালবের অধিবাসীরা। বশ্যতা স্বীকার করেন কলিঙ্গ আর মহাকোশল। ব্যাহত হয় মহারাজ হর্ষবর্ধনের আক্রমণ, তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয় দাক্ষিণাত্য বিজয়ের আশা। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা উত্তরে নাসিক থেকে পূর্বে কৃষ্ণা ও গোদাবরী পর্যন্ত। দক্ষিণে কাবেরীর তীর পর্যন্ত। বিস্তৃত হয় আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। স্থাপিত হয় দ্বিতীয় রাজধানী বেঙ্গীতে আর তৃতীয় নাসিকে। তিনি দূত পাঠান পারস্য রাজা খসরুর রাজসভায়। চীন পরিব্রাজক হুয়ান চোয়াঙ ৬৪০ খৃষ্টাব্দে পরিদর্শন করেন নাসিকে তাঁর রাজসভা। আইহলের শিলালিপিতে লেখা আছে তাঁর বিজয়ের কাহিনী।

৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পল্লবরাজা বীরশ্রেষ্ঠ নরসিংহ বর্মণের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। রাজধানী বাদামি আসে পল্লবের অধিকারে। রুদ্ধ হয় তাঁর বিজয়ের অভিযান।

তাঁর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পরাজিত করেন পল্লবরাজা নরসিংহ বর্মণকে

৬৫৫ খৃষ্টাব্দে। অধিকার করেন পিতৃসিংহাসন। কাঞ্চীপুরমও তাঁর অধিকারে আসে। তিনি পরাজিত করেন চোল, কেরল আর পাণ্ড্য রাজাদের, হন দক্ষিণ ভারতের সার্বভৌম সম্রাট। আবার প্রতিষ্ঠিত হয় চালুক্য ক্ষমতা দক্ষিণ-ভারতে।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য শেষ পরাক্রমশালী রাজা এই বংশের। অলঙ্কৃত করেন বাদামির সিংহাসন ৭৩৩ থেকে ৭৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি পল্লব রাজাকে পরাজিত করে কাঞ্চীর সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন পাণ্ড্য ও চোল রাজারা আর মালাবারের অধিবাসীরা। ব্যহত করেন সিন্ধু বিজেতা আরবদের গুজরাট আক্রমণ। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সামরিক খ্যাতি। তিনিই রাজধানী বাদামিতে নির্মাণ করেন বিরুপাক্ষের মন্দির। সমপর্যায়ে পড়ে কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথের মন্দিরের।

রাষ্ট্রকূটেরা প্রবল হন দক্ষিণ ভারতে। দন্তিদুর্গ স্থাপন করেন এই বংশ। তিনি ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে শেষ চালুক্য রাজা কীর্তি বর্মণকে পরাজিত ও নিহত করে চালুক্য সিংহাসন অধিকার করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রকূট ক্ষমতা দক্ষিণ-ভারতে। অন্তর্হিত হয় চালুক্য প্রাধান্য, লুপ্ত হয় তাঁদের স্বাধীনতা। মান্যখেটে স্থাপিত হয় রাষ্ট্রকূট রাজধানী। উদ্ভূত, মহাভারতে বর্ণিত যদুবংশ থেকে, তাঁরা ছিলেন তেলেগু কৃষিজীবী। দু'শ বছরেরও বেশী দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করেন। দন্তিদুর্গের ভাই প্রথম কৃষ্ণ ৭৬৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনিই এলোরাতে পাহাড় কেটে নির্মাণ করেন কৈলাসের মন্দির, ভারতের শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির। মহিমময় পরিকল্পনায়, অনবদ্য শিল্প-সম্ভারে, বুকে নিয়ে আছে কৈলাস শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় সৃষ্টির, এক অমর কীর্তির। অমর হন প্রথম কৃষ্ণ। অমর হয় এলোরা। ধ্রুব, অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, ৭৭৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি গঙ্গরাজাকে পরাজিত করেন। মহীশূর রাষ্ট্রকূটের অবিকারে আসে। তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে হয় কাঞ্চীর পল্লব রাজাকেও। পরাজিত হন গুর্জর, প্রতিহাররাজ, বৎসরাজাও। তিনি রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় নেন। গৌড়াধিপতি ধর্মপালকেও নতি স্বীকার করতে হয়।

৭৯৩ থেকে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় গোবিন্দ সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, তিনি মহীশূরের বিদ্রোহ দমন করেন। পরাজিত করেন প্রতিহারের রাজা নাগভট্টকে। বাংলার ধর্মপাল আর কনৌজের রাজা চক্রায়ূধ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা উত্তরে বিন্ধ্য পর্বত থেকে দক্ষিণে কাঞ্চী পর্যন্ত। রাজত্ব করেন একে একে প্রথম অমোঘ বর্ষ, দ্বিতীয় ইন্দ্র ও আরও অনেক রাজা। কীর্তিহীন তাঁরা। ৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন তৃতীয় কৃষ্ণ, শেষ পরাক্রমশালী রাজা এই বংশের। তিনি অধিকার করেন কালাঞ্জর আর চিত্রকূট। পরাজিত হন পল্লব, পাণ্ড্য আর চোল রাজাও। বশ্যতা স্বীকার করেন সিংহলের রাজা।

হীনবল হন রাষ্ট্রকূটেরা তৃতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর থেকে। শেষে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হন কক্ক, শেষ রাজা এই বংশের, চালুক্য তৈলপের হাতে। ফিরে আসে চালুক্যদের ক্ষমতা দাক্ষিণাত্যে। কল্যানে স্থাপিত হয় তাঁদের রাজধানী। তাঁরা খ্যাতিলাভ করেন পরবর্তী চালুক্য বা কল্যানের চালুক্য নামে।

সোমেশ্বরের পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ১০৭৬ থেকে ১১২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, পরাজিত করেন চোল রাজা রাজেন্দ্র কুলোতুঙ্গকে। অধিকার করেন বাংলার কিছু অংশ। বিক্রমাদিত্য চরিত প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি বিহ্লন আর মিতাক্ষরা রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে চালুক্য ক্ষমতা একেবারে অন্তর্হিত হয়। স্থাপিত হয় তিনটি স্বাধীনরাজ্য। দেবগিরি বা দৌলতাবাদে যাদবরাজ্য, অন্ধ্রে বরঙ্গলে কাকতিয় রাজ্য, আর দ্বার সমুদ্রে বা দ্বারাবতী পুরাতে হোয়সল রাজ্য।

সামন্ত রাজার রূপ নিয়ে হোয়সলরা দক্ষিণ ভারতের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। নিযুক্ত হন প্রথমে চোলের অধীনে, পরে কল্যানের চালুক্য রাজাদের। শেষে বিত্তিগ্ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মহীশূর প্রদেশে স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য। দ্বারসমুদ্রে, বর্তমান হলেবিদে স্থাপিত হয় তাঁর রাজধানী। তিনি আচার্য শ্রেষ্ঠ রামানুজের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন, পরিচিত হন বিষ্ণুবর্ধন নামে। পরাজিত করেন চের, চোল আর পাণ্ড্যদের। বাড়ে রাজ্যের

সীমানা। ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর পৌত্র দ্বিতীয় বীর বল্লাল সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহাপরাক্রমশালী তিনি, পরাজিত করেন দেবগিরির যাদব রাজাকে। পরাজিত হন দক্ষিণ ভারতের আরও অনেক রাজা। বিস্তৃত হয় হোয়সল ক্ষমতা, হোয়সল গৌরব দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে।

শোভিত করেন যখন পল্লবেরা আর চোলেরা দ্রাবিড়স্থানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিশাল মন্দির দিয়ে, নির্মিত হয় মন্দির, গোপুরম, সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ আর অলিন্দ কাঞ্চীপুরমে, চিদাম্বরমে, তাঞ্জোরে আর শ্রীরঙ্গমে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্ভার, সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় স্থপতির, নিদর্শন চরম উৎকর্ষের, এক গৌরবময় যুগের, মন্দির দিয়ে সাজান রাষ্ট্রকূট আর চালুক্য রাজারও তাঁদের রাজধানীকে আর নগরকে। নির্মিত হয় মন্দির বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ চালুক্য শিল্প-সম্পদ, অনবদ্য আর সুন্দরতম ভাস্কর্যের নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় সৃষ্টির। নির্মিত হয় মন্দির আইহোলে, পট্টদকলে, ধারোয়ারে, ইতাগিতে, লাকুন্দিতে হয় রাজধানী বাদামিতেও। নির্মিত হয় বরঙ্গলে এক কীর্তি স্তম্ভ। বুকে নিয়ে আছে এইসব মন্দির আর কীর্তি স্তম্ভ শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চালুক্য স্থপতির, নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের।

বাদ যান না মহীশূরের হোয়সল রাজারাও। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরাও, নির্মাণ করেন অপরূপ মন্দির রাজধানী দ্বারসমুদ্রে আর বেলুড়ে। নির্মিত হয় সোমনাথ পুরাতেও। বুকে নিয়ে আছে এইসব মন্দির শ্রেষ্ঠ হোয়সল স্থাপত্যের নিদর্শন, নিদর্শন ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের। প্রতীক এক অনুপম সৃষ্টির, এক গৌরবময় যুগের, এক অমর কীর্তির।

১৩১০ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুরের হাতে পরাজিত হন হোয়সল রাজা তৃতীয় বীর বল্লাল। পরাজিত হন একে একে দেবগিরির যাদব রামচন্দ্রদেব আর বরঙ্গলের কাকতীয় প্রতাপ রুদ্রদেব। বিজাপুর, বিদর, কুলবর্গা আর হায়দারাবাদ মুসলমানের অধিকারে আসে। আসে সারা চালুক্য ভূমি। ধ্বংসের লীলা সঙ্গে নিয়ে আসে মুসলমান বিজেতা। ধ্বংসে পরিণত হয় অসংখ্য অনবদ্য মন্দির, বুকে নিয়ে সুন্দরতম স্থাপত্যের নিদর্শন। লুপ্ত হয় একে একে পৃথিবীর বুক থেকে কত অমূল্য সম্পদ, কত অপূর্ব কীর্তি, কত গৌরবময় সৃষ্টি,

কত বহু সহস্র বৎসরের সাধনার দান, কত চালুক্য আর হোয়সল স্থপতির চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। অন্তর্হিত হয়ে যায় একেবারে।

১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে হোয়সল রাজা বিরূপাক্ষের মৃত্যু হয়। মহীশূর আসে বিজয় নগরের অধিকারে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে আবার রাজা উদিয়ার হন মহীশূরের স্বাধীন নৃপতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। চক্রান্তে আর ষড়যন্ত্রে ছেয়ে ফেলে ভারতের আকাশ বাতাস। একদিন এক প্রতিভাদীপ্ত যুবক মহীশূরের প্রধান সেনাপতি নান্‌রাজার কাছে এসে সৈনিকের পদ প্রার্থনা করেন। তিনি রাজী হন। সৈনিকের পদে নিযুক্ত হন হায়দার আলী। ক্রমে মহা-পরাক্রমশালী হন হায়দার। অধিকার করেন মহীশূরের সিংহাসন। বিতাড়িত হন নান্‌রাজ, বিতাড়িত হন মহীশূরের হিন্দুরাজাও। হায়দার জয় করেন বেদ্‌নোর, স্থন্দা, কানাড়া আর গুটি। বাড়ে মহীশূরের রাজ্যের সীমানা। কিন্তু সহ্য হয় না হায়দারাবাদের নিজামের আর মারাঠাদের। হয় না ইংরাজেরও, তাঁরা তখন মসী ছেড়ে অসি ধরেছেন, বাণিজ্য ছেড়ে রাজ্য পত্তন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ বাধে। হায়দার জয় করেন মাঙ্গালোর। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হয় হায়দারে, ইংরাজে, নিজামে আর মারাঠায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই দুরন্ত ক্যানসার রোগে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে হায়দারের মৃত্যু হয়।

তাঁর পুত্র টিপু মহীশূরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তৃতীয় বার যুদ্ধ হয় মহীশূরে আর ইংরাজে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে। পরাজয় স্বীকার করতে হয় টিপুকে, ছেড়ে দিতে হয় অর্ধেক রাজত্ব মারাঠাকে আর নিজামকে। দিতে হয় তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি পূরণও। আবার চতুর্থবার যুদ্ধ বাধে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তন থেকে ৪৫ মাইল দূরে সিদিয়ার মাঠে। মারাঠা, নিজাম আর ইংরাজের সম্মিলিত শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় টিপুকে। আশ্রয় নেন এসে তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গে। আক্রমিত হন সেখানেও। দুর্গ রক্ষার জন্য অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। অকালে পরিসমাপ্তি হয় এক বীরশ্রেষ্ঠের, অবসান হয় মহীশূরের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের।

তিন ভাগে ভাগ হয় মহীশূর রাজ্য। ইংরাজ অধিকার করেন কানাড়া, কৈম্বাটুর আর পশ্চিম উপকূলের জেলাগুলি। উত্তর পশ্চিমাংশ লাভ করেন

নিজাম। ইংরাজের অধীনে আরোহণ করেন মহীশূরের সিংহাসনে প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের এক বালক। নির্বাসিত হন টিপুর পরিবারবর্গ। প্রথমে ভেলোরে, সেখান থেকে কলিকাতায়।

মহা প্রগতিশীল মহীশূরের রাজারা, অগ্রণী প্রজার কল্যাণে আর রাজ্যের মঙ্গলে। সাজান মহীশূরকে অপরূপ রাজপ্রাসাদে আর বৃহৎ অট্টালিকায়। নয়নাভিরাম রাজপথে শোভিত হয় মহীশূর শহর। পরিণত হয় মহীশূর ভারতের সুন্দরতম নগরীতে। নির্মিত হয় ললিতমহল, জগমোহনের রাজ-প্রাসাদ, ঠাণ্ডা সড়ক, ডালি এ্যাভিনিউ। নির্মাণ করেন বৃন্দাবন গার্ডেন্স্। কৃষ্ণ সাগরের জলে মহীশূর হয় শস্য শ্যামল। শিবসমুদ্রম্ আর যোগেশ্বরীর বিদ্যুতে আলোয় আলোকিত হয় মহীশূরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। গড়ে ওঠে কত অসংখ্য শিল্পালয়। সমৃদ্ধিশালী হয় মহীশূর। সুখের আর স্বচ্ছন্দের হয় মহীশূরবাসীর জীবন।

পরের দিন ভোরে উঠে সোমনাথ পুরাতে কেশবের মন্দির দেখতে যাই। মন্দিরে প্রবেশ পথের তোরণের অঙ্গে কানেরিজে লেখা আছে—হোয়সল রাজা তৃতীয় নরসিংহের নিকটতম আত্মীয় সোমনাথ, মহীশূর থেকে একত্রিশ মাইল দূরে পুণ্যতোয়া কাবেরী তীরে প্রতিষ্ঠা করেন এই গ্রাম। সেখানে ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ হোয়সল স্থপতি জকনাচারি নির্মাণ করেন এই মন্দির, অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হোয়সল স্থাপত্যের। তিনিই নির্মাণ করেন বেলুড়ের আর দ্বারসমুদ্রের মন্দির।

একটি ২১০ ফিট দীর্ঘ আর ১৭২ ফিট প্রস্থ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে একটি দু' ফিট উঁচু মঞ্চের উপর মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। একটি উন্মুক্ত বারান্দা প্রাঙ্গণটিকে বেষ্টন করে আছে। আছে তাতে চৌষট্টি প্রকোষ্ঠ। পৃষ্ঠে নিয়ে আছে চারিটি হাতী, মঞ্চটির চার কোণ। মঞ্চে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কত হাতী, কত দেব-দেবী, কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

এই মন্দিরে তিনটি প্রকোষ্ঠ আছে। কেন্দ্রস্থলে পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রধান প্রকোষ্ঠটি অন্য দু'টি উত্তর আর দক্ষিণ মুখী হয়ে। তাদের শীর্ষদেশে নির্মিত হয়েছে তিনটি বত্রিশ ফিট উঁচু অপরূপ চূড়া, অনুরূপ গঠনে অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প-সম্ভারে। সংযুক্ত হয়েছে তিনটি প্রকোষ্ঠ

কেন্দ্রস্থলের মণ্ডপের সঙ্গে। মিশেছে এসে মণ্ডপটি সম্মুখের মুখ্য মণ্ডপের সঙ্গে। সাজান স্থপতি এই চূড়া তিনটির অঙ্গ অনবদ্য শিল্প-সম্ভারে, পরিণত করেন এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণে। বিস্মিত হই দেখে।

প্রবেশ পথটির দু'দিক থেকে স্থরু করে মুখ্য মণ্ডপটিকে বেষ্টন করে আছে একটি গরাদযুক্ত প্রাচীর বা জগতি। সাতটি থাকে বিভক্ত এই প্রাচীরের অঙ্গ। আছে এক এক সারিতে হাতীর মূর্তি, মূতি আছে ঘোড়-সওয়ারের আর বুরুজের। আছে সিংহের মূর্তিও। মূর্তি দিয়ে বর্ণিত হয়েছে রামায়ণ আর মহাভারতের গল্প। কাহিনী রচিত হয়েছে হিরণ্যকশিপুরও। গরাদ-যুক্ত প্রাচীরের প্রান্তদেশে ক্ষোদিত হয়েছে এক সারি মূর্তি, দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন ভূষণে সজ্জিত চন্দ্রাতপের নীচে। আছে মন্দিরের বাকী অংশেও।

তাদের নীচে শোভা পায় ছয় সারি মূর্তি। প্রথম চারিটি অনুরূপ প্রাচীরের অঙ্গের মূর্তির। বাকি দুই সারিতে রাজহংসের আর মকরের মূর্তি। তার উপরে রচিত হয় কানিস, তার উপর বুরুজ।

বৃহৎ মূর্তির সারিতে আছেন বিষ্ণু, আছেন নরসিংহ আর বরাহ। আছেন আশিটি দেবতা আর একশ' চোদ্দটি দেবী। নারায়ণ আর লক্ষ্মীকে কাঁধে নিয়ে আছেন গরুড়। ঐরাবতের পৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র শচীদেবীকে পাশে নিয়ে বসে আছেন। নৃত্যের ছন্দে দাঁড়িয়ে আছেন লক্ষ্মী আর সরস্বতী। নৃত্য করেন বিষ্ণু আর গণপতি। চতুর্থ সারিতে দক্ষিণের প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে আছে রামায়ণের গল্প, পশ্চিমের প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে ভাগবতের গল্প আর উত্তরের দেওয়ালে মহাভারতের কাহিনী। যেমন অপরূপ তাদের পরিকল্পনা তেমনই অনবদ্য রূপদান।

প্রতিটি প্রকোষ্ঠেই একটি করে গর্ভ গৃহ আর স্থখনাশি আছে। কেন্দ্রস্থলের প্রকোষ্ঠে বিরাজ করেন কেশব। গর্ভগৃহের প্রবেশ পথের দরজার উপর শোভা করে আছে একটি বিষ্ণু মূর্তি, তার নীচে লক্ষ্মী নারায়ণের মূর্তি। স্থখনাশির প্রবেশপথে পরবাস্থদেবের মূর্ত, তার নীচে কেশবের। দরজার অঙ্গে দুই দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছেন।

উত্তরের প্রকোষ্ঠে জনার্দন বিরাজ করেন। একটি দেড় ফিট উঁচু বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছেন ছ'ফিট্ উঁচু শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী জনার্দন। বিস্তার

করে আছেন প্রভা, তার ভিতর শোভা পায় দশ অবতারের মূর্তি। অপরূপ এই মূর্তি, দেখে হয় না পরিতৃপ্তি। দরজার উপর বসে আছেন বিষ্ণু, তাঁর নীচে এক চতুর্মুখ। সুখনাশির প্রবেশ পথে লক্ষ্মী আর নরসিংহ। তার নীচে প্রিয়া সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণু।

দক্ষিণের প্রকোষ্ঠে কদম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন দেড় ফিট উঁচু বেদীর উপর ছ'ফিট উঁচু ভেনু গোপাল, হাতে নিয়ে বাঁশী, দাঁড়িয়ে আছেন বঙ্কিম ঠামে। অনবদ্য এই মূর্তিটিও। দক্ষিণে নিম্নতম প্রদেশে দাঁড়িয়ে আছে রাখালের দল, তাদের উপরে গরুর পাল। তারা শোনে সেই বাঁশীর সুর। যুক্তকরে তাদের উপরে বসে আছেন কত মুনি। প্রভার ভিতর শোভা পায় দশ অবতারের মূর্তি। গর্ভ গৃহের দরজার উপর এক নারী মূর্তি, তার নীচে বিষ্ণু, হাতে নিয়ে শঙ্খচক্র, ফল আর জলের কলসি। সুখনাশির দরজায় লক্ষ্মী-নারায়ণ, তার নীচে বিষ্ণু। যেমন অপরূপ পরিকল্পনা তেমনই অনবদ্য রূপদান। প্রতীক হোয়সল স্থপতির শ্রেষ্ঠ কীর্তির, নিদর্শন এক গৌরবময় সৃষ্টির। দেখি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে, দেখে স্তম্ভিত হই। শ্রদ্ধা জানাই শিল্পীদের। সঙ্গে করে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়।

৩

মহীশূরে ফিরে এসে চামুণ্ডার মন্দির দেখতে যাই। দু'পাশে ঘন জঙ্গল আর লতা কুঞ্জ। তার মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে একটি পীচের রাস্তা। সেই রাস্তা অতিক্রম করে পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠতে হয়। সেখানে একটি অপেক্ষাকৃত সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি। এই মন্দিরে দেবী চামুণ্ডেশ্বরী বিরাজ করেন। বাস করতেন নাকি এখানে মহিষাসুর। এইখানেই দুর্গাদেবী চামুণ্ডা-রূপ ধারণ করে তাঁকে বধ করেন। তাই মহীশূর নামে পরিচিত এই স্থান। দাঁড়িয়ে আছেন পাহাড়ের উপর এক অতিকায় মহিষাসুর, তাঁর এক হাতে ধনুর আকৃতিতে এক সর্প, অন্য হাতে শোভা পায় একটি ছোরা।

চামুণ্ডেশ্বরী মহীশূর রাজাদের কুলদেবতা। দশহরার সীমাহীন উৎসবে মুখরিত হয় মহীশূর। অপরূপ সাজে সজ্জিত হয় মন্দির। সাজান হয় দেবীকেও বহুমূল্য রতনে আর ভূষণে। বহুমূল্য আভরণে ভূষিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে রাজা ও রাণী মন্দিরে পূজা দিয়ে যান। আসেন পাত্রমিত্র আর সভাসদদের দলও।

আমরা ভক্তিভরে দেবীর পূজা দিয়ে এসে মন্দিরের চূড়ার অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প-সম্ভার দেখি। নির্মিত চালুক্য পদ্ধতিতে, দশটি ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে চূড়াটি, অঙ্গে নিয়ে আছে অসংখ্য কুলুঙ্গি। বিরাজ করেন সেই সব কুলুঙ্গিতে কত দেবতা, কত দেবী। অনবদ্য তাঁদের গঠন সৌষ্ঠব, প্রতীক প্রকৃষ্টতম চালুক্য স্থাপত্যের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক।

ফিরবার পথে নন্দীকে দেখি। একটি সম্পূর্ণ স্ফটিক পাথর কেটে রচিত হয়েছে এই নন্দীটিও, অনুরূপ তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দিরের নন্দীর, আকৃতিতে আর গঠনে। তার কণ্ঠে শোভা পায় ঘণ্টা ও মুক্তার মালা, শোভা পায় পৃষ্ঠদেশেও। দেখে বিস্মিত হই।

দেখি ললিতমহল, মহীশূরের সুন্দরতম উদ্যানবাটি। বহুমূল্য আসবাবে আর তৈলচিত্রে শোভিত হয়ে আছে ললিতমহল। আছে এখানে একটি অতিপ্রশস্ত নাচঘরও।

দেখে আসি ডালিয়া-এ্যাভিনিউ বা ঠাণ্ডি সড়কও। নাই এমন মনোরম রাজপথ ভারতের অন্য কোন শহরে। দুই প্রান্তে অপরূপ শিল্প-সম্ভার বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'টি তোরণ। মাঝখানে আচ্ছাদিত রাজপথ, বেষ্টিত হয়ে আছে দু'পাশের ডালিয়ার গাছে। সৃষ্টি হয়েছে একটি স্বপ্নপুরী। দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হই।

ফিরে আসি হোটেলে। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাজপ্রাসাদ দেখতে যাই। বৃহত্তম রাজপ্রাসাদের অন্যতম এই প্রাসাদটি। নির্মিত হয়েছে মোগলের পদ্ধতিতে। বুকে নিয়ে আছে মহীশূরের শিল্পীর অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম নিদর্শন। একটি দীর্ঘ অলিন্দ আর অনেকগুলি ঘর আর বারান্দা অতিক্রম করে দোতলায় উপনীত হই। দেখি বহু প্রকাণ্ড ঘর, সজ্জিত হয়ে

আছে মূল্যবান আসবাবে আর জিনিসে। বুকে নিয়ে আছে ঘরের দরজা, দেওয়াল আর ছাদ অনবদ্য সূক্ষ্ম শিল্প-সম্ভার। শোভিত হয়ে আছে অনুপম চিত্র সম্পদেও। অনেকগুলি সুন্দর তৈলচিত্রও আছে। চিত্র আছে মহীশূরের রাজাদেরও। আছে একটি অতি প্রশস্ত দরবার-গৃহ। তার মঞ্চ সম্মুখের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গিয়ে মিশেছে। নীচের তলাতে একটি ঘরে সজ্জিত আছে বহু মৃত জানোয়ার, মহীশূরের রাজাদের শিকারের প্রতীক। প্রতিটি জিনিসই রাজাদের সুরুচির পরিচায়ক। প্রতীক তাঁদের সমৃদ্ধিরও।

প্রাসাদ দেখে আমরা জগমোহন প্রাসাদ দেখতে যাই। মহীশূরের রাজাদের 'আর্ট গ্যালারি' এই প্রাসাদটিতে, পরিচায়ক এক অপূর্ব কীর্তির। সজ্জিত হয়ে আছে দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রে। দেখি এক পরমারূপবতী যুবতী, হাতে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিফলিত হয়েছে প্রদীপের আলো তার মুখের উপর, উদ্ভাসিত হয়েছে মুখমণ্ডল। দেখি নাই আগে এমন আলোছায়ার সমন্বয়। অপরূপ এই চিত্র, দেখি বহুক্ষণ ধরে। শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নেই।

সেখান থেকে ষ্ট্যাচু স্কোয়ার দেখে হোটেলে ফিরে আসি। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাঙ্গালোর অভিমুখে রওনা হই।

যাওয়ার পথে দেখে যাই শ্রীরঙ্গপত্তনমে টিপু সুলতানের অমর কীর্তি, তাঁর রাজপ্রাসাদ 'দরিয়াদৌলত'। বুকে নিয়ে আছে দরিয়াদৌলত মোগল চিত্র শিল্পীর সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম নিদর্শন। দেখি জল দরজা। একটি মনোরম পরিবেশে এক ঝাউবীথির অন্তরালে দাঁড়িয়ে আছে গম্বুজটি, অঙ্গে নিয়ে সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার। দেখি জুম্মা মস্‌জিদ, কারাগার আর টিপুর কবর, নির্মিত দিল্লীর সবদারজঙ্গের অনুকরণে। রাত্রি বারোটায় বাঙ্গালোরে ফিরে আসি।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### দ্বারসমুদ্র ঃ

১। হোয়সলেশ্বরের মন্দির ২। কেদারেশ্বরের মন্দির

৩। কেশবের মন্দির ৪। কাপ্পে চন্নিগরায়ের মন্দির

পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে আমাদের মহীশূর ভ্রমণের কাহিনী বলছি এমন সময় হাজরাবাবু এসে ঘরে ঢুকে বললেন, "গাড়ি ত আছেই, বেলুড়টাও দেখে আসুন না। তাহলে ভাই-এরও বেলুড় দেখা হয়ে যাবে।" উত্তম প্রস্তাব। এক কথায় রাজী হয়ে যাই। স্থির হয় ভোরে উঠেই বেলুড় যাত্রা করা হবে। আগে হলেবিদে যাওয়া যাবে, পরে বেলুড়ে।

খুব ভোরে উঠে চা ও জলযোগ সেরে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভর্তি করে নিয়ে আমরা বেলুড় অভিমুখে রওনা হই। একই রকম পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ি দ্বারসমুদ্রে হোয়সলেশ্বরের মন্দিরের সামনে এসে থামে। গাড়ি থেকে নেমে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করি। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি হোয়সলরাজা নরসিংহ ১১৪১ থেকে ১১৭৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি হোয়সল স্থাপত্যের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন, নিদর্শন চরম উৎকর্ষের।

এই মন্দিরে চারিটি প্রবেশদ্বার আছে। দুটি পূর্বদিকে, একটি উত্তরে ও একটি দক্ষিণে। দরজাগুলির মাথার উপর এক একটি অপরূপ তাণ্ডবেশ্বরের মূর্তি ক্ষোদিত হয়েছে। তাদের পিছনে মকর পৃষ্ঠে এক একটি বরুণ ও বরুণীর মূর্তি। নির্মিত হয়েছে একটি এগার ফিট উঁচু প্রাচীর, সংযুক্ত হয়েছে উত্তর দ্বারের দক্ষিণ প্রান্ত আর দক্ষিণ দ্বারের বাম প্রান্ত। আচ্ছাদিত করে আছে মন্দিরের দক্ষিণ-সম্মুখ ভাগকে। তার অঙ্গে এগারটি থাক আছে, প্রতিটি থাক দৈর্ঘ্যে সাতশ ফিটেরও বেশী। প্রথমটিতে ক্ষোদিত হয়েছে হাতী, দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। দ্বিতীয়টি সিংহ, তৃতীয়টিতে বৃত্ত, চতুর্থটিতে অশ্বারোহী, পঞ্চমটিতে আবার বৃত্ত। ষষ্টিতে পুরাণের গল্প। সপ্তমে মকর। অষ্টমে রাজহংস। নবমে পর্যায়ক্রমে একটি বসা ও একটি দাঁড়ান মূর্তি। দশমে

বুরুজের পাশে সিংহ আর একাদশে প্যানেলওয়ালা গরাদ। সবার উপর আছে জালির পর্দা। মন্দিরের পশ্চিম দ্বারে শোভা পায় বৃহৎ মূর্তি, মূর্তি দেব-দেবীর। মূর্তি গণেশের, ময়ূরবাহনে সুব্রমনিয়ামের, সাতটি ফণাযুক্ত সাপের। মূর্তি আছে উমা-মহেশ্বরের, গজাসুরের আর বিষ্ণুরও। তাঁরা সবাই কারুকার্য-খচিত চন্দ্রাতপের নীচে বসে আছেন। মূর্তি আছে ভেনু গোপালের, বরাহের, নরসিংহের, ভৈরবের, গরুড়ের, ইন্দ্রের আর পার্বতীরও। মন্দিরের অঙ্গে প্রকোষ্ঠের মধ্যে ক্ষোদিত হয়েছে বৃহৎ মূর্তি। অপরূপ তাদের গঠন সৌষ্ঠব। পৌরাণিক সারিতে আছে, মূর্তিতে রামায়ণের গল্প। কাহিনী আছে মহাভারতের, ভাগবত গীতার, আর শিব ও বিষ্ণু পুরাণের। মূর্তিতে বর্ণিত হয়েছে কর্ণার্জুনের যুদ্ধ আর ক্ষীর সমুদ্র মন্থনের কাহিনীও। পূর্ব প্রবেশদ্বারে আছে শ্রীকৃষ্ণের কীর্তির কাহিনী। যেমন মহিমময় তাদের পরিকল্পনা তেমনই অনবদ্য আর সুন্দরতম প্রকাশ। দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হই। মণ্ডপের নীচে বসে আছেন তের ফিট দীর্ঘ, সাড়ে ছ' ফিট প্রস্থ ও সাড়ে আট ফিট উঁচু নন্দী। দুই গর্ভগৃহে বিরাজ করেন দুই শিব লিঙ্গ হোয়সলেশ্বর আর সান্তানেশ্বর।

২

কেদারেশ্বরের মন্দির দেখতে যাই। চালুক্য স্থাপত্যের সুন্দরতম নিদর্শন এই মন্দিরটি। নির্মাণ করেন ১২১৯ খৃষ্টাব্দে হোয়সল রাজা দ্বিতীয় বীর বল্লাল। সমপর্যায়ে পড়ে এই মন্দিরটি সোমনাথ পুরার কেশবের মন্দিরের। অনুরূপ হোয়সলেশ্বরের মন্দিরের, এই মন্দিরের বাইরের প্রাচীরের অঙ্গের মূর্তিগুলি, কিন্তু ক্ষুদ্রতর আর সূক্ষ্মতর তাই আরও সৌষ্ঠবসম্পন্ন। সিংহের পরিবর্তে ক্ষোদিত হয়েছে অশ্বারোহী। আছে একশ ছিয়াত্তরটি বৃহৎ মূর্তি, তার মধ্যে নব্বইটি পুরুষ আর বাকি স্ত্রীমূর্তি। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি চারটি হাতির পিঠের উপর, অপরূপ তাদের গঠন সৌষ্ঠব। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই মন্দিরের অঙ্গের শিল্পসম্ভার। শ্রদ্ধা জানাই শিল্পীদের, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা আজও হয়নি ম্লান।

৩

কেদারেশ্বরের মন্দির দেখে আমরা বেলুড়ে যাই। বেলুড় এখান থেকে নয় মাইল দূর। পান্থনিবাসে নেমে হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া শেষ করি। তার পর কেশবের মন্দির দেখতে যাই। মুসলমান আক্রমণে ধ্বংসে পরিণত হয় প্রাচীন রাজধানী দ্বারসমুদ্র বা দ্বারাবতীপুরা। বেলুড়ে স্থাপিত হয় নতুন হোয়সল রাজধানী। নির্মিত হয় এই মন্দির বেলুড়ে ১১১৭ খৃষ্টাব্দে, নির্মাণ করেন হোয়সল রাজা বিষ্ণু বর্ধন। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি শ্রেষ্ঠ হোয়সল স্থাপত্যের নিদর্শন, নিদর্শন চরম উৎকর্ষের।

একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে, এক মহিমময় মূর্তিতে, বেষ্টিত হয়ে আছে উঁচু প্রাচীরে আর অনেকগুলি ক্ষুদ্র মন্দিরে, প্রখ্যাত তাদের মধ্যে চন্নি গরায়ের মন্দির। মূল মন্দিরে একটি গর্ভগৃহ ও একটি সুখনাশি আছে। কেন্দ্রস্থলে আছে একটি নবরঙ্গ বা সভাগৃহ। পূর্ব, দক্ষিণ আর উত্তরে শোভা পায় তিনটি প্রবেশদ্বার। সুন্দরতম তাদের মধ্যে পূর্বদিকের প্রবেশদ্বারটি, দাঁড়িয়ে আছে মহাদ্বার বা প্রধান প্রবেশপথের বিপরীত দিকে।

এই প্রবেশদ্বারের উপরে শোভা পায় এক অপরূপ মন্মথের মূর্তি। সঙ্গে নিয়ে আছে মদন তার প্রিয়া রতিকে। নির্মিত হয়েছে একটি জগতি বা গরাদেযুক্ত প্রাচীর প্রবেশ পথটির প্রান্তদেশ থেকে। ক্ষোদিত হয়েছে তার অঙ্গে আট সারিতে মূর্তি। অপরূপ তাদের গঠন সৌষ্ঠব। দ্বারের দক্ষিণ পাশে গরাদের অঙ্গে মূর্তি দিয়ে রচিত হয়েছে মহাভারত আর রামায়ণের কাহিনী। আছে সেখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র মূর্তিও, নিযুক্ত তারা বিভিন্ন বাজনা বাজানোর কাজে। গরাদের শীর্ষদেশে রচিত হয়েছে প্রায় কুড়িটি জালির জানলা, তাদের অঙ্গেও মূর্তি দিয়ে রচিত হয়েছে পৌরাণিক কাহিনী। একটির অঙ্গে রচিত হয়েছে হোয়সল রাজা বিষ্ণু বর্ধনের দরবারের দৃশ্য। অনুপম উপরের ব্রাকেটের অঙ্গের মূর্তিগুলি, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের। তিনজন মহিলা শিকারী পরিবৃতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দুর্গা। তাঁদের কারও হাতে শোভা পায় ধনুক, কেউ নিযুক্ত পাখী শিকারে, কেউ রত প্রসাধনে। উত্তর পূর্বকোণে মূর্তি দিয়ে রচিত হয়েছে একটি সংহারের দৃশ্য। একটি সাপ একটি ইঁদুরকে সংহার করছে, তাকে একটি হাতী পদদলিত করেছে।

হাতীকে সিংহ আক্রমণ করেছে, সিংহকে সর্প আর ঈগল পাখী সর্পকে। এক মুনি বিস্মিত হয়ে দেখছেন সেই দৃশ্য।

সুন্দরতম দক্ষিণের প্রবেশপথের শিল্প সম্ভার, সূক্ষ্মতম আর বিস্তৃততমও। দেওয়ালের অঙ্গ শোভিত করা হয়েছে কত বিচিত্র আর বিভিন্ন লতা-পল্লবে। মূর্তি রচিত হয়েছে কত অসংখ্য দেব-দেবীর, কত অসুরের আর পশু-পক্ষীর। জীবন্ত তারা। পঞ্চম সারিতে শোভা পায় আশিটি বিশাল মূর্তি, যেমন তাঁদের গঠন-সৌষ্ঠব, তেমনই প্রাণবন্ত তাঁরা। তাঁদের মধ্যে আছেন বিষ্ণু, লক্ষ্মী-নারায়ণ, বামন, নরসিংহ আর রঘুনাথ। আছেন শিব আর মহিষাসুরমর্দিনী। মহিমময় তাদের মধ্যে রাবণের কৈলাস পর্বত উত্তোলন। দেখেছি এলোরায় দশাবতারের মন্দিরে অনুরূপ দৃশ্য। কিন্তু আরও বিস্তৃত এই পরিকল্পনা, সুন্দরতর প্রকাশ। রচনা করেছেন স্থপতি এক অপরূপ কৈলাস পর্বত, অবস্থান করছেন সেখানে কত দেব-দেবী, আছে সেখানে সব রকমের জীব-জন্তুও, সিংহ, ব্যাঘ্র, হাতী, সর্প, আরও কত জন্তু। শীর্ষদেশে একটি মণ্ডপের মধ্যে বিরাজ করেন শিব আর পার্বতী। করজোড়ে তাঁদের স্তুতি করেন কত দেবতা, কত দেবী। নীচে হাঁটু গেড়ে বসে রাবণ, নিযুক্ত পর্বত উত্তোলনে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে স্থপতির এই অপরূপ সৃষ্টি। সৃষ্টি এক গৌরবময় যুগের। দেখি স্তব্ধ হয়ে এক মহিমময় পরিকল্পনার অনবদ্য রূপদান।

প্রতি প্রবেশ দ্বারের দু'পাশে নির্মিত হয়েছে দু'টি করে সুন্দর তোরণ, তাদের মধ্যে বিরাজ করেন ভৈরব আর দুর্গা, তাণ্ডবেশ্বর আর ব্রাহ্মণী, বিষ্ণু আর মহিষাশূরমর্দিনী। অনুপম তাঁদেরও গঠনসৌষ্ঠব। প্রতি প্রবেশ পথের উপরে দেখি একটি তলোয়ার দিয়ে ব্যাঘ্র হত্যা করছেন হোয়সল বংশের আদিপুরুষ সলার।

তুলনাহীন মন্দিরের ভিতরের শিল্প-সম্ভার। অপরূপ স্তম্ভ দিয়ে শোভিত করা হয়েছে নবরঙ্গকে, পরিণত হয়েছে এক ইন্দ্রলোক, এক স্বপ্নপুরীতে। তাদের কোনটি চতুষ্কোণ ও কোনটি অষ্টকোণ, কেউ দ্বাদশ, কেউ ষোড়শ, কেউ বা বত্রিশ কোণ। কেউ বৃত্তাকার, কারও পদ্মফুলের, কারও বাঁশীর আকার। সীমাহীন সৌন্দর্য বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি, তাদের কাছে দ্রাবিড়

স্তম্ভ পরাজয় স্বীকার করে। সমপর্যায়ে পড়ে এই স্তম্ভগুলি অজন্তার স্তম্ভের। সুন্দরতম তাদের মধ্যে নরসিংহ স্তম্ভ। সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম ভূষণে-ভূষিত করেন স্থপতি তার সারা অঙ্গ। সুখনাশির প্রবেশ পথেও একটি অনবদ্য স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। অঙ্গে নিয়ে আছে মোহিনী-মূর্তি, আছে বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তি, মূর্তি আছে অষ্ট দিক্‌পালেরও। হোয়সল স্থপতির শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য জ্ঞানের প্রতীক এই স্তম্ভগুলি।

অপরূপ স্তম্ভের শীর্ষদেশের ব্রাকেটের ( বন্ধনীর ) অঙ্গের মূর্তিগুলিও। তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি পরমারূপবতী নারী, সজ্জিতা বহুমূল্য বিভিন্ন অলঙ্কারে। তাঁর এক হাতে শোভা পায় একটি মুকুর, অন্য হাতে প্রিয় কাকাতুয়া। আছে একটি নৃত্য পরায়ণা সরস্বতীর মূর্তি, অপস্রয়মান তাঁর শিরোভূষণ। আছে একটি নারী, নিযুক্তা প্রসাধনে, আছে নারী নৃত্যরতাও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

গর্ভ গৃহে প্রিয়া পরিবৃতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অপরূপ ছ' ফিট উঁচু বিগ্রহ বিজয়নারায়ণ একটি তিন ফিট উঁচু বেদীর উপর। বিস্তৃত হয়েছে তাঁর প্রভা। প্রভার ভিতর ক্ষোদিত হয়েছে বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তি। দেখি মুগ্ধ হয়ে।

স্তব্ধ হই দেখে নবরঙ্গের ছাদের ( সিলিং-এর ) শিল্প-সম্ভার, রুদ্ধ হয় গতি। সূক্ষ্মতম আর বিস্তৃততম এই শিল্প-সম্পদ নিদর্শন শ্রেষ্ঠ হোয়সল স্থপতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির। প্রতীক এক গৌরবময় কীতির। তাই লাভ করে এই মন্দির, শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে, পায় মহিমময় পরিকল্পনায় আর অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম রূপদানে। অমর হন হোয়সল স্থপতি। অমর হন হোয়সল রাজা বিষ্ণু বর্ধন। অমর হয় বেলুড়, হয় ভারতবর্ষও। তাই আজও আসে এখানে দেশ বিদেশ থেকে যাত্রী, নিবেদন করে যায় শ্রদ্ধার অঞ্জলি, ডালি উজাড় করে। সঙ্গে নিয়ে যায় স্মৃতি যা মনের মণিকোঠায় অম্লান হ'য়ে থাকে চিররাত্রি, চিরদিন।

## ৪

কেশরের মন্দির দেখে আমরা কাপ্পে চন্নিগরায়ের মন্দির দেখি। এই মন্দিরে দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে। অপরূপ তাদের অঙ্গের শিল্প সম্ভার, অনুরূপ

সোমনাথ পুরার কেশবের মন্দিরের, প্রতীক শ্রেষ্ঠ হোয়সল স্থাপত্যের। অপরূপ এই মন্দিরের কেশবের মূর্তিও। দেখে মুগ্ধ হই। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি জকনাচারি, শ্রেষ্ঠ হোয়সল স্থপতি। তিনিই নির্মাণ করেন সোমনাথ পুরার কেশবের আর দ্বারসমুদ্রের কেদারেশ্বরের মন্দির। তাঁর পুত্র দানকনাচারি আবিষ্কার করেন একটি মৃত ব্যাঙ, প্রোথিত ছিল মন্দিরের প্রস্তরের ভিতর। তখন জকনাচারি নিজের গ্রামে, কৈডালাতে একটি কেশবের মন্দির নির্মাণে নিযুক্ত। ক্ষুব্ধ হন তিনি পুত্রের এই আবিষ্কারে, স্বহস্তে ছেদন করেন নিজের দক্ষিণ হস্ত। প্রায়শ্চিত্ত করেন নিজের অপরাধের। তাই নিষিদ্ধ পূজা এই মন্দিরে।

বাঙ্গালোর থেকে একশ' মাইল দূরেই দাঁড়িয়ে আছে শ্রাবণ-বেলা-গোলা, প্রাচীনতম জৈনতীর্থ, বুকে নিয়ে আছে হোয়সলদের পূর্বপুরুষ গঙ্গরাজাদের স্থাপত্যের অসংখ্য নিদর্শন। বুকে নিয়ে আছে জৈন বস্তি আর হিন্দু মন্দির। এখানেই বিন্ধ্যগিরির শিখরে স্ফটিক পাথর কেটে নির্মিত হয়েছে প্রথম-তীর্থঙ্করের পুত্র আর ভরতের ভ্রাতা জৈন সাধু গোমতেশ্বরের মূর্তি। দাঁড়িয়ে আছে সাতান্ন ফিট উঁচু এই মূর্তিটি এক মহিমময় মূর্তিতে, একটি প্রাচীরে বেষ্টিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণের একেবারে কেন্দ্রস্থলে। পৃথিবীর বৃহত্তম মূর্তি, বৃহত্তর ইজিপ্ট-এর রামেসিসের মূর্তির চাইতেও। নির্মাণ করেন এই মূর্তিটি ৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গরাজা রাজমল্লের মন্ত্রী চামুণ্ডা রায়।

আজও এখানে সমাগত হয় হাজার হাজার জৈন তীর্থযাত্রী, দিয়ে যায় শ্রদ্ধার অঞ্জলি। প্রতি চোদ্দ বছরে হয় গোমতেশ্বরের মস্তক অভিষেক। হয় মহা আড়ম্বর, মুখর হয়ে থাকে শ্রাবণ-বেলা-গোলা একমাস যাত্রীর কোলাহলে আর উৎসবে। আমরা গভীর রাত্রিতে বাঙ্গালোরে ফিরে আসি। কাটাই বাঙ্গালোরে আরও দু'দিন. দেখি যা কিছু আছে দর্শনীয়। তৃতীয় দিনে রাত্রির বাঙ্গালোর এক্সপ্রেসে মাদ্রাজে রওনা হই।

মাদ্রাজে একদিন শৈলেনের বাড়িতে বাস করে উপনীত হই নাগপুরে। সেখানেও একদিন বন্ধুবর কুমুদিনী ভট্টাচার্যের বাড়িতে কাটিয়ে, ১৯৫৪ সালের আটই জানুয়ারী ভোরে দিল্লীতে পৌছাই। পরিসমাপ্তি হয় আমাদের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ।



গোমতেশ্বরের মূর্তি—শ্রাবণ-বেল-গোলা



কৈলাশনাথের মন্দির—কাঞ্চীপুরম পৃষ্ঠা ৩০



নব বৃন্দাবন—মহীশুর পৃষ্ঠা ১৪৩

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## চালুক্য স্থাপত্যের ধারা ঃ

চালুক্যভূমের স্থাপত্যকে চার ভাগে বা যুগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ—আদি, মধ্য, হোয়সল আর পরবর্তী চালুক্য যুগে। যেমন হয়েছে দ্রাবিড়স্থানের স্থাপত্যকে পল্লব, চোল, পাণ্ড্য, বিজয় নগর আর নায়ক যুগে।

আদি বা প্রাচীনতম যুগ। ( ৪৫০-৬৫০ খৃষ্টাব্দে )

দাক্ষিণাত্যে ধারোয়ারের বিজাপুর জেলায় আইহোলে ৪৫০ খৃষ্টাব্দে চালুক্য ৪৫০ থেকে স্থাপত্যের প্রথম পত্তন হয়। এইখানেই স্থাপিত হয় তাঁদের প্রথম রাজধানী। ৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এখানে একের পর এক সত্তরটি পাথরের মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরস্থানে পরিণত হয় আইহোল।

চালুক্য ঋষি নির্মাণ করেন এই সব মন্দিরে চতুষ্কোণ স্তম্ভদণ্ড আর স্তম্ভের শীর্ষদেশের বন্ধনী। রচিত হয় সিংহাসন। নির্মাণ করেন স্তম্ভ, বন্ধনী আর সিংহাসন, তাঁদের অনুকরণে সারা দাক্ষিণাত্যের স্থপতিরা। নির্মিত হয় দ্রাবিড়-স্থানেও। বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দিয়ে রচিত হয় ছাদ, তাদের এক প্রান্তে ক্ষোদিত হয় প্রণালী, অন্য প্রান্ত প্রণালীর মাপে কাটা হয়। যুক্ত হয় অন্য প্রস্তর খণ্ড। অনুরূপ ত্রয়োদশ শতাব্দীর হোয়সল স্থপতির ছাদ নির্মাণের পদ্ধতিও। এই খানেই স্থরু হয় মন্দির নির্মাণের পরীক্ষা।

নিমিত হয় এখানে বৌদ্ধ চৈত্যের অনুকরণে দুর্গা মন্দির। এইখানেই ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয় জৈন মন্দির—মেগুতি। নাই এই সব মন্দিরে কোন সূক্ষ্মতার ছাপ, নিদর্শন নাই অভিজ্ঞতারও। কিন্তু পরিচায়ক তারা এক বিরাট সম্ভাবনার, এক ভবিষ্যৎ স্থন্দর, মহিমময় মন্দিরের।

এই সময়েই বাদামি প্রাচীন বাতাপি নগরেরও পাহাড় কেটে তিনটি হিন্দু ও একটি জৈন মন্দির নিমিত হয়। নির্মিত হয় চারিটি অপরূপ সভাগৃহ, এই সব মন্দিরের অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য স্তম্ভ। শোভিত হয় স্তম্ভের অঙ্গ আর শীর্ষদেশ অনবদ্য স্থষ্ঠু গঠন দেব-দেবীর মূর্তি দিয়ে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্য রাজা প্রথম পুলকেশী বাদামিতে রাজধানী স্থাপন

করেন, একটি খাড়া পাহাড়ের সানুদেশে একটি হ্রদের ধারে। নীচে থেকে একটি রাস্তা উঠে গিয়েছে পাহাড়ের শীর্ষদেশে, তার উপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে চারিটি মন্দির। আছে এই সব মন্দিরে একটি করে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ, স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ আর একটি গর্ভগৃহ, যেখানে বিরাজ করেন দেবতা। লেখা আছে মন্দিরের অঙ্গে ৫৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম পুলকেশীর পুত্র মঙ্গলিসা এই মন্দির-গুলি নির্মাণ করেন। চালুক্য স্থপতি আইহোলে ৪৫০ খৃষ্টাব্দে মন্দির নির্মাণ স্থরু করেন, রেখে যান ৫৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকৃষ্টতম মন্দিরের নিদর্শন, একশত বৎসরের প্রচেষ্টার ফল। বিস্ময় জাগায় মনে। নির্মিত হয় প্রথমে একটি অট্টালিকা, নাই তাতে কোন কারুকার্য, নাই প্রাঙ্গণ, নাই চূড়া—মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। নির্মিত হয় চূড়া। চূড়া আনে মর্যাদা, পরিচায়ক মন্দিরেরও। রচিত হয় তার পর মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তে মণ্ডপ। তার শীর্ষদেশে নির্মিত হয় চূড়া। সেই মণ্ডপে বেদীর উপর দেবতা বিরাজ করেন। বেদী, মণ্ডপ আর চূড়া নিয়ে স্বষ্টি হয় বিমান। রূপ নেয় একটি সম্পূর্ণ মন্দিরের।

৬৪২ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চীর পল্লব রাজা নরসিংহ বর্মণের আক্রমণে ধ্বংসে পরিণত হয় বাদামি। স্থাপিত হয় তৃতীয় রাজধানী বাতাপি থেকে দশ মাইল দূরে পট্টদকলে। নির্মিত হয় মন্দির পট্টদকলেও। স্থরু হয় ৬৪২ খৃষ্টাব্দ থেকে চালুক্য স্থাপত্যের মধ্য যুগ।

মধ্য যুগ। (৬৫০-৭৫০ খৃষ্টাব্দ)

রাজত্ব করেন প্রথম বিক্রমাদিত্য ৬৯৬ থেকে ৭৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আর দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ৭৩৩ থেকে ৭৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁরাই চালুক্যবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও। তাঁদের সময় উপনীত হয় চালুক্য গৌরব, চালুক্য সমৃদ্ধি উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। নির্মিত হয় পট্টদকলে দশটি মন্দির, তাদের মধ্যে পাপনাথ, জম্বুলিঙ্গ, করসিদ্ধেশ্বর আর কাশীনাথের মন্দির ইণ্ডো-এরিয়ান পদ্ধতিতে রচিত হয়। সঙ্গমেশ্বর, বিরুপাক্ষ, মল্লিকার্জুন, গণনাথ ও শনমেশ্বর দ্রাবিড় স্থাপত্যের পরিচায়ক।

বৃহত্তর তাদের মধ্যে পাপনাথ আর বিরুপাক্ষ, নির্মিত হয় ৬৮০ আর ৭৪০ খৃষ্টাব্দে। প্রকৃষ্টতর কিন্তু বিরুপাক্ষের মন্দির, দাঁড়িয়ে আছে এক মহিমময় মূর্তিতে। মহিমময় পরিকল্পনায় আর অনবদ্য সুক্ষ্ম রূপদানে। মন্দিরের অঙ্গে

শোভা পায় কত সুষ্ঠু গঠন দেব-দেবীর মূর্তি, পরিচায়ক শিল্পীর পৌরাণিক জ্ঞানের। রচিত হয় কত অনুপম স্তম্ভ, অঙ্গে নিয়ে সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। চূড়ার অঙ্গে রচিত হয় কত কুলুঙ্গি, বিরাজ করেন সেই সব কুলুঙ্গির ভিতর কত দেবতা, কত দেবী। রচিত হয় কার্ণিশ, জালির জানালা আর বন্ধনী। অপরূপ মূর্তি দিয়ে শোভিত করা হয় সেই সব বন্ধনীর শীর্ষদেশ। নির্মিত হয় কত দরজা, বুকে নিয়ে অনবদ্য লতাপল্লব। শোভিত করা হয় তার অঙ্গের প্রতিটি ধূসর প্রস্তরখণ্ডকে শিল্পীর মনের মাধুরী দিয়ে। পরিণত হয় বিরূপাক্ষের মন্দির শ্রেষ্ঠ চালুক্য স্থাপত্যের নিদর্শনে। নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের, এক অমর কীর্তির।

মন্দিরের অঙ্গের ক্ষোদিত লিপি থেকে জানা যায় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের মহারাণী, তামিল শিল্পী দিয়ে নির্মাণ করান এই মন্দির। পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করে মহারাজা বিক্রমাদিত্য অভিভূত হন কৈলাসনাথের মন্দিরের সৌন্দর্য দেখে। বাসনা জাগে মনে, নিজের রাজধানী পট্টদকলে অনুরূপ একটি মন্দির নির্মাণ করবার। সঙ্গে করে নিয়ে আসেন কৈলাসনাথের নির্মাতা তামিল স্থপতিকে। তিনিই এই মন্দিরের অঙ্গে দ্রাবিড় স্থাপত্যের ছাপ রেখে গিয়েছেন। প্রতীক যদিও এই মন্দিরটি শ্রেষ্ঠ চালুক্য স্থাপত্যের।

এই একই সময়ে নির্মিত হয় ছয়টি অনুরূপ মন্দির, তুঙ্গভদ্রার পশ্চিম পারে, আলমপুরে।

হোয়সল যুগ। ( ১০৫০-১৩০০ খৃষ্টাব্দ )

আইহোলের আর বাদামির কল্পনা, পট্টদকলের সম্ভাবনা পায় পূর্ণপরিণতি মহীশূরে, লাভ করে চরম উৎকর্ষ। উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে। যুবকে পরিণত হয় আইহোলের শিশু, আর পট্টদকলের কিশোর।

দ্বাদশ শতাব্দীতে চালুক্যদের পরাজিত করে হোয়সলরা মহীশূর অধিকার করেন। রাজত্ব করেন ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। মহাপরাক্রমশালী তাঁরা। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও। যুক্ত হয় মহীশূরের চালুক্য স্থপতির সৌন্দর্যজ্ঞান, প্রতিভা ও উদ্যম আর হোয়সল রাজাদের প্রেরণা আর অর্থ। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহীশূরে নির্মিত হয়,আশীটি মন্দির। উপনীত হয় চালুক্য হোয়সল স্থাপত্য

এক গৌরবময় যুগে। নির্মিত হয় মন্দির, দ্বারসমুদ্রে, বেলুড়ে আর সোমনাথ পুরাতে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন।

উপযুক্ত নয় বেলেপাথর সূক্ষ্ম কারুকার্যের পক্ষে, তাই প্রচলিত হয় নমনীয় স্ফটিক পাথর। ক্ষোদিত হয় তার অঙ্গে সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম দেব-দেবীর মূর্তি, কাহিনী কত পুরাণের ও কত সূক্ষ্ম লতা পল্লব। যেমন নিখুঁত, তেমনই প্রাণবন্ত।

নির্মাণ করেন মন্দির প্রাচীরে বেষ্টিত প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে। নির্মিত হয় প্রাচীরের গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। আছে তাতে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা। কেন্দ্রস্থলের মূলমন্দিরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ঃ ১। গর্ভগৃহ, এইখানে দেবতা বিরাজ করেন। একটি আচ্ছাদিত তোরণের সঙ্গে যুক্ত হয় গর্ভ গৃহ, পরিচিত সুখনাশি নামে। ২। যুক্ত হয় সুখনাশি একটি স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহ বা নবরঙ্গের সঙ্গে। ৩। নির্মিত হয় নবরঙ্গের সামনে মুখ্য মণ্ডপ, একটি স্তম্ভযুক্ত উন্মুক্ত চন্দ্রাতপ। এক একটি মন্দিরে থাকে দুই বা ততোধিক গর্ভ গৃহ, নবরঙ্গ আর মুখ্য মণ্ডপ। বিরাজ করেন বিভিন্ন দেবতা এই সব গর্ভগৃহে।

নির্মিত হয় মন্দির উঁচু মঞ্চের উপর, নয় সেগুলি আয়ত ক্ষেত্র, বিস্তৃত মন্দিরের সমান্তরালে। বেষ্টন করে আছে সমস্ত মন্দিরকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রশস্ত সেগুলি রূপ নেয় উন্মুক্ত বেদীর, হয় প্রদক্ষিণের পথও।

অন্তর্ভূমিক মন্দিরের দেওয়ালের অঙ্গের কারুকার্য, বিভিন্ন আর বিচিত্র। অনুরূপ নয় বিমানের অঙ্গের শিল্প সম্পদ। পৃথক স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহের শিল্প-সম্ভারও। মাটি থেকে নয় দশ ফিট উঁচু পর্যন্ত ভিত্তির অঙ্গ শোভিত হয় বিভিন্ন আর বিচিত্র কারুকার্যে, নাই তাতে কোন ছেদ। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে হাতী, বীর্যের প্রতীক, প্রতীক স্থায়িত্বেরও। তার উপরের সারিতে ক্ষোদিত হয় অশ্বারোহী, নিদর্শন গতির। তাদের উপরের সারিতে সর্পিল পল্লব আর কীর্তি মুখ। তাদের উপরের সারিতে রামায়ণ আর মহাভারতের গল্প. কাহিনী কত পুরাণের। পরিণত হয় ছবিঘরে, হয় রঙ্গমঞ্চে। ভেসে ওঠে চোখের সামনে কত রামায়ণ আর মহাভারতের দৃশ্য। দৃশ্য কত পৌরাণিক কাহিনীর। পরিচয় তাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্যের। এইখানেই স্থপতি উজাড় করে দেন তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য। মনের সমস্ত মাধুরী,

তাই প্রতিটি ছবিই হয় জীবন্ত। হয় অনবদ্য। সৃষ্টি হয় এক সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, এক স্বপ্ন লোক। তার উপরের সারিতে রচিত হয় জালি। এই জালি দিয়েই মন্দিরে প্রবেশ করে আলো, প্রবেশ করে বাতাস। জালির উপরের সারিতে শোভা পায় পল্লব, তার উপরের সারিতে উড়ন্ত হংস। বিস্তৃততম আর সুন্দরতম বিমানের অঙ্গের অনুভূমিক শিল্প-সম্ভার তার কাছে পরাজয় স্বীকার করে স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপের অঙ্গের কারুকার্য। অলঙ্কৃত করেন সবার উপর সারিতে দুই কানিশের অন্তস্থলের এক বিস্তীর্ণ স্থানকে দেব-দেবীর মূর্তি দিয়ে। ক্ষোদিত হয় কত দেব-দেবীর মূর্তি বিভিন্ন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত কুলুঙ্গির মধ্যে। ক্ষোদিত হয় পল্লবে শোভিত চন্দ্রাতপের নীচেও। অনুপম তাদের গঠন সৌষ্ঠব আর সূক্ষ্মতম প্রকাশ, প্রতীক হোয়সল ভাস্করের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যজ্ঞানের। তারকাকারে সজ্জিত হয় মূর্তিগুলি, মহিমান্বিত করে সমস্ত মন্দিরকে, করে সৌন্দর্যময়। নাই এই মূর্তির সম্ভার দ্রাবিড় মন্দিরে। ক্ষোদিত করেন দ্রাবিড় ভাস্কর ক্ষুদ্রকায় কুলুঙ্গি, বিরাজ করেন সেই সব কুলুঙ্গিতে দেব-দেবী, শোভিত হয় মন্দিরের অঙ্গ।

নিহিত কিন্তু হোয়সল স্থাপত্যের মূল সূত্রটি মন্দিরের চূড়ার পরিকল্পনায় আর তার রূপদানে। চূড়াকেই তাঁরা করেন মধ্যমণি, যেমন করেন দ্রাবিড় স্থপতি গোপুরমকে। দাঁড়িয়ে আছে চূড়াটি, পৃথক হয়ে আছে মন্দিরের বিমান থেকে একটি প্রশস্ত কানিশের বেষ্টনী দিয়ে। নির্মিত তারকার পদ্ধতিতে, বাঁশীর আকারে, কমে আসে চূড়ার ব্যাস যত ওঠে উপরে। শেষে পর্যবসিত হয় ছত্রাকার শৃঙ্গে। অপরূপ শিল্প-সম্ভারে স্থপতি ভূষিত করেন চূড়ার অঙ্গ আর শীর্ষদেশ, গড়ে তোলেন এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ।

মন্দিরের স্তম্ভের আর তার শীর্ষদেশের আকার আর তাদের বিন্যাস হোয়সল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এক একটি সম্পূর্ণ স্ফটিক পাথর কেটে বৃহৎ কুঁদ-যন্ত্রে নির্মিত হয় এই স্তম্ভগুলি। ছাঁচে ফেলে নির্মিত হয় তার শীর্ষদেশের বন্ধনী। বানান হয় স্তম্ভ দণ্ডও। শোভিত করেন স্থপতি অপরূপ শিল্প সম্ভারে এইসব স্তম্ভের অঙ্গ আর শীর্ষদেশ। হয় তারা সৌন্দর্যময়।

মহীশূরের মন্দিরের মূল ভিত্তি নিহিত দ্রাবিড় স্থাপত্যে। কিন্তু সীমাহীন

তাঁদের প্রতিভা আর সুন্দরের পিপাসা, নির্মাণ করেন তাঁরা অভিনব মন্দির। তুলনাহীন সেই মন্দির, অতুলনীয় মন্দিরের অঙ্গের ভাস্করের বাটালির কাজ। গড়েন জীবন্ত মূর্তি, সাজান তাঁদের বহুমূল্য ভূষণে আর অলঙ্কারে। ক্ষোদিত করেন কত নৃত্য পরায়না নারী, মস্তকে তাদের বহুমূল্য শিরোভূষণ, কর্ণে হীরের দুল, কণ্ঠে মতির মালা, পরিধানে বহুমূল্য সিল্কের ঝালর যুক্ত ঘাগরা। ক্ষোদিত হয় কত দেব-দেবীর মূর্তি, স্বয়ং সম্পূর্ণ তাঁরা, মূর্তি কত মহাভারতের রামায়ণের আর পুরাণের। অনবদ্য তাঁদের পরিকল্পনা, নিখুঁত গঠন ভঙ্গিমা, জীবন্ত তারা। এক বিরাট ধর্ম গ্রন্থে পরিণত হয় মন্দিরের অঙ্গ, গল্পাকারে পরিণত হন মহীশূরের ভাস্কর। রেখে যান শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের। অমর হন মহীশূরের স্থপতি, অমর হন ভাস্কর, লাভ করেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে। অমর হয় মহীশূর, অমর হয় ভারতবর্ষ।

পরবর্তী চালুক্য যুগ। ( ১০৫০-১৩০০ খৃষ্টাব্দ )

চালুক্য হোয়সল স্থাপত্য প্রবেশ করতে পারে না মহীশূর রাজ্যের উত্তর সীমানায়, কানেরিজ্ আর বেলারি জেলায়। তার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে চালুক্য রাজাদের প্রাচীনতম রাজধানী, আইহোল, পট্টদকল আর বাদামি, অন্য প্রান্তে হোয়সল স্থপতির অমরকীর্তি। এখানে ১০৫০ থেকে ১৩০০ খৃষ্টাব্দে চালুক্য স্থপতি পঞ্চাশটি মন্দির নির্মাণ করেন। আইহোল আর পট্ট-দকলের সম্ভাবনা পায় সম্পূর্ণ রূপ, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি। চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণে বন্ধ হয় চালুক্যভূমে মন্দির নির্মাণ।

বিভিন্ন তাঁদের মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা, বিভিন্ন দেওয়ালের আর প্রবেশ পথের শিল্প সম্ভার। মিল নাই মন্দিরের চূড়ার আর স্তম্ভের আকৃতিতেও। বর্জিত হয় হোয়সল স্থপতির তারকা পদ্ধতি, নির্মিত হয় মন্দির সমরেখা পদ্ধতি অবলম্বনে, আয়ত ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে।

নাই জানালা এইসব মন্দিরে, নির্মিত হয় নাই ভিতরে আলো আর হাওয়া প্রবেশের জন্য পাথরের জালি। দরজা দিয়ে প্রতিফলিত হয় আলো, আলোকিত হয় মন্দির। মন্দিরের ভিতরের আলোর অল্পতা বাড়ায় মন্দিরের গাম্ভীর্য। নাই মন্দিরের সম্মুখে কোন প্রবেশ দ্বার, আছে মন্দিরের পার্শ্বদেশে।

তাদের বিপরীত দিকে রচিত হয় বহু প্রকোষ্ঠ, ক্ষুদ্র মন্দির আর স্তম্ভ-যুক্ত অলিন্দ।

অপরূপ সাজে সজ্জিত করেন চালুক্য স্থপতি মন্দিরের বাইরের অঙ্গ। ক্ষোদিত করেন কত দেব-দেবীর মূর্তি, মূতি কত পুরাণেরও। ক্ষোদিত হয় কত বিভিন্ন সূক্ষ্ম লতা পল্লব। যেমন নিখুঁত তাদের পরিকল্পনা, তেমন অনবদ্য রূপদান। সৃষ্টি হয় এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, হয় অনুপম।

নাই এই মন্দিরের চূড়ায় পট্টদকলের স্থপতির সুনির্দিষ্ট আর সুস্পষ্ট তল। ঘন সন্নিবিষ্ট নয় হোয়সল স্থপতির মহীশূরের মন্দিরের চূড়ার মতও। দুই বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে রচিত হয় এক অভিনব চূড়া, ঘণ্টার আকারে পর্যবসিত হয় তার শীর্ষদেশ, পট্টদকলের গম্বুজে নয়, নয় মহীশূরের ছত্রেও। সাজান স্থপতি এইসব চূড়ার অঙ্গ আর শীর্ষদেশ অনবদ্য শিল্প-সম্ভারে, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের।

পরবর্তী চালুক্য স্থপতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি বুকে নিয়ে আছে মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথ আর মূল মন্দিরের প্রবেশ পথের দেওয়ালের অঙ্গ। শোভিত হয়ে আছে অপরূপ শিল্প-সম্ভারে। অনবদ্য দেব-দেবীর মূর্তি দিয়ে শোভিত করা হয়েছে নীচের লিন্টেল আর উপরের কার্নিশের মধ্যস্থল। মূর্তি আছে পুরাণেরও। শোভা পায় সুন্দর লতা-পাতাও, প্রতীক এক গৌরবময় যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের।

এই উন্নততর পদ্ধতির প্রবর্তন সুরু হয় দশম শতাব্দীতে গডাকের কাছে কুম্বানুর গ্রামের নবলিঙ্গের আর কালেশ্বরের মন্দিরে। ক্রমবিকাশ হয় গডাকের সাত মাইল দূরে লাকুন্দি গ্রামের জৈন মন্দিরে, নির্মিত হয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। হয় তুঙ্গভদ্রার পারে চৌদামপুরের মুক্তেশ্বরের মন্দিরেও। পায় পূর্ণ-পরিণতি, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে লাকুন্দির কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে, ইতাগির মহাদেবের আর কুরুবতীর মল্লিকার্জুনের মন্দিরে। বুকে নিয়ে আছে এই তিনটি মন্দির চালুক্য স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

১১৯১ খৃষ্টাব্দে হোয়সল নৃপতি দ্বিতীয় বীর বল্লাল লাকুন্দিতে রাজধানী স্থাপন করেন, নির্মিত হয় কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দির ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে। দাঁড়িয়ে

আছে মন্দিরটি এক মহিমময় মূর্তিতে, আছে বীর্যের প্রতীক হয়ে। পর্যাপ্ত এই মন্দিরের বিমানের আর চূড়া দুটির সূক্ষ্ম শিল্প-সম্ভার, পর্যাপ্ত প্রাচীরের অঙ্গের কারুকার্যও। কিন্তু অতিক্রম করে না সীমা, লঙ্ঘন করে না মাত্রা, পরিচয় শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য জ্ঞানের। অনবদ্য আর সূক্ষ্মতম এর প্রবেশপথের শিল্প-সম্পদ। বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠতম শিল্প-সম্ভার দক্ষিণের প্রবেশপথটি। ক্ষোদিত হয়েছে এক আলোক সামান্য গজ-লক্ষ্মীর দৃশ্য। দৃশ্য হস্তি আর অশ্বারোহীর যুদ্ধের। দৃশ্য কত পৌরাণিক কাহিনীর। মূর্তি কত দেব-দেবীরও। মহিমময় তাদের পরিকল্পনা আর অনবদ্য রূপদান। শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চালুক্য ভাস্কর্যের।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গডাক থেকে বাইশ মাইল দূরে ইতাগিতে মহাদেবের মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই সময়েই চালুক্য স্থাপত্য উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও চালুক্য স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অনবদ্য এই মন্দিরের নবরঙ্গের মূর্তিগুলি, শ্রেষ্ঠ কীর্তি চালুক্য ভাস্করের।

সমসাময়িক মল্লিকার্জুনের মন্দিরটি, দাঁড়িয়ে আছে তুঙ্গভদ্রার পারে, কুরুবতী গ্রামে, হরপনাহলি থেকে সতের মাইল দূরে। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও চালুক্য স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অনুপম এই মন্দিরের প্রাচীরের অঙ্গের শিল্প-সম্ভার। অনবদ্য মন্দিরের আর চূড়ার অঙ্গের শিল্প সম্পদ, শিল্প-সম্ভার তোরণেরও। মন্দিরের স্তম্ভগুলি বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন। তুলনাহীন স্তম্ভের শীর্ষদেশের বন্ধনীর বিভিন্ন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মূর্তিগুলি। নাই এমন সুন্দর শোভন মূর্তি অন্য কোন মন্দিরের বন্ধনীর অঙ্গে। প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, সৃষ্টির এক গৌরবময় যুগের, এক অমর কীর্তির। পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে।

# চতুর্থ অধ্যায়

## কারকোটা ও উৎপল রাষ্ট্র

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### জম্মু ঃ রঘুনাথজির মন্দির

সেদিন ছিল ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের তেইশে সেপ্টেম্বর। আমরা ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শনে রওনা হই। সঙ্গে যান গৃহিণী আর যায় ধ্যান সিং।

ভোরবেলায় কাশ্মীর মেল পাঠানকোট ষ্টেশনে এসে থামে। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে একটি ছবি, চিত্র এক পুরাকাহিনীর।

'হরমুখ' পর্বত। বাস করেন সেখানে পার্বতীদেবী। তার পাদদেশে এক বিশাল হ্রদ, সীমাহীন, দিগন্ত বিস্তৃত। পরিচিত সেই হ্রদ সতী সাগর নামে। সেই হ্রদের বুকে সকাল সন্ধ্যায় পার্বতীদেবী ময়ূরপঙ্খী চড়ে জল-কেলি করেন।

ক্রমে সেই হ্রদে এসে বাস করে এক দৈত্য। মহা অত্যাচারী সেই দৈত্য। তার অত্যাচারে সম্ভব হয় না পার্বতীদেবীর শান্তিতে হরমুখ পর্বতে বাস করা। শোনেন দেবতারা। ছিন্ন হয় বারমূলার কাছের পাহাড়ের বেষ্টনী। নির্গত হয় হ্রদের জল, পরিণত হয় ঝিলাম নদীতে। সৃষ্টি হয় এক রমণীয় উপত্যকাও। মানুষ এসে বাস করে সেই উপত্যকায়। অবশিষ্ট থাকে কিছু জল হ্রদের বুকে। আশ্রয় নেয় সেখানে দৈত্য। ডাল হ্রদ নামে খ্যাতি লাভ করে তার আশ্রয়স্থল। তখন সুরু হয় মানুষের উপর দৈত্যের অত্যাচার। অপরিসীম সেই অত্যাচার, তার কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। অবগত হন কশ্যপ মুনিও। তিনি অবিলম্বে সেই উপত্যকায় উপনীত হন। অত্যাচার নিবারণের জন্য নিযুক্ত হন কঠোর তপস্যায়। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে পার্বতী-দেবী নিক্ষেপ করেন এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ডালের বুকে। মৃত্যুবরণ করে দৈত্য তার আঘাতে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মানুষ। সুখের আর শান্তির হয় তাদের জীবন। 'কশ্যপ মুনির নাম থেকেই কশ্যপমীর' নামে পরিচিত হয় এই বিস্তৃত উপত্যকা। শেষে পরিণত হয় কাশ্মীরে।

ধীরে ধীরে সেই প্রস্তর খণ্ডের কলেবর বাড়তে থাকে। শেষে এক পর্বতের আকার ধারণ করে। সেই পর্বতই হরিপর্বত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দাঁড়িয়ে আছে হরিপর্বত শ্রীনগরের বুকের উপর। মহাপবিত্র হরমুখ পর্বতও কাশ্মীরবাসীর কাছে, হয়ে আছে মহাতীর্থ।

আজ সত্যিই দেখতে যাচ্ছি সেই ভূস্বর্গ কাশ্মীর। কাশ্মীর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন। দেখতে তার হিমগিরি শ্রেণী, শিরে শোভা পায় শুভ্র তুষারের মুকুট পদতলে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ অঞ্চল। দেখতে অমরনাথ, পহেলগাম, শোনামার্গ আর গুলমার্গ। দেখতে তার স্রোতস্বিনী, প্রবাহিত হয় বুকের উপর দিয়ে, শোনা যায় তাদের অন্তরের ধ্বনিও। দেখতে দুধগঙ্গা, বিতস্তা, বিপাশা আর চন্দ্রভাগা। দেখতে তার নির্ঝর, নেমে আসে পাহাড়ের অঙ্গে বেয়ে। আসে নৃত্যের ছন্দে, নূপুরের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে। দেখতে ভেরীনাগ, অনন্তনাগ আর কোকোরনাগ। দেখতে চশমাসাহী আর আচ্ছাবল। দেখতে তার দিগন্তপ্রসারী হ্রদ, উলার, ডাল, গন্ধর্ববল আর মানসবল। দেখতে তার স্বর্গোদ্যান, শালিমার আর নিশাত। দেখতে পীর গঞ্জলের আর নাঙ্গা পর্বতের তুষারকিরীট খেলন মার্গ থেকে আর খাজোয়াসের তুষারের হ্রদ বা গ্লেশিয়ার সোনামার্গ থেকে। সবার উপরে দেখতে কাশ্মীর আর গান্ধার স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, মার্তণ্ডের আর অবন্তীশ্বরের মন্দির। দেখতে মন্দির পাণ্ড্রেথানে আর পত্তনে, বুকে নিয়ে আছে প্রকৃষ্টতম ভাস্কর্যের প্রতীক। দেখতে কাশ্মীরের শিল্পী আর শিল্প-সম্ভার। দেখে চরিতার্থ হবে নয়ন। ধন্য হবে জীবন, পূর্ণ হবে আজন্মের বাসনা যা লুক্কায়িত আছে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। সফল হবে কাশ্মীর দর্শনের স্বপ্ন।

শুনি স্থান হবে না হাওয়াই জাহাজে। হাওয়াই জাহাজে যাওয়া হবে না যুক্তিসঙ্গতও। প্রচণ্ড বর্ষায় প্লাবিত চারিদিক। মেঘের আড়ালে দিগন্ত হয়ে আছে অবলুপ্ত। হাওয়াই জাহাজের সংঘর্ষের আশঙ্কা আছে পাহাড়ের অঙ্গে। চড়তে হবে বানিহাল। বারো হাজার ফিট উঁচু দিয়ে যেতে হবে। তাই আছে বিপদের আশঙ্কা, নিশ্চয়তা নাই হাওয়াই জাহাজের যাওয়ারও। জাহাজ ছাড়ে না আবহাওয়া যখন থাকে বিপদসঙ্কুল, দৃশ্যমান না হয় যখন পাহাড়-পর্বত, অদৃশ্য থাকে মেঘের অন্তরালে। আশঙ্কা আছে বানিহাল পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসারও আবহাওয়া যদি প্রতিকূল হয়। অবশেষে স্থির হয় বাসে যাওয়ার। পাঠানকোট থেকে জম্মু সত্তর মাইল। সেখান

থেকে যেতে হবে আরও দু'শ মাইল পথ, তবেই পৌছান যাবে শ্রীনগরে, কাশ্মীরের রাজধানীতে।

ষ্টেশনের প্রাঙ্গণে অসংখ্য বাস সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কারও অঙ্গে লেখা আছে সরকারি বাস, কারও অঙ্গে টুরিষ্ট। মর্যাদায় তারা 'ক' শ্রেণীর। প্রতিটি বাসে আছে একুশটি করে আসন, পুরু গদি দিয়ে মোড়া। স্থান হয় না বাড়তি যাত্রীর। যাত্রী ভরতি করে বাস শ্রীনগরের পথে রওনা হয়। পৌছায় এসে জম্মুতে বারটা থেকে দেড়টার মধ্যে। সেখানে আছে একটি অতি সুন্দর ডাকবাংলো। অনেকগুলি 'এ্যাটাচিও' আছে। স্থানের অভাব হয় না। একতলায় একটি অতি পরিষ্কার ও সুসজ্জিত ভোজনগৃহও আছে। সজ্জিত আছে সুন্দর চেয়ারে ও টেবিলে। তারই উপর দেওয়া হয় খাবার, সুপক্ক আর পরিষ্কার। কতকগুলি স্নানাগারও আছে। যাত্রীরা বাস থেকে নেমে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে খাবার খেতে বসে যায়। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বারান্দায় বিশ্রাম করে। সেখানে সাজান আছে সারি সারি চেয়ার। তারপর বাসে উঠে শ্রীনগরের পথে অগ্রসর হয়। সবগুলি বাসই ছেড়ে যায় আড়াইটের মধ্যে। রাখে পৌছবার আর যাত্রার সময়ের সমতা। পথে রাত্রিযাপন করতে হয়, তিনটি স্থান আছে। আছে ছিয়াত্তর মাইল দূরে কুদ্। সেখানে কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী সেখ আবদুল্লা বন্দী হয়ে আছেন। আরও বার মাইল দূরে পাহাড়ের শীর্ষদেশে প্রায় সাত হাজার ফিট উঁচুতে আছে বেথড ডাকবাংলো। বানিহালেও আছে একটি ডাকবাংলো। পরের দিন দেড়টা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে বাস শ্রীনগরে পৌছায়।

শুনি জম্মু পর্যন্ত কোন পাহাড় অতিক্রম করতে হবে না। যেতে হবে অনেকটা সমতল রাস্তা দিয়ে। জম্মু থেকে পাহাড়ের রাস্তা সুরু হবে। উঠতে হবে বানিহালের শীর্ষদেশে, নয় হাজার দু'শ ফিট উঁচুতে। সেখানেই আছে প্রসিদ্ধ সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে যেতে হবে পাহাড়ের অপর পারে। সেখান থেকে প্রায় চার হাজার পাঁচশ' ফিট নামতে হবে। তবেই সমতল রাস্তা পাব। সেই রাস্তায় পঁয়তাল্লিশ মাইল গেলে শ্রীনগরে পৌছাব। প্রচণ্ড বেগে বর্ষা নেমেছে, পরিণত করেছে সমতল রাস্তাকে বিপদসঙ্কুলে। তার উপর পাহাড়ে ধ্বস নেমেছে এখানে সেখানে, নেমেছে প্রায় সর্বত্র। রাস্তা হয়ে

উঠেছে অনতিক্রমণীয়। শুনে রাস্তার বর্ণনা লুপ্ত হয়ে যায় কাশ্মীর দর্শনের অদম্য বাসনা, অন্তর্হিত হয় আজীবনের স্বপ্ন ভূস্বর্গ দর্শন। মন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আশঙ্কা হয় ভূস্বর্গের পথে নেমে যেতে হবে বুঝি বাসসুদ্ধ পাতালে। সাঙ্গ হবে ভবলীলা পাহাড়ের গহ্বরে। পৌছান যাবে না শ্রীনগর পর্যন্ত, ভূস্বর্গ থেকে যাবে নাগালের বাইরে। থেকে যাবে চিরকালের জন্য। তাই স্থির করি যাব না সোজা শ্রীনগরে, জম্মুতে যাত্রা ভঙ্গ করবো। কাটাব সেখানে একদিন, যদিই লাঘব হয় পথের ক্লান্তি, সহজ হয় শ্রীনগর যাওয়া। হবে রঘুনাথজী দর্শনও।

শুনি এই বাসে জম্মুর যাত্রীর স্থান হবে না। তার জন্য পৃথক বাস আছে। আছে মাইলখানেক দূরে পৃথক ষ্টেশনও। তারা 'খ' শ্রেণীতে পড়ে। তাই নিষিদ্ধ তাদের কুলীন বাসের সংস্পর্শে আসা। তারা ছাড়ে যখন পূর্ণ হয় যাত্রীতে, নাই কোন নির্দিষ্ট সময়। পাঠানকোট ষ্টেশনে অতি সুন্দর অপেক্ষা ঘর আছে। স্নানের সুব্যবস্থাও আছে। বিশ্রামের জন্য গদি মোড়া চেয়ার আছে, আর আছে একটি ভাল রেস্তোঁরা। সেখানে সব রকমের খাবার পাওয়া যায়।

আমরা অপেক্ষা গৃহে স্থান সংগ্রহ করি। সমাপন করি প্রাতঃকৃত্য আর স্নান। ইকমিক কুকারে খাবার তৈরী হতে থাকে। খাওয়া-দাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বেলা এগারটা নাগাদ বাসের ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হই। জিনিসপত্র সাইকেল রিক্সাতে যায়। বেলা বারোটায় বাস ছাড়ে।

কিছুদূর আসবার পরই আমাদের রাস্তার একপাশে পড়ে 'রবীর খাল' কেটে আনা হয়েছে রবী নদী থেকে। করছে দু'পাশের জমি উর্বরা, করছে স্বর্ণপ্রসূ। খালের পাড় দিয়ে চলেছে জঙ্গল। কখনো ঘন কখনো পাতলা। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় খালের জল গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে। এমনই করে আট মাইল রাস্তা অতিক্রম করে রবী নদীর কিনারায় উপনীত হই। বর্ষায় নদীর বুক স্ফীত হয়েছে, হয়েছে কলনাদিনী। পাশেই এনিকাট। সংযুক্ত হয়েছে সেখানে নদীতে আর খালেতে। সীমা নাই সেখানকার গর্জনের। দেখে বিস্মিত হই নদীর জলের রঙ। একেবারে গেরুয়া। তট

পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে সেই গেরুয়া দক্ষিণে, বামে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই গেরুয়া। মনে হয় রবী রাঙিয়েছে তার শাড়ি গেরুয়া রঙে। সর্বাঙ্গে জড়িয়েছে সেই শাড়ি, বিছিয়ে দিয়েছে আঁচল। তারপর উদ্দামগতিতে অসীমের পানে ছুটে চলেছে। অপর পারে দেখা যায় দূরে অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। সৃষ্টি হয়েছে এক অতি রমণীয় পরিবেশ।

সেতু পেরিয়ে নদীর অপর পারে যাই। সেখান থেকেই জম্মু-কাশ্মীর সরকারের এলাকা স্বরু হয়েছে। কিছুদূর যেতেই বাসকে থামতে হয়। এখানে আছে একটি দপ্তর। পরীক্ষা করা হয় অনুমতি পত্র। পরীক্ষিত হয় সঙ্গের জিনিসপত্রও। দেখা হয়—যাচ্ছে নাকি কোন অবাঞ্ছিত যাত্রী, নিয়ে যাচ্ছে নিষিদ্ধ জিনিস। যাত্রীদের বাস থেকে নেমে আসতে হয়, দেখাতে হয় অনুমতিপত্র। তাঁদের লোক গিয়ে পরীক্ষা করে বাসের মাথায় রাখা জিনিসপত্র। মন্থরগতিতে দপ্তরের কাজ চলে, প্রায় দেড় ঘণ্টা থেকে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। এখানে দোকান-পত্রও আছে। আছে একটি মদের দোকানও। অনুমতি পেয়ে বাস রওনা হয়।

বাস সমান রাস্তায় চলে। দু'পাশে দেখা যায় অনুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী, ব্যবধান কোথাও বা এক মাইল, কোথাও বা বেশী। বর্ষায় প্লাবিত পাহাড়ের শীর্ষদেশ। অঙ্গ বেয়ে নেমে আসে বর্ষার জলধারা, নেমে আসে দুর্বার গতিতে, মিশিয়ে নিয়ে আসে সবুজ আবরণে আচ্ছাদিত পাহাড়ের অঙ্গের গেরুয়া রঙ। সৃষ্টি হয় কত গেরুয়া রঙ-এর ছোট বড় স্রোতস্বিনী, রাজপথের বুকের উপর দিয়ে উদ্দামবেগে প্রবাহিত হয়। দেখি নাই এর আগে এমন শোভা। অতিক্রম করি এইরকম অনেকগুলি তরঙ্গিণী। শেষে এক জায়গায় এসে রুদ্ধ হয় বাসের গতি। শুনি সম্মুখেই পাহাড়ের জলধারায় সৃষ্টি হয়েছে এক বেগবান প্রবাহের। ভেসে গিয়েছে তার প্রবল গতিতে বড় বড় পাথরের খণ্ড, রাখা ছিল রাস্তার দু'পাশে, প্রতিহত করতে স্রোতের বেগ। ভেঙ্গেছে রাস্তাও, সৃষ্টি হয়েছে এক দুরতিক্রম্য স্রোতস্বতীর। সাধ্য নাই বাস চালান তার উপর দিয়ে। উল্টে যাবে বাস স্রোতের বেগে, বাসসুদ্ধ যাত্রীর হবে সলিলসমাধি। তাই অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না প্রশমিত হয় স্রোতের বেগ।

আমাদের পাশ কাটিয়ে কয়েকটি সামরিক গাড়ি দ্রুত-গতিতে এগিয়ে যায়। বিভিন্ন তাদের আকৃতি আর বিচিত্র তাদের গঠন। একখানি ট্যাক্সিও যায়। পিছনে তাকিয়ে দেখি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে সামরিক গাড়ি। দু' একখানি বাসও আছে। দাঁড়িয়ে গিয়েছে সম্মুখে পিছনে যতদূর দৃষ্টি চলে। শুনি এই পথে প্রতিমুহূর্তেই চলে এক একখানি সামরিক গাড়ি, বয়ে নিয়ে যায় বিভিন্ন সামরিক উপকরণ। আছে নাকি বহু সৈন্য, মোতায়েন আছে জম্মুতে, আছে ততোধিক কাশ্মীরেও। আছে অনেক সামরিক ঘাঁটিও। নাই রেলপথ, নাই আর কোনও বাহন। তাই এত প্রাচুর্য তাদের।

বৃষ্টি পড়ে টিপ টিপ করে। সম্ভব হয় না নেমে দেখা। অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটতে থাকে সময়। হঠাৎ একটা সাড়া পড়ে সামনের বাসের ড্রাইভার-দের মধ্যে। কানে ভেসে আসে একটি মৃদুগুঞ্জন। এগিয়ে যায় আমাদের বাসের চালক।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বাসে স্টার্ট দেয়। শুনি সর্বাগ্রে একখানি সামরিক গাড়ি ছিল। তার চালক সাহস করে, গাড়ি নিয়ে জলে নেমেছে। পার হবে বলে দুস্তর নদী। অনেকগুলি গাড়িকে পাশ কাটিয়ে আমাদের গাড়ি নদীর পারে উপনীত হয়।

সম্মুখে দেখি এক ভীষণ গেরুয়া রঙ-এর জলের স্রোত, প্রসারিত হয়ে আছে এক মাইলেরও উপর। দক্ষিণের পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে প্রবাহিত হয় জলধারা, প্রবাহিত হয় উন্মত্ত বেগে, ভাসিয়ে নিয়ে আসে বড় বড় উপলখণ্ড। সেই বেগ এসে প্রতিহত হয় রাস্তার পাশের প্রস্তরখণ্ডে। ধারণ করে সহস্র নাগের ফণার আকার। প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে ছোটে রাস্তার উপর দিয়ে, চার পাঁচ হাত উঁচু হয়ে, বুকে নিয়ে উন্মত্ত তরঙ্গ। যায় উদ্দাম গতিতে, অমিত বিক্রমে। পীচের রাস্তা সহ্য করতে পারে না সেই গতির বেগ। সৃষ্টি হয় এক বিরাট ভাঙ্গনের। সঙ্গে নিয়ে চলে স্রোতস্বিনী প্রস্তরখণ্ড, রাস্তা, ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার গতির সঙ্গে। দেখি নাই এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য এর আগে কখনও। বাসসুদ্ধ যাত্রীর আতঙ্কে বুক ভরে ওঠে, চোখ বুজে আসে, ভগবানের নাম স্মরণ করতে থাকে। ড্রাইভার বাস চালিয়ে দেয় সেই স্রোতের উপর দিয়ে।

দুবার কেঁপে ওঠে বাস। একবার হেলে পড়ে একদিকে অনেকখানি। মনে হয় বুঝি উল্টে যাবে বাস। আমি ছিলাম ড্রাইভারের পাশের আসনে। চোখ নিবদ্ধ ছিল স্টিয়ারিং-এ। দেখি একবার কেঁপে ওঠে ড্রাইভারের হাতও। শেষে সাহসে বুক ভরে নিয়ে বজ্রমুষ্ঠিতে স্টিয়ারিং ধরে এ্যাকসিলারেটরে চাপ দেয়। লাফিয়ে উঠে বাস চলতে থাকে, পার হয়ে যায় মৃত্যুর দ্বার।

দেখি অপর পারেও সামরিক ট্রাক ও বাস সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। স্রোতের বেগ প্রশমিত হওয়ার অপেক্ষা করছে। তাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে আমাদের বাস অগ্রসর হয়। পাই সাক্ষাৎ আরও কয়েকটি স্রোতস্বিনীর আমাদের যাত্রা পথে, কিন্তু নয় তারা ভয়ঙ্কর। ক্রমে আমরা ধৈর্যের বাঁধন হারিয়ে ফেলি উৎসুক আগ্রহে, অপেক্ষা করি কখন বাস জম্মুতে গিয়ে পৌছাবে। হবে যাত্রার অবসান। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে দিগন্তে। আমাদের বাসও জম্মুর ছাউনিতে এসে পৌছায়। সেখান থেকে একটি নদী পার হয়ে আমরা জম্মু শহরে উপনীত হই। একটি উঁচু পাহাড়ের সানুদেশে এই শহরটি অবস্থিত। কয়েকটি উঁচু নীচু রাস্তা পার হয়ে এসে পৌছাই বাস ষ্টেশনে। এখানেও প্রভেদ করা হয়েছে অকুলীন ও কুলীনে। বাস ষ্টেশন থেকে টাঙ্গা করে ডাকবাংলোতে উপস্থিত হই। আশ্রয় নিই দোতলায়।

## ২

জম্মু, কাশ্মীর আর লাডাক এই নিয়ে গঠিত হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর সরকার। প্রায় একশো বছর আগে রাজপুত ডোগরা বংশীয় গোলাব সিং ছিলেন পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং-এর একজন সেনানায়ক। যেমন তাঁর প্রখর বুদ্ধি তেমনই শৌর্য। সন্তুষ্ট হন মহারাজা তাঁর শৌর্যে আর বুদ্ধিতে দান করেন তাঁকে জম্মু প্রদেশ। তিনি পরিণত হন সেনানায়ক থেকে রাজা গোলাব সিং-এ, হন জম্মুর রাজা। তিনি জয় করেন বালটিস্থান আর লাডাক, বাড়ে রাজ্যের সীমানা। রণজিৎ সিং দেহ রাখেন লাহোরে। গোলাব সিং সীমান্ত যুদ্ধে সাহায্য করেন ইংরাজকে। সাহায্য করেন অর্থ আর আশ্রয়

দিয়ে। পরাজিত হয় শিখেরা ইংরাজের কাছে। হয় এক সন্ধি অমৃত-শহরে প্রায় দু'কোটি টাকা দিয়ে গোলাব সিং পান জম্মুর কাছাকাছি সমস্ত পাহাড়ী অঞ্চল, সীমানা তার রবী নদীর পশ্চিম পাড় থেকে সিন্ধু নদীর পূর্ব পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। তার মধ্যে আছে কাশ্মীর আর গিলগিট। শেখ ইমামুদ্দিন তখন কাশ্মীরের শাসনকর্তা। তাকে পরাস্ত করে রাজা গোলাব সিং অধিকার করেন কাশ্মীর। বসেন কাশ্মীরের সিংহাসনে। হন এক বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন পুত্র রণবীর সিং। রণবীর সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিং হন কাশ্মীরের রাজা। তিনি যেমন নিরীহ তেমনই শান্তিপ্রিয়।

কাটান বেশীর ভাগ সময় ভগবানের নাম করে। কাটে পূজার ঘরে। তাঁর অক্ষমতার অজুহাতে ইংরাজ বসায় কাশ্মীরে এক রেশিডেন্সি। গড়ে তোলে এক সুরক্ষিত ঘাঁটিও গিলগিটে। সুসজ্জিত করে তাকে গোরা সৈন্য আর অপর্যাপ্ত গোলাবারুদে। রক্ষা করে ভারতে ইংরাজের রাজত্ব আফগানিস্থান চীন আর রাশিয়ার আক্রমণ থেকে। সুরু হয় কাশ্মীরে এক ভীষণ চক্রান্ত কাশ্মীরের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে। রাজার ভাই অমর সিং আর রাজস্ব মন্ত্রী যোগ দেন সেই চক্রান্তে ইংরাজের পক্ষে। মহারাজা প্রতাপ সিং থাকেন বন্দী অবস্থায়। বন্দী থাকেন নিজের প্রাসাদে দীর্ঘ পনর বছর। রাজ্যশাসনের ভার পড়ে একটি মন্ত্রণাপরিষদের উপর। চালান তাকে রেশিডেন্ট প্লোডেন যবনিকার অন্তরাল থেকে। শেষে রূপ নেয় সেই চক্রান্ত হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষে। ক্রমে বৃটিশ পার্লামেণ্টের কানে আসে কাশ্মীরের খবর। মুক্ত হন রাজা, ফিরে পান কাশ্মীরের শাসনভার। ইতি মধ্যে মৃত্যু হয় অমর সিং-এর। প্রশমিত হয় হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষ। তারপর আরও বিশ বছর রাজত্ব করেন প্রতাপ সিং। প্রজারা থাকে সুখে আর শান্তিতে। মৃত্যুর আগে বসিয়ে যান অমর সিং-এর পুত্র হরি সিংকে কাশ্মীরের সিংহাসনে। বিস্মিত হন মহারাণী। বিস্ময় বাড়ে কাশ্মীরবাসীর।

রাজা হয়ে মহারাজা হরি সিং মন দেন প্রজার ও রাজ্যের কল্যাণে। যোগ দেন গোলটেবিল বৈঠকেও। বলেন ভারতীয়দেরই পাওয়া উচিত ভারতের শাসনকর্তৃত্ব। রুষ্ট হয় ইংরাজ। মনস্থ করে কাশ্মীরে বিশৃঙ্খল সৃষ্টি

করে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করবার। কাশ্মীরের প্রজাদের মধ্যে শতকরা আশি ভাগই মুসলমান। তারা লেখা পড়া জানে না, খবর রাখে না কোন কিছুরই। হরি সিং-এর মন্ত্রী ইংরাজ ওয়েকফিল্ড-এর মারফতই ক্ষেপিয়ে তোলা হয় তাদের। সৃষ্টি করা হয় এক ধূমায়মান অসন্তোষের আগুন জম্মুতে আর কাশ্মীরে। তাতে ইন্ধন যোগায় বাইরের উর্দু খবরের কাগজগুলি আর মুসলমান নেতারা।

সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে জম্মুতে, শ্রীনগরে, সোপুরে আর বারমুলাতে। ছড়ায় কাশ্মীরেরি আকাশে বাতাসে। পুরোধা হন কাশ্মীরের সেখ আবদুল্লা, এক তরুণ শিক্ষিত মুসলমান। আলীগড় থেকে সত্যপ্রত্যাগত। জন্ম নেন কাশ্মীরের এক সাধারণ গৃহস্থের ঘরে। বাপ তৈরী করেন শাল। জম্মুতে নেতৃত্ব করেন সর্দার ইব্রাহিম এক যুবক মুসলমান ব্যারিষ্টার। মানুষ হয়েছেন পুঞ্চের এক হিন্দু জায়গীরদারের স্নেহে ও অর্থে। মহারাজ হরি সিং-এরও রাজকার্যে মন বসে না। দিন কাটান বিলাসে আর ব্যসনে। কাটে প্রমোদ-ভ্রমণে, লণ্ডনে আর প্যারিসে। খবরের কাগজের মারফতে তাঁর অপকীর্তির খবর এসে পৌঁছায় ভারতবর্ষে। শোনে কাশ্মীরবাসীও। শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন হয় কর বৃদ্ধি করার। শোষণ করা হয় প্রজাদের।

ইংরাজী ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জ্বলে ওঠে কাশ্মীরের বুকে এক বীভৎস হিন্দু-বিদ্বেষের আগুন। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় হিন্দুদের ঘর বাড়ি, লুট হয় দোকানপাট, খুন হয় কয়েকজন হিন্দু, জখম হয় অনেকে, নিখোঁজ হন ওয়েকফিল্ড সাহেব, কাশ্মীরের দেওয়ান। শেষে মহারাজের সৈন্যরা এসে থামায় দাঙ্গা, ফিরে আসে শান্তি শ্রীনগরে। আবদুল্লা আর তাঁর সঙ্গীদের পাঠান হয় হরিপর্বতের কারাগারে। ওয়েকফিল্ড হয় কর্মচ্যুত, হয় আরও অনেক অপদার্থ ও অকর্মণ্য কর্মচারী। সফল হয় না ব্রিটিশের চক্রান্ত।

কয়েক বছর অতিক্রম করে। সেখ আবদুল্লা আসেন জওহরলাল নেহরুর সংস্পর্শে। বদলে যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন এক নূতন সমিতি। নাম রাখা হয় তার ন্যাশনাল কনফারেন্স। শিখ বুধ সিং হন তার সভাপতি, ব্রাহ্মণ প্রেমনাথ বাজাজ তার কর্মকর্তা আর শেখ আবদুল্লা তার অধিনায়ক। আরম্ভ হয় কাশ্মীরে গণআন্দোলন।

মুসলিম নেতা সেখ আবদুল্লা পরিণত হন গণনায়কে। সহস্র সহস্র অজ্ঞ ও অভুক্ত কাশ্মীরবাসী পায় আশা, বঞ্চিত আর লাঞ্ছিত পায় অভয়, পায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন। হন তিনি কাশ্মীরের ব্যাঘ্র, সেরই কাশ্মীরী।

ওয়েকফিল্ডের পর প্রধানমন্ত্রী হন কাশ্মীরের পণ্ডিত রামচন্দ্র কাক। নাই তাঁর রাজনীতিতে দূরদৃষ্টি। বিরোধ হয় কাশ্মীরের মহারাজা আর ভারতের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীতে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হয় স্বাধীন, বিভক্ত হয় হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানে। ইংরাজ আমলের দেশীয় রাজারা একে একে যোগ দেন ভারত অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে। দেয় না কাশ্মীর।

কাশ্মীরের সীমানা মিশেছে ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের সঙ্গে। রাজা হিন্দু কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। তর সয় না পাকিস্তানের কর্তাদের। অপেক্ষা করতে পারেন না পাকিস্তানের স্থষ্টিকর্তা জনাব মহম্মদ আলী জিন্না। সজ্জিত করা হয় বিভিন্ন অস্ত্রে-শস্ত্রে হাজার হাজার হানাদারকে, পাঠানো হয় তাদের কাশ্মীর আক্রমণ করতে। চারিদিক থেকে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে কাশ্মীরের বুকের উপর। দখল করে গ্রাম, একের পর এক। এগিয়ে আসে লরী করে ডোমেলের পথে শ্রীনগরের দিকে। সে দলে আছে হাজার খানেকের উপর পশ্চিম সীমান্তের উপজাতি, কয়েক শত পাঠান আর অসংখ্য মুসলীম-লীগের ভলাণ্টিয়ার। কাশ্মীরের সৈন্য সংখ্যা অতি সামান্য। অর্ধেক মুসলমান, তারা যোগ দেয় হানাদারদের সঙ্গে। হানাদারেরা উরি পর্যন্ত পৌছায়। দখল করে মহুবার বিদ্যুৎ তৈয়ারীর কারখানা। এগিয়ে আসে শহরের প্রান্তদেশে। মৃত্যুবরণ করেন কাশ্মীরের প্রধান সেনাপতি রাজেন্দ্র সিং হানাদারদের বাধা দিতে গিয়ে। শ্রীনগরের অধিবাসীরা পালাতে থাকে শহর থেকে। পালায় দলে দলে মোটর লরীতে, টাঙ্গায়, গরুরগাড়ি করে আর পায়ে হেঁটে। যদি পায় নিরাপদ আশ্রয়।

অগত্যা মহারাজাকে নিতে হয় ভারতের সাহায্য, যোগ দিতে হয় ভারতের সঙ্গে। ভারত সরকার পাঠান সৈন্য, প্রেরণ করেন অস্ত্র-শস্ত্রও। বিতাড়িত হয় হানাদারেরা পত্তন থেকে, বারমুলা থেকে, উরি থেকে। বিতাড়িত হয় নৌশেরা, রাজৌরী আর পুঞ্চ থেকেও। রেখে যায় কাশ্মীরের বুকে এক

নির্মম অত্যাচারের লীলা। যোগ হয় কাশ্মীরের ইতিহাসের পাতায় আরও একটি নৃশংস কাহিনী।

ভারত সরকারের দয়ায় সেখ আবদুল্লা হন কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী। নির্বাসিত হন মহারাজা হরি সিং তাঁর চক্রান্তে। যুবরাজ করণসিং হন রিজেন্ট বা রাজপ্রতিনিধি। স্থাপিত হয় কাশ্মীরে এক গণতন্ত্র। আবদুল্লা হন প্রধানমন্ত্রী সেই গণতন্ত্রের।

ক্ষমতা পেয়ে আবদুল্লার স্বভাব যায় বদলে। বেরিয়ে পড়ে স্বরূপ। পাকিস্তানের সঙ্গে তলে তলে সুরু হয় এক বিরাট চক্রান্ত। কিন্তু বিফল হয় তাঁর উদ্যম। পরিত্যাগ করতে হয় গদি। থাকতে হয় বন্দী অবস্থায় কুদের কারাগারে। বক্সী গোলাম মহম্মদ নিযুক্ত হন কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী।

ক্রমে ফিরে আসে কাশ্মীরে স্বাভাবিক জীবন। মুখর হয় ভূস্বর্গ আবার আনন্দে আর উৎসবে। আসে যাত্রী দলে দলে, দেখে কৃতার্থ হয় তার সৌন্দর্য।

সকালে উঠে একটি ট্যাক্সি করে আমরা রঘুনাথজীর মন্দির দেখতে যাই। একটি বিশাল সিংহ-দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, এক বৃহৎ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে, একটি দীর্ঘ অলিন্দ দিয়ে আমরা উপনীত হই দ্বিতীয় প্রাকারে। প্রাকার অতিক্রম করে প্রবেশ করি মূল মন্দিরে, বেষ্টিত হয়ে আছে মন্দিরও একটি অলিন্দে। দেখে বিস্মিত হই রঘুনাথজীর অপরূপ রূপ। দেখি অনবদ্য শিল্প-সম্ভারে শোভিত হয়ে আছে মন্দিরের ভিতরের ছাদ আর দেওয়ালও। প্রাকারের বিপরীত দিকে, দেবতার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন যুক্ত করে এক বিশালকায় হনুমানজি দেবতার বাহন। পূজা দিয়ে বেরিয়ে আসি প্রথম প্রাকারে। বেষ্টিত হয়ে আছেন রঘুনাথ অসংখ্য দেবতায়। বিরাজ করেন তাঁরা প্রথম প্রাকারে এক একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে। দেখি একে একে সবগুলি মন্দির, প্রণাম জানাই দেবতাদের। বাইরের প্রাচীরের সংলগ্ন আছে একটি হনুমানজির মন্দির আর কয়েকটি জম্মু কাশ্মীরের রাজাদের সমাধি। শুনি নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি রাজা গোলাব সিং। আছে জম্মুতে আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দির দেখে আমরা ডাকবাংলোতে ফিরে আসি।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## কাশ্মীর

### ক্ষীরভবানী মন্দির, শঙ্করাচার্যের মন্দির, অবন্তীশ্বরের মন্দির, অবন্তীস্বামীর মন্দির, মার্তণ্ড মন্দির, কুন্তী মন্দির, শঙ্কর-গৌরীশ্বরের মন্দির, সুগন্ধেশার মন্দির, পাণ্ডেথানের মন্দির

রঘুনাথজির মন্দির দেখে ফিরে এসে, স্নান আর আহার শেষ করে আমরা শ্রীনগরে যাওয়ার বাসে উঠে বসি। আমাদের বাস বেলা দু'টোয় ছাড়ে। তখন ঘন মেঘে আচ্ছাদিত হয়েছে দিগন্ত। সুরু হয়েছে বৃষ্টিও।

জম্মুর রাজপ্রাসাদ ও সরকারী দপ্তর অতিক্রম করে আমরা শহরের বাইরে উপনীত হই। বাস জম্মু-কাশ্মীরের রাস্তায় মোড় নেয়। সুরু হয় পাহাড়ের কোল ঘেঁসে আঁকা বাঁকা পথ। মোড় নিতে হয় বাসকে প্রতি সেকেণ্ডে। ডান পাশে নীচে যেথা যায় সবুজের মেলা। অতিক্রম করি মাইল আট দশ এই রকম রাস্তা, অনেকটা সমান পথ পাই। কাছের পাহাড় সরে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। এই রকম রাস্তায় আরও দশ বারো মাইল গিয়ে উদমপুরে পৌছাই। জম্মু সরকারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এই উদমপুর। পাহাড়ের উপর দেখা যায় শহর। দাঁড়িয়ে আছে জম্মুর রাজবাটী, আছে কয়েকটি দেবালয়ও। বাস থেকে দেখা যায় মন্দিরের চূড়া। আমাদের সঙ্গী উদমপুরের গল্প বলেন। দেখা যায় বাঁ দিকে গাছের নীচে সারি সারি তাঁবু। সামরিক লোকেরা বাস করেন এই সব তাঁবুতে। এইটিই নাকি এখানকার একটি ছাউনি, বৃহত্তম ছাউনির অন্যতম। বাস থামে। আমরা সকলেই নেমে পড়ি। কিছুক্ষণ পায়চারী করে পায়ের আড়ষ্টতা কমিয়ে নেই। ড্রাইভার জলে ভরতি করে নেয় ইঞ্জিন। জনপনর মুসলমান যাত্রীও ছিলেন সেই বাসে। তাঁরা রাস্তার উপরই হাঁটুগেড়ে নমাজ পড়তে বসে যান। ড্রাইভারের জল ভরা শেষ হয়, সবাই একে একে বাসে ওঠেন। ড্রাইভার হর্ণ দিতে থাকে। ওঠেন না দু'জন যাত্রী। শেষ হয় না তাঁদের নমাজ পড়া। ড্রাইভার বলে,

তাঁরা সকলেই আসছেন মক্কা থেকে, হজ্ করে। তাই কারও সাহস নাই তাঁদের ডাকবার, নাই সাহস ফেলে চলে যাওয়ারও। অপেক্ষা করতে হয় যতক্ষণ না তাঁরা বাসে ওঠেন। বাস ছাড়তে বিলম্ব হয়।

উদমপুরের পর থেকেই আরম্ভ হয় উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী, তার গা ঘেঁষে রাস্তা বঙ্কিম গতিতে যায়। অপর দিকে গভীর খাদ। খাদের ওপারেও উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী দিগন্তে বিস্তৃত হয়েছে। এক ভীতিপূর্ণ অথচ সুন্দর পরিবেশ। উঠি পাহাড়ের শীর্ষদেশে আবার নেমে যাই নীচুতে। এমনই করে অতিক্রম করি অনেকগুলি পাহাড়। পথের পাশের মাইল পোষ্ট দেয় দূরত্বের পরিচয়, জানায় স্থানের উচ্চতাও। আবার বৃষ্টি সুরু হয়। রাস্তাও ক্রমেই হয়ে ওঠে অনতিক্রমণীয়। কমে আসে বাঁকের ব্যবধানের দূরত্ব, হ্রাস পায় রাস্তার আর খাদের ব্যবধানও। গভীরতর হতে থাকে খাদের গহ্বর। আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে ওঠে সমস্ত শরীর, মোড় নেয় যখন বাস। আশঙ্কা হয় বাসসুদ্ধ যাত্রীর হবে বুঝি গহ্বর-সমাধি। তার উপর বৃষ্টিতে ধস নেমেছে পাহাড়ের অঙ্গে। ভয় হয় কখন পাহাড় থেকে খসে পড়বে একাধিক বড় পাথরের খণ্ড। বাস গুঁড়িয়ে যাবে তার তলায়। পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হবে সকলের। মাঝে মাঝে সত্যিই রুদ্ধ হয় বাসের গতি। দেখা যায় বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড পাহাড়ের উপর থেকে নেমে এসে নিশ্চিন্ত মনে পথ জুড়ে বসে আসে। যেতে দেবে না কাশ্মীরে। অপেক্ষা করতে হয় বাসকে যতক্ষণ না সামরিক লোকেরা এসে সেই প্রস্তর খণ্ড সরিয়ে দিয়ে বাস চলার মত রাস্তা করে দেয়। দেখি সহস্র সহস্র সামরিক লোক রাস্তা পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত। নইলে সম্ভব হত না বাসের শ্রীনগরে যাওয়া। অচল হত শ্রীনগরে যাতায়াত, পৌঁছাত না যাত্রী আর খাদ্য। শ্রীনগরবাসীদের সীমাহীন দুরবস্থায় পড়তে হত। কোথাও দেখা যায় বৃষ্টির জলধারা ছুটে আসে গর্জন করতে করতে। আসে পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে। সৃষ্টি হয় রাস্তার বুকে এক বেগবতী স্রোতস্বিনী। সৃষ্টি হয় রাস্তার বুকে দুরতিক্রমণীয় ভাঙ্গনও। একটু অসাবধান হলেই গড়িয়ে যাবে বাস, পড়বে গিয়ে সহস্র ফিট গভীর খাদে। চিহ্ন থাকবে না বাসের। যাত্রীরা গুঁড়িয়ে যাবে তার নীচে। পৌঁছাবে না সে খবর বাহিরের জগতে। সেখানেও দেখি সামরিক কর্মচারী রাস্তা মেরামতের কাজে নিযুক্ত। তাই সম্ভব হয় বাসের চলা।

আতঙ্কের ছায়া ফুটে ওটে সকলেরই মুখের ওপর। ওঠে না শুধু আমার পাশের সম্ভ্রান্ত মুসলমান সহযাত্রীটির আর তাঁর স্ত্রীর। দেখি কখন তিনি সরিয়ে ফেলেছেন বোরখা তাঁর মুখের উপর থেকে। অন্তরাল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে একখানি সুন্দর কচি মুখ। তাঁরা দু'জনেই আমাকে সাহস দেন। বলেন, ড্রাইভার খুব হুঁশিয়ার। ভয় নাই কোন আকস্মিক বিপদের। তাঁরা বহুবার এই রাস্তায় যাতায়াত করেছেন, তাঁদের পড়তে হয় নাই কখনও কোনও বিপদে। উল্টায় নাই বাস, পড়ে নাই খাদে। তাঁরা নিরাপদে শ্রীনগরে পৌঁছে গিয়েছেন। ভ্রূক্ষেপ নাই আমার স্ত্রীরও। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরের পানে, উপভোগ করছেন প্রকৃতির শোভা। তিনিও ভরসা দেন, আশ্বাস দেন নিরাপদে পৌঁছাবার। পাই ভরসা, কিন্তু দূর হয় না ভীতি, লাঘব হয় না দুশ্চিন্তার। কেবলই মনে হতে থাকে উচিত ছিল বাসে না আসা, হাওয়াই জাহাজের আসনের জন্য জম্মুতে অপেক্ষা করা। শোনা উচিত ছিল আমার জম্মুর সামরিক বাঙালী সহযাত্রীর উপদেশ। তাঁর কাছেই প্রথমে রাস্তার বিপদের কথা শুনি। নামবার সময়ও তিনি সাবধান করে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাসে যাওয়া হবে না যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু নাই এখন অন্য কোনও উপায়। ধরতেই হবে ধৈর্য। তাই গল্প সুরু করে দেই সেই মুসলমান সহযাত্রীর সঙ্গে। যদিই কাটে সময় অন্যমনস্কতার মধ্যে। দেরী হয় না গল্প জমতে, যখন শুনেন আমরাও কাটিয়েছি দীর্ঘ দু'বছর বোম্বাইতে। কাটিয়েছি তার পরেও আরও কিছুদিন। গল্প হয় বোম্বাই এর, গল্প হয় কাশ্মীর-এর। শুনি কি কি আছে দর্শনীয় কাশ্মীরে। শুনি হানাদারদের অত্যাচারের কথা। শুনি আবদুল্লার কীর্তির কাহিনী, শেষে কি করে হয় তাঁর পরিবর্তন, হয় পতন। শুনি আরও অনেক কিছু। ক্রমে তাঁর স্ত্রী ও আমার স্ত্রীও যোগ দেন আমাদের সঙ্গে। জানা যায় না কোথা দিয়ে কেটে যায় সময়। হঠাৎ রুদ্ধ হয় বাসের গতি। শুনি কুদে এসে পড়েছি। এই খানেই বন্দী অবস্থায় আছেন শেখ আবদুল্লা, কাশ্মীরের ব্যাঘ্র।

দেখি অনেকগুলি বাস দাঁড়িয়ে আছে। কতক এসেছে শ্রীনগর থেকে। এসেছে কয়েকখানি জম্মু থেকেও। তারা ছিল আমাদের অগ্রগামী। দেখি বাস থেকে যাত্রীরা নামছে। আমরাও বাস থেকে নামি। জানতেই পারি

নাই কখন বৃষ্টি থেমেছে, আকাশ হয়েছে নির্মেঘ, মেঘেরা আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়ের কোলে। বেলা শেষের লাল আভা পড়েছে দূরের পাহাড়ের চূড়ায়, ছেয়ে ফেলেছে চূড়া, ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্তে। সামনে, পাশে, যতদূর দৃষ্টি চলে, সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে দেওদারের গাছ, দাঁড়িয়ে আছে পাইনও, শোভা করে আছে পাহাড়ের অঙ্গ আর শীর্ষদেশ। সৃষ্টি করেছে এক অতি রমণীয় পরিবেশ। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। প্রায় ছ'টা বাজে। পাহাড়ের বুকে সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও নামেনি, দৃশ্যমান রাস্তা। যাত্রীদের মধ্যে জল্পনা সুরু হয়। একদলের ইচ্ছা কুদেই রাত্রিবাস করা। অন্যদল বেথড্ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে চায়। নাই কোনও নিশ্চয়তা বর্ষণের সময়ের, তাই যতদূর এগিয়ে থাকা যায়। বেথড্ ডাকবাংলো এখান থেকে বার মাইল দূরে পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি পাহাড়ের শোভা, হজযাত্রীরা নিযুক্ত নমাজ পড়ায়, হঠাৎ একটি মিহি গলার আহ্বানে চমকে ফিরে দেখি আমার সেই মুসলমান সহযাত্রিনী দাঁড়িয়ে আছেন একেবারে পেছনে। বলেন, "আপনাদের কি অভিপ্রায়। আপনারাও কি এখানেই রাত্রিবাস করতে চান?" বাসনা জাগে মনে এগিয়ে যেতে, দেখতে প্রকৃতির অপরূপ সাজ। বলি "নিশ্চয়ই এগিয়ে যেতে চাই।" শোনা মাত্র তিনি হাসিমুখে প্রস্থান করেন, দাঁড়ান গিয়ে স্বামীর পাশে। তাঁরাও চান এগিয়ে যেতে। স্বপক্ষে মতের সংখ্যা বাড়াতে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়াই স্থির হয়। আমরা বাসে উঠে পড়ি। ওঠেন হজযাত্রীরাও। জম্মুর যাত্রীদের থাকতে হয় কুদে। নাই সত্তর মাইলের আগে আর কোন ডাকবাংলো, নাই রাত্রিবাসের স্থান।

দু'পাশের পাইনের বনের ভিতর দিয়ে বাস চলে বঙ্কিম গতিতে। উঠতে থাকে পাহাড়ের শীর্ষদেশে। ধীরে ধীরে তপনদেব অস্তমিত হতে থাকেন পশ্চিমের পাহাড়ের অন্তরালে। অস্তরবির লালরশ্মি ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের শীর্ষদেশে, পাইনের মাথায়, পাহাড়ের বুকে। রাঙিয়ে তোলে দিগন্ত। নিস্তব্ধ পাইন কুঞ্জ, নীরব পাহাড়ের অঙ্গ, মুগ্ধ বিস্ময়ে মুক হয় হৃদয়ের তন্ত্রী। স্তব্ধ হয়ে দেখি প্রকৃতির অপরূপ শোভা। জানা যায় না কখন বাস এসে পৌঁছায় পর্বতশিখরে, প্রায় ন'হাজার ফিট উঁচুতে। আবার বাস নামতে থাকে।

অতিক্রম করে অনেকগুলি পাইনের কুঞ্জ। প্রায় হাজার খানেক ফিট নেমে, বেথড্ ডাকবাংলোর সামনে এসে থামে। রাস্তা থেকে কয়েক গজ উপরে, একটি উঁচু পাহাড়ের সানুদেশে, একেবারে পাহাড় ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে ডাক-বাংলোটি। নিভৃতে লুকিয়ে বসে আছে একটি পাইন কুঞ্জের ভিতরে। সামনে, পিছনে, পাশে, পাহাড়ের অঙ্গে আর শীর্ষদেশে শোভা করে আছে পাইনের কুঞ্জ, আছে ধাপে ধাপে, আছে থাকে থাকে, সৃষ্টি করে আছে এক স্বর্গীয় পরিবেশ।

অবাক হয়ে দেখতে থাকি সেই শোভা। এমন সময় আমার কাশ্মীরের সঙ্গী এসে বলেন, "শীগগির গিয়ে একটি ঘর দখল করে বসুন, নইলে পাওয়া যাবে না ঘর। আমি ধ্যান 'সংকে নিয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে আনতে যাচ্ছি।" দেখি সবাই ঘর দখল করবার জন্য ছুটেছেন। ছুটেছেন কাশ্মীরী দম্পতিও। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করতেই দেখি দু'টি বাংলো রয়েছে পাশাপাশি। একটি মাঝারি আকৃতির, দ্বিতীয়টি ক্ষুদ্রতর। যাই প্রথমটিতে, আছে সেখানে চারটি সুইট। প্রতি ঘরেই রাখা আছে কিছু না কিছু জিনিস। কোথাও নেয়ারের খাটিয়ার উপর শোভা পাচ্ছে একটি হ্যাণ্ডব্যাগ, কোথাও এক এ্যাটাচি শোভা করে আছে চেয়ার, কোথাও মেঝে আলো করে আছে একটি ছোট শয্যাধার বা হোল্ডল। কিন্তু সন্ধান পাই না কোন লোকের। ছুটে যাই দ্বিতীয়টিতে। সেখানে আছে মোটে দুইটি সুইট তখনও খালি। তারই একটি দখল করি সঙ্গে কোন জিনিস না থাকায় স্ত্রীকে দখলের প্রতীক রেখে বারান্দায় বেরিয়ে এসে ব্যাপারটি ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করি। দেখি ইতিমধ্যেই আমাদের পাশের সুইটটিও অধিকৃত হয়েছে। অধিকার করেছেন একটি পাঞ্জাবী দম্পতি। দেখি তখনও হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে ছোটাছুটির অন্ত নেই, শেষ নেই তাদের আসা-যাওয়ার। আমাদের বারান্দায় দেখতে পেয়ে চৌকিদার এগিয়ে আসে। তার মুখেই শুনি, আছে মোটে ছয়টি ঘর এই দুইটি বাংলোতে, আছে আরও দু'টি ছোট ঘর উপরে রান্নাঘরের সংলগ্ন। যাত্রীরা অনেক বেশী সংখ্যায় আসে। তাই যে আগে প্রবেশ করতে পারবে সেই পাবে ঘরের অধিকার, পাবে রাত্রির প্রভুত্ব। যাত্রীদেরই কুলীর সাহায্যে নামিয়ে আনতে হয় বাসের মাথায় রাখা জিনিসপত্র, বলে

দিতে হয় কোন ঘরে রাখা হবে সেগুলি, তাই ঘর অধিকারের প্রতীক হয়ে থাকে তাদের নিজের হাতে রাখা জিনিসগুলি। জানিয়ে দেয় নিষেধের বার্তা। এখানে ঘর না মিললে যেতে হয় অনেক নীচুতে। সেখানে একটি বাজার আছে, বাজারে ভাড়ার জন্য খানকতক ঘর আছে। আছে প্রতিটি ঘরে চার থেকে ছয়খানি করে নেয়ারের খাটিয়া। আট আনা দর্শনী দিয়ে অধিকার করতে হয় তাদের একখানি। কাটাতে হয় রাত্রি সেই খাটিয়ায় শুয়ে। সঙ্গে থাকে অন্য যাত্রীও। নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না ছারপোকার হাত থেকেও। শুনি সেখানে স্থানের অভাব হয় না. কিন্তু সুবিধা নাই বাসের, নাই স্বাচ্ছন্দ্যও।

তার উপর সহজ নয় অন্ধকারে পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে নীচে নামা, পৌছান বাজারে। মনে মনে প্রণাম জানাই সৃষ্টিকর্তাকে। যাঁর অসীম করুণায় সম্ভব হয়েছে ডাকবাংলোতে ঘর পাওয়া। নইলে পড়তে হোত চূড়ান্ত অসুবিধায়। কল্পনাতেও শিউরে ওঠে অঙ্গ। ততক্ষণে আমার কাশ্মীরের সঙ্গীটিও অন্য সব জিনিসপত্র নিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন। দেখি বদল হয়েছে একটি হোল্ডল। ভাবছি কেমন করে পাওয়া যাবে নিজের হোল্ডলটি। এমন সময় কুলির সঙ্গে তার সত্যিকারের মালিক এসে হাজির। ধ্যান সিং তাঁর সঙ্গে গিয়ে বদলে নিয়ে আসে আমাদের হোল্ডলটি। আসেন ফিরে একে একে অন্য সব ঘরের অধিকারী কুলির মাথায় জিনিসপত্র বোঝাই করে। আমরা যখন উপভোগ করছি স্বর্গীয় পরিবেশ, মুগ্ধ হয়ে দেখছি প্রকৃতির শোভা, সেই ফাঁকে তাঁরা প্রবেশ করছেন এইসব ঘরে। রেখে গিয়েছেন প্রথম প্রবেশের প্রতীক, প্রতীক ঘরের প্রভুত্বেরও।

চৌকিদারকে গরম জল আর চা আনতে বলে আমরা বারন্দায় এসে বসি। সেখানে ম্যাটিং-এর ওপর সাজান আছে সারি সারি গদি মোড়া চেয়ার। আমার সঙ্গী যান নীচে। যান তাঁর আর ধ্যান সিং-এর রাত্রি বাসের ব্যবস্থা করতে। ভরসা দিয়ে যান আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবার। চৌকিদারের আনা গরম জলে স্নান করে আমরা তৈরী হয়ে নেই। ড্রাইভার এসে জানিয়ে যায় কাল ভোর সাড়ে পাঁচটায় বাস ছাড়বে। তার আগেই সবাইকে জিনিস-পত্র নিয়ে বাসে উঠতে হবে। নইলে দেরী হবে শ্রীনগরে পৌঁছাতে।

চা পান করে সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে উপরের বাজার দেখতে রওনা হই, যদি

কোন ভাল খাবার পাই। রাস্তায় নেমে দেখি আরও তিনখানি বাস দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির সামনে। নিয়ে এসেছে যাত্রী শ্রীনগর আর জম্মু থেকে। তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাই। দেখি রাস্তার দু'পাশে সারি সারি দোকান, বিস্তৃত হয়ে আছে মাইল খানেক পরিধি নিয়ে। সব রকমের দোকান আছে। কাপড়ের দোকান, জুতোর দোকান, আছে একটি ছোট মোটর গ্যারেজও, সেখানে মেরামতের কাজ হয়। খাবারের দোকানের সংখ্যাই সব চাইতে বেশী। সেখানে তৈরী হচ্ছে তন্দুরের রুটি, খাঁটি ঘিয়ের মোটা মোটা পরটা আর মাংস। যাত্রীরা দোকানের সামনে রাখা বেঞ্চির উপর বসে রুটি পরটা আর গরম মাংস খাচ্ছেন। জলন্ত উনুনের উপর চাপানো কড়া থেকে তুলে দিচ্ছে। এদের মধ্যে দেখি একদল বাঙ্গালী যাত্রীও, স্থান সংগ্রহ করেছেন নীচের বাজারে। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া যায় একটি হালুইকরের দোকান। বাজারের একেবারে শেষপ্রান্তে। সেখানে তৈরী করিয়ে নেই কিছু গরম সিঙাড়া। এই দোকানটি ছাড়া প্রায় সব দোকানের, মালিকই শিখ। বসে আছেন বিরাট বপু ও ততোধিক বিপুল দাড়ি গোঁফ আর চুলের সমষ্টি নিয়ে দোকান আলো করে। দোকানদার বলে, তারা পাঞ্জাব থেকে ব্যবসা করতে এসেছে, নিয়ে যাচ্ছে টাকা। সহ্য হয় না কাশ্মীরবাসীর এইসব পরিশ্রম আর অসুবিধা। তাই তাদের অর্থে স্ফীত হয় বিদেশীর পকেট। দিনের আলোয় যাত্রীবাহী বাস যাতায়াত করে, রাত্রিতে লরী আর ট্রাক, বয়ে নিয়ে যায় অন্য দ্রব্য। বিরাম নেই এই যাতায়াতের। যাচ্ছে প্রায় প্রতি মিনিটেই। তাই অভাব হয় না খদ্দেরের, বন্ধ হয় না কেনা বেচা, চলে রাত্রি দিন। তা'ছাড়া খরিদ্দার আসে কিছু নীচের গ্রাম থেকে। আসে পাহাড়ের উপরকার গ্রাম থেকেও। ব্যবসা চলে বেশ ভাল ভাবেই। দু'পয়সা উপার্জন হয়। প্রবেশ নিষেধ দালদার, জম্মু-কাশ্মীর এলাকায়, নিষিদ্ধ এখানে ভেজাল দেওয়া ঘিও, তাই খাঁটি ঘিয়ের সিঙাড়া নিমকি কিনে নিয়ে ডাকবাংলোতে ফিরে আসি। ইতিমধ্যে ইকমিক কুকারে খাবার প্রস্তুত হয়েছে। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায়। উঠতে হবে ভোর চারটায়। মাঝ রাত্রিতে একবার বাইরে গিয়ে দেখি সারা বারান্দা জুড়ে যাত্রীরা শুয়ে আছেন। আছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও। স্থান নাই তিল ধারণের।

শেষ রাত্রিতে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করি। তারপর চৌকিদারের দেওয়া গরম জলে স্নান করে নেই। নেন আমার স্ত্রীও। প্রতি ঘরের সঙ্গে আছে একটি ক্ষুদ্র ড্রেসিং রুম, ক্ষুদ্রতর স্নানের জায়গা আর ক্ষুদ্রতম 'ফ্লাসড্ ল্যাট্রিন'। তারপর বিছানা-পত্র বেঁধে বাইরের বারান্দায় এসে বসি। হাজির হন কাশ্মীরী সঙ্গীও, লেগে যান কুলির আর ধ্যান সিং-এর সাহায্যে বাসের মাথায় জিনিসপত্র তুলতে। আমরা চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। এমন সময় পাশের বাংলো থেকে বেরিয়ে আসেন আমাদের বাসের প্রতিবেশী, সেই মুসলমান দম্পতি। অভ্যর্থনা করেন হাসি মুখে। বলেন, কাল তাঁদের সঙ্গে আনা খাবার নষ্ট হয়ে যায়, অবশিষ্ট থাকে না চৌকিদারের তৈরী খাবারও, হয়ে যায় নিঃশেষ। তাঁদের নীচের বাজারে খাবার সংগ্রহ করতে যেতে হয়। রাত্রি গভীর হয় সেখান থেকে ফিরতে। তাই রাত্রিতে আমাদের খবর নিতে সক্ষম হন নাই। সেজন্য তাঁরা খুবই দুঃখিত। তাঁদের এই অপরাধ আমরা যেন মার্জনা করি। চৌকিদার চা, টোষ্ট্ আর মাম্লেট নিয়ে আসে। সেগুলি তিনজনে ভাগ করে খাই। আমার স্ত্রী এ সব রসে বঞ্চিত। প্রতিবেশী আর এক প্রস্থ চা আনান, সেগুলিও তিনজনের মধ্যে ভাগ হয়। ইতিমধ্যে ড্রাইভার এসে বার দুই তাগিদ দিয়ে যায়। ঘরের দর্শনী চার টাকা আর চা ও খাবারের দাম মিটিয়ে দিয়ে গল্প করতে করতে ধীরে সুস্থে বাসে উঠি। অল্পক্ষণ পরেই বাস ছাড়ে।

বাস কয়েক হাজার ফিট নামে, যায় বঙ্কিম গতিতে। ভোরের শীতল বাতাস জুড়িয়ে দেয় দেহ আর মন। পাহাড়ের শোভা দেখতে দেখতে যাই। মাঝে মাঝে বাসের গতি প্রশমিত হয় দাঁড়িয়ে যায় এক পাশে। যেতে দিতে হয় সামরিক গাড়িকে। তারা যায় এক যোগে, চলে মন্থর গতিতে, রাখে প্রতিটি গাড়ির সঙ্গে দূরত্বের সমতা। এক একটি "কনভয়ে" প্রায় একশ'খানি গাড়ি থাকে। যেতে বিলম্ব হয়। অস্থির হয়ে ওঠে বাসসুদ্ধ যাত্রী।

আবার চড়াই সুরু হয়। বদলাতে থাকে রাস্তার রূপও। হতে থাকে ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতর। হয় ভয়ঙ্করতম। হয় দুর্গমতম। হ্রাস হতে থাকে বাঁকের ব্যবধান। পাশের গহ্বর হয় গভীরতর। আরম্ভ হয় বৃষ্টিও।

প্রতি মুহূর্তেই বাসের খাদে পড়বার আশঙ্কা থাকে। আতঙ্কের শিহরণ খেলে যায় সকলেরই অঙ্গে, তার আভাস মুখের উপর প্রস্ফুটিত হয়। শেষে রুদ্ধ হয় বাসের গতি। দেখি দাঁড়িয়ে আছে আর একখানি বাস। যাত্রীরা নেমে পড়েছে বাস থেকে। আমরাও নেমে পড়ি। এগিয়ে গিয়ে দেখি প্রায় হাজার খানেক ফিট নীচে একখানি বাস মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। লুকিয়ে আছে মুখ পাহাড়ের অঙ্গে। জানতে দিতে চায় না অক্ষমতার লজ্জা। শুনি, ঐ বাসটি আমাদের অগ্রগামী ছিল, নিয়ে চলেছিল শ্রীনগর থেকে আট দশ জন সামরিক যাত্রী। বাঁকের মাথায় মোড় নিতে গিয়ে বাসের একখানি চাকা হড়কায়, গড়িয়ে যায় বাস, পাহাড়ের একেবারে নীচে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সমাধিস্থ হয় বাসের তলায় সবগুলি যাত্রী। রক্ষা পায় শুধু চালক, কোন রকমে বাস থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে। কয়েকজন গ্রামবাসী তাকে দেখতে পেয়ে শুশ্রূষা করে। সে প্রাণ ফিরে পায় তাদের দয়াতে। তাদেরই একজন এই খবর নিয়ে এসেছে। খবর শুনে সমস্ত যাত্রীর আতঙ্কে ভরে যায় বুক। চালকেরাও কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রায় আধ ঘণ্টা কাটে। তারপর সকলে মিলে বাসে উঠে বসি। বাস শ্রীনগরের পথে চলতে থাকে। প্রতি মুহূর্তেই বিপদের আশঙ্কা করি। করেন বাসসুদ্ধ যাত্রীই।

আরও ঘণ্টাখানেক চলবার পর কমে আসে রাস্তার ভীষণতা। দেখা যায় দক্ষিণে দূরের পাহাড়ের অঙ্গে একটি রূপালী রেখা। আমার মুসলমান বন্ধুটি বলেন, "ঐ রেখাই নাকি চন্দ্রভাগা, পঞ্চ আবের অন্যতমা। জন্ম নিয়েছেন আরও দূরের এক পাহাড়ের গর্ভে। ছুটে আসছেন পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে।" জন্ম নিয়েছেন আরও তিনটি পবিত্র নদী ইরাবতী, বিতস্তা আর বিপাশা এই কাশ্মীরেই। ধন্য করেছেন কাশ্মীরকে। জন্মান নাই শুধু শতদ্রু। বাস অতিক্রম করতে থাকে পাহাড়ের পর পাহাড়, স্পষ্টতর হত থাকে সেই রেখা। হতে থাকে নিকটতরও। ক্রমে বাড়তে থাকে তার কলেবর, পরিণত হয় এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীতে। নিকটতম হতে থাকে স্রোতস্বিনী। শেষে একেবারে রাস্তার পাশে এসে উপস্থিত হয়। বাড়তে থাকে স্ফীতি, স্পষ্টতর হতে থাকে অন্তরের ধ্বনিও। পরিণত হয় এক বেগবতী নদীতে। ছুটে যায় পাহাড়ের বেষ্টনী অতিক্রম করতে। শোনা যায় প্রথমে মৃদু গুঞ্জন, ক্রমে

গর্জনে পরিবর্তিত হয় সেই গুঞ্জন। আমরা নদীর কিনারা দিয়ে প্রায় কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করি। দেখে কৃতার্থ হই তার ক্রমবিবর্তন, মুগ্ধ হই তার সৌন্দর্যের বিকাশ দেখে। ভুলে যাই রাস্তার বিপদের আশঙ্কা, বিস্মৃত হই যাত্রার কষ্টও। বাস একটি সেতুর পারে এসে থামে। বন্ধু বলেন "এইটিই রামবানের সেতু, এইখানেই চন্দ্রভাগা অতিক্রম করেছে পাহাড়ের বেষ্টনী।" শোনা যায় একটি ভীষণ গর্জন। বাস থেকে নেমে সেতুর বুকের উপর গিয়ে দাঁড়াই। দেখি, গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে চন্দ্রভাগা। ছুটেছে উন্মত্ত বেগে। ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাহাড়ের বুকের উপর লক্ষ শত ফণা বিস্তার করে। ঝাঁপিয়ে পড়ছে রুদ্ধ আক্রোশে, অমিত বিক্রমে। পড়ছে পাহাড়ের বেষ্টনী ভাঙ্গবার জন্য। আবদ্ধ থাকবে না আর মাতৃ-জঠরে, থাকবে না কারাগৃহে। ভাঙ্গতেই হবে কারাপ্রাচীর। লাভ করতে হবে মুক্তি। রূপ নিতে হবে ষড়ৈশ্বর্যময়ী অন্নপূর্ণার, করতে হবে কাশ্মীরকে শস্যশ্যামল। সহ্য করতে পারে না সে উদ্দাম বেগ হিমালয়। গুঁড়িয়ে যায় পাহাড়ের অঙ্গ স্রোতের বেগে। দিতে হয় যাওয়ার পথ, দিতে হয় মুক্তি। মুক্তিলাভ করে মৃদু গুঞ্জনে এগিয়ে যায় চন্দ্রভাগা, হাসির লহর তুলে যায়। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি কিছুক্ষণ চন্দ্রভাগার এই অপরূপ রূপ। দেখি স্তব্ধ হয়ে। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে নদীর অপর পারের পাহাড়ের শীর্ষদেশে। প্রভাতের সূর্য-কিরণে উদ্ভাসিত হয়েছে পাহাড়ের চূড়া। যেন হাসছে হিমালয়। বলছে "কি দেখছো অমন করে। আমি স্বেচ্ছায় বরণ করেছি এ পরাজয়। বরণ করেছি আমারই এক আত্মজার কাছে। বরণ করেছি তোমাদের কল্যাণের জন্য। করেছি জগতের হিতের জন্য। তাই নাই কোনও গ্লানি, নাই কোনও লজ্জা। এসেছিলেন একদিন শ্রীরামচন্দ্রও, দেখে গিয়েছিলেন আমার পরাজয়। তিনিই নির্মাণ করেছিলেন এই সেতু। সেতু পার হয়ে এসে আমাকে প্রণাম জানিয়ে গিয়েছিলেন।" বন্ধু বলেন, "এই-খানেই প্রথম সেতু নির্মাণ করেন শ্রীরামচন্দ্র, তাই খ্যাতিলাভ করে এই স্থান রামবান নামে। পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর নির্মাণ করেন এক সুন্দর সেতু, তার সংস্কার করেন ইংরাজ।"

আবার গাড়ি ছাড়ে। এবারে একটি স্লেটের পাহাড় অতিক্রম করতে হয়। বন্ধু বলেন, এখান থেকে রামসু পর্যন্ত চল্লিশ মাইল রাস্তাই সব চাইতে

বিপদ-সঙ্কুল। প্রতি মুহূর্তেই পাহাড়ের ধ্বসে পড়বার সম্ভাবনা আছে। দেখি ধ্বস নেমেছেও বহু স্থানে। কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে প্রতি জায়গাতেই এক একজন সামরিক কর্মচারী, পথ করে দিচ্ছে বাস চলবার। তবুও ভয়ে ভয়ে কাটাতে হয়, বুকে নিয়ে বিপদের আশঙ্কা। অবশেষে বাস বানিহালে এসে থামে।

বানিহাল একটি ক্ষুদ্র শহর বারো হাজার ফিট উঁচু এক পাহাড়ের একেবারে সানুদেশে অবস্থিত। এই পাহাড়ের এপারে জম্মু-সরকারের রাজত্ব, ওপারে কাশ্মীরের। পারাপারের জন্য একটি সুড়ঙ্গ আছে প্রায় বারো হাজার ফিট উঁচুতে। সমধিক খ্যাতিলাভ করেছে 'বানিহাল পাস' নামে। নির্মাণ করা হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রায় ছ' হাজার ফিট উঁচুতে আর একটি সুড়ঙ্গ সহজ ও নিরাপদ করবার জন্য কাশ্মীরের যাতায়াত। বানিহালের উচ্চতা আড়াই হাজার ফিট। দেখে মনে হয় একটি সমতল ভূমি। একদিকে পাহাড়, অপর দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে সবুজ মাঠ। দূরে, বহু দূরে, দেখা যায় পাহাড়ের শ্রেণী। রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে যায় একটি পাহাড়ী নদী, সৃষ্টি করে এক সুন্দর পরিবেশ। তারই পাশে এসে বাস থামে।

আমরা গাড়ি থেকে নামি, নামেন অন্য সব যাত্রীরাও। এতক্ষণ হাঁপিয়ে উঠেছিলাম পাহাড়ের বেষ্টনীর মধ্যে। বানিহালে নেমে পাই মুক্তির আনন্দ। মনে মনে ভাবি বেশ হতো যদি এইখানেই আজকের যাত্রার শেষ হত। কিছুক্ষণ পায়চারী করে কমিয়ে নেই কোমরের ব্যথা। স্ত্রীকে নিয়ে সামনের ডাকবাংলোতে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আসি, লাঘব হয় পথের ক্লান্তি। দোকান থেকে কিছু সিঙাড়া নিম্‌কি কিনে আর সঙ্গে আনা খাবার খেয়ে নিবারণ করি ক্ষুধাও। তার পর গল্প সুরু করে দেই সহ-যাত্রীদের সঙ্গে আর বাস ছাড়বার অপেক্ষা করতে থাকি। আধ ঘণ্টা পরে বাস ছাড়ে। কিছু দূর গিয়েই পাহাড়ে উঠতে থাকে, উঠতে থাকে শীর্ষদেশে। পাহাড়কে বেষ্টন করে উঠেছে রাস্তা, শাড়ির পাড়ের মত জড়িয়ে আছে তার অঙ্গ। দেখা যায় বাস থেকে যে সমস্ত রাস্তা অতিক্রম করে আসি। প্রথমে বেশ ভাল লাগে এই পর্বত আরোহণ। ক্রমে উঠতে থাকি উঁচুতে। নীচের বাড়ি ঘর হয়ে যায় অদৃশ্য। দেখা যায় না নীচের রাস্তাও। আবার হ্রাস হতে থাকে রাস্তার আর পাশের খাদের দূরত্ব। খাদ হতে থাকে গভীরতর, হয় গভীরতম, শেষে অতিক্রম

করে সীমা। মাথা ঘুরে যায় নীচের দিকে তাকালে। মাথা ঘোরে পাশের পাহাড়ের দিকে তাকালেও। তার ওপর, উপর থেকে বাস আসে। রাস্তা করে দিতে হয় তাদের যাওয়ার। এক চুল এদিক ওদিক গেলে, বাসের পাহাড়ের অঙ্গে আঘতের আশঙ্কা আছে, অথবা তার গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার। গুঁড়িয়ে যাবে বাস, হবে সকলেরই প্রাণান্ত। অথবা যেতে হবে পাহাড়ের অতল গহ্বরে, হাজার হাজার ফিট নীচে, সমাধিস্থ হবে বাসস্থদ্ধ যাত্রী। আশঙ্কায়, দুশ্চিন্তায় আর আতঙ্কে কাঁপে বাসস্থদ্ধ যাত্রীর অন্তঃকরণ। চোখ বুজে বিপদের বন্ধু ভগবানের শরণ নিতে থাকে। পাশের মাইল পোষ্টে নিবদ্ধ থাকে দৃষ্টি, দেখি কখন অতিক্রম করবো সবগুলি পোষ্ট। অতিক্রম করি একে একে, কিন্তু আসে বড় দেরীতে। অবশেষে ঘন কুয়াশায় ঢেকে ফেলে দিগন্ত। অবলুপ্ত হয় তার অন্তরালে রাস্তা, পাহাড়, সব। বিপদের উপর বিপদ আসে। এক সীমাহীন আতঙ্কে ছিঁড়ে যেতে চায় স্নায়ুর তন্ত্রীগুলি। অসহ্য ব্যথায় ভরে যায় বুক। মনে হয় রুদ্ধ হয়ে যাবে বুঝি নিশ্বাস, পরিসমাপ্তি হবে জীবনের। হঠাৎ শোনা যায় একটি রুদ্ধ আওয়াজ। আসে যাত্রীদের মুখ থেকে। মুসলমান যাত্রীটি চীৎকার করে ওঠেন "Oh my Lord" বলে। থেমে যায় বাসও। শুনি এসে পড়েছি বানিহালের শীর্ষদেশে। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সুড়ঙ্গ, অদৃশ্য হয়ে আছে কুয়াশার অন্তরালে। শেষ হয়েছে বিপদসঙ্কুল রাস্তাও। বাসস্থদ্ধ যাত্রী ছাড়ে মুক্তির নিশ্বাস।

সুড়ঙ্গের অপর পারে এসে আবার বাস থামে। ঘন কুয়াশায় দিগন্ত ছেয়ে ফেলে। অবলুপ্ত হয় সামনের, পিছনের আর পাশের জগৎ তার অন্তরালে, অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে। দেখা যায় না পাশের যাত্রীকেও। দেখি নাই এমন কুয়াশা পূর্বে কখনও। বাস দাঁড়িয়ে থাকে। সাধ্য নাই বাস চালানো এমন কুয়াশার ভিতর দিয়ে। হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হয়, আসে বেশ জোরে। ধীরে অতি ধীরে অপসারিত হতে থাকে কুয়াশার অবগুণ্ঠন। সরতে থাকে পৃথিবীর অঙ্গ থেকে। শেষে হন তিনি সম্পূর্ণ গুণ্ঠনমুক্ত। ভেসে ওঠে চোখের সামনে একে একে অনেকগুলি অপরূপ ছবি, যা লুকিয়ে ছিল কুয়াশার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে, ছিল অদৃশ্য হয়ে, ছিল দৃষ্টির বাইরে। দেখা যায় সারি সারি পাহাড়, শিরে শোভা পায় সবুজের শিরোভূষণ, অঙ্গে সবুজ আভরণ,

পদতলে বিস্তৃত হয়ে আছে সবুজ অঞ্চল। ক্রমে বাড়তে থাকে অঞ্চলের পরিধি, বিস্তারিত হয় দিগন্তে। দাঁড়িয়ে আছে সেখানে হিমগিরি শ্রেণী, মস্তকে নিয়ে তুষারের শুভ্র মুকুট। স্পর্শ করে আছে আকাশ, ভেদ করে যাবে স্বর্গে। ভেসে ওঠে চারিদিকে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা এক অতি রমনীয় আর বিস্তৃত শস্য-শ্যামল উপত্যকা, ভেসে ওঠে এক সৌন্দর্যের খনি, এক নন্দন কানন, ভেসে ওঠে ভূস্বর্গ কাশ্মীর। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। ধন্য হই দেখে। স্বার্থক হয় জীবন।

২

খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। অধিরোহণ করেন মহারাজ অশোক মগধের সিংহাসনে। হন ভারতসম্রাট। তাঁর রাজত্ব থেকেই আরম্ভ হয় কাশ্মীরের ইতিহাস। কাশ্মীর হয় তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত। লেখা আছে কহ্লনের গ্রন্থে, বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার আগে অশোকের ছিল দেবদ্বিজে ভক্তি। ভক্তি ছিল শিবের ওপর। বৌদ্ধ হয়ে তিনি প্রচারক পাঠান কাশ্মীরে। কাশ্মীর থেকে বৌদ্ধ প্রচারক যায় তিব্বতে। তিব্বত থেকে চীন দেশে। গড়ে ওঠে কত বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার আর চৈত্য সারা কাশ্মীরে। সৃষ্টি হয় কত বৌদ্ধ শিল্প-সম্ভার তাদের অঙ্গে, হয় কত সৌন্দর্যের প্রস্রবণ। রাজধানী-স্থাপিত হয় শ্রীনগরে।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে, কাশ্মীর আসে হুষ্ক, যুষ্ক আর কনিষ্কের অধীনে। বৌদ্ধ তাঁরাও, আসেন তুর্কীদের দেশ থেকে। তাঁরাও নির্মাণ করেন অনেক বৌদ্ধ স্তূপ আর বিহার। সমৃদ্ধি বাড়ে কাশ্মীরের বৌদ্ধ স্থাপত্যের। ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে হূন মিহিরকুল অধিকার করেন কাশ্মীর। হন এক বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী। তিনি পৃষ্টপোষক ব্রাহ্মণের। তারপর গোপাদিত্য অধিকার করেন কাশ্মীর। নির্মাণ করেন তখ্‌তি স্লেমান পর্বতে শঙ্করাচার্যের মন্দির। সাজান কাশ্মীরকে বহু দেউলে আর মন্দিরে। রাজত্ব করেন মাতৃগুপ্ত, প্রবর সেন, করেন আরও অনেক রাজা। কীর্তিহীন তাঁরা। সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীর আসে এক স্থানীয় রাজাদের অধীনে। কারকোটা বংশোদ্ভূত তাঁরা। পরিণত করেন কাশ্মীরকে এক প্রথম শ্রেণীর রাজ্যে। এই বংশের প্রথম রাজা দুর্লভ বর্ধন।

তাঁর পৌত্র চন্দ্রাপীড় আর মুক্তাদিত্য ললিতাদিত্যকে চীন দেশের সম্রাট স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করেন। ললিতাদিত্যই এই বংশের সর্ব শ্রেষ্ঠ রাজা, সর্ব শ্রেষ্ঠ রাজা কাশ্মীরের। তিনি পরাজিত করেন কনৌজের রাজা যশোবর্মণকে। পরাজয় স্বীকার করতে হয় তিব্বতের আর দর্দের রাজাকে। পরাজিত হয় তুর্কীরাও। তাঁর বিজয় বাহিনী প্রবেশ করে ভারতবর্ষে ও এশিয়া মহাদেশের বহু স্থানে। তিনি নির্মাণ করেন সারা কাশ্মীরে বহু খাল, সুন্দর আর প্রশস্ত রাজপথ। নির্মাণ করেন প্রসিদ্ধ মার্তণ্ডের মন্দির। সুরক্ষিত করেন কাশ্মীরকে। পরিণত হয় কাশ্মীর এক মহা সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে। কাশ্মীরবাসীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর ঐশ্বর্য উপনীত হয় সর্বোচ্চ শিখরে। চরম উন্নতি হয় শিল্পের আর সাহিত্যের। আজও কাশ্মীর বুকে নিয়ে আছে তাঁর কীর্তির প্রতীক, হয়ে আছে গৌরবান্বিত।

তাঁর পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য। পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। পরাজিত করেন গৌড়ের আর কনৌজের রাজাকে। উৎসাহ দেন বিদ্যার, অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা বহু মনীষী আর পণ্ডিত দিয়ে। তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেন ক্ষীরস্বামী, উদ্ভট, দামোদর গুপ্ত আর বামন, করেন আরও অনেকে। কিন্তু তাঁর প্রজাশোষণ নীতিতে কাশ্মীরবাসীর অন্তঃকরণে থাকে না সুখ। অন্তর্হিত হয় শান্তি। দিন কাটে নিরানন্দে আর অভাব অভিযোগের মধ্যে। তিনি করতে পারেন না প্রজার মনোরঞ্জন। লাভ করেন খ্যাতি, কিন্তু পান না প্রীতি।

৮৫৫ খৃষ্টাব্দে উৎপলেরা অধিকার করেন কাশ্মীর। অবন্তি বর্মণ স্থাপন করেন এই বংশ। নির্মাণ করেন ঝিলাম নদীর তীরে অবন্তীশ্বরের মন্দির। নির্মাণ করেন আরও অনেক অট্টালিকা আর প্রাসাদ। কাটেন বহু কৃষির খাল, নির্মাণ করেন সেতু। কাশ্মীর হয় সমৃদ্ধিশালী, হয় শস্যপূর্ণ। ধন্য হয় কাশ্মীরের প্রজা, হয় সুখী। কাটায় জীবন শান্তিতে আর আনন্দে। তাঁর পুত্র শঙ্কর বর্মণ। পদাঙ্ক অনুশরণ করেন ললিতাদিত্যের। বাড়ান রাজ্যের সীমানা, বিস্তৃত হয় চারিদিকে। যুদ্ধ করেন কনৌজের রাজা ভোজের সঙ্গে। যুদ্ধ হয় উদ্‌ভ্রান্তপুরার লাল্লাসাহীর সঙ্গেও। অধিকার করেন পাঞ্জাবের কিছু অংশ গুর্জরদের কাছ থেকে। তিনিও অবলম্বন করেন শোষণ নীতি। প্রপীড়িত

হয় প্রজারা করের ভারে আর অত্যাচারে, সীমাহীন সেই পীড়ন। সহ্য করে না প্রজারা, মৃত্যুবরণ করেন রাজা তাদের হাতে। বিধবা রাণী সুগন্ধা কিছুদিন চেষ্টা করেন রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে। সফল হয় না তাঁর প্রচেষ্টা, রাজ্য ভার চলে যায় তান্ত্রীনদের হাতে। তাদের কাছ থেকে ব্রাহ্মণদের। তাঁরা স্থাপন করেন যশোকর বংশ। যশোকরদের পরাজিত করেন পর্বগুপ্ত। পর্ব গুপ্তের পুত্র ক্ষেম গুপ্তের আমলে রাজ্য শাসন করেন তাঁর রাণী দিদ্দা, লোহারার সর্দারের কন্যা, সম্পর্কিতা উদ্‌ভ্রান্তপুবার লাল্লাসাহিদেরও। রাজত্ব করেন ১০০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর সিংহাসনে বসান হয় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সংগ্রামরাজাকে। তাঁর সময়েই গজনীর মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তার পরের ইতিহাস বড়ই করুণ। ক্রমে প্রশমিত হয় কাশ্মীরের ক্ষমতা আর প্রভাব। পরিণত হয় এক দীপ্তিহীন কীর্তিহীন রাজ্যে। প্রজাদের মনে থাকে না সুখ। শান্তি যায় অন্তর্হিত হয়ে রাজ্যের অধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ির মধ্যে। আনন্দ বিদায় নেয় অত্যাচারের নির্মম পেষণে। হয়ে থাকে জীবন্মৃত।

আসে ১৩১৫ খৃষ্টাব্দ। নিযুক্ত হন এক মুসলমান যুবক তখনকার হিন্দু রাজার অধীনে। নাম তাঁর সাহমীর্জা, আসেন তিনি সওয়াত থেকে। মৃত্যু হয় রাজার ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি হত্যা করেন বিধবা রাণীকে, অধিকার করেন কাশ্মীরের সিংহাসন। পরিচিত হন সামসুদ্দিন সাহা নামে। তাঁর রাজত্বে প্রজারা আবার সুখের আর শান্তির মুখ দেখতে পায়। অনেক দিনের পরে ছাড়ে স্বস্তির নিশ্বাস। মৃত্যু হয় সামসুদ্দিনের। রাজত্ব করেন তাঁর তিন পুত্র একের পর এক। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর পৌত্র সিকান্দার সাহ অধিরোহণ করেন সিংহাসনে। সদয় তিনি মুসলমানের প্রতি, পৃষ্ঠপোষকতা করেন বিদ্যা আর বিদ্বানের। আসেন তাঁর রাজসভাতে সুধীরা। আসেন পারস্য, আরব আর মেসোপোটেমিয়া থেকে। কিন্তু রূপ বদলে যায় কাশ্মীরের। বার্তা যায় দিকে দিকে "হয় ধর্মান্তর গ্রহণ, নয় মৃত্যু বরণ।" "হতে হবে সকলকে মুসলমান, নইলে যেতে হবে শূলে।"

কাশ্মীরবাসীর অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। আদেশ শুনে কণ্টকিত হয় তাদের অঙ্গ, চোখ থেকে নিদ্রা অন্তর্হিত হয়, বুক কাঁপে থরথর করে। তারা পলায়ন করে দলে দলে। ফেলে চলে যায় চোদ্দ-পুরুষের ভিটা, আজন্মের স্মৃতি।

নিহত হয় অনেকে। যাঁরা অক্ষম, সক্ষম হন না পলায়ন করতে, প্রাণ বাঁচাতে চান ঘাতকের হাত থেকে, হতে হয় তাঁদের মুসলমান, করতে হয় ধর্মান্তর গ্রহণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এমনই করেই গড়ে ওঠে কাশ্মীরের মুসলমান সম্প্রদায় তাতেও সন্তুষ্ট নন রাজা। ভাঙ্গেন হিন্দুমন্দির যত ছিল কাশ্মীরে। মন্দিরের পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয় মসজিদ। হিন্দুদের ধর্মের বই যায় ডালের জলের তলে, তলিয়ে যায় অতলে। লুপ্ত হয় হিন্দু, সঙ্গে নিয়ে সংস্কৃতি। মুছে যায় হিন্দু নাম কাশ্মীরের বুক থেকে, রেখে যায় এক কলঙ্কময় পৃষ্ঠা কাশ্মীরের ইতিহাসে, সীমা নেই সেই কলঙ্কের। বাইশ বছর রাজত্ব করে মৃত্যুমুখে পতিত হন সিকান্দার। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র জৈন-উল-আবিদিন বসেন কাশ্মীরের সিংহাসনে। যেমন সহৃদয়, তেমনই সুবিবেচক। একেবারে পিতার বিপরীত। বুকভরা উদারতা, সব ধর্মকেই দেন সমান স্থান। মানুষকে বিচার করেন মনুষ্যত্বের মাপকাঠি দিয়ে। এমন রাজা বসেন নাই কাশ্মীরের সিংহাসনে ললিতাদিত্যের পরে। করেন নাই সিংহাসন অলঙ্কৃত। কাশ্মীরবাসীরা বলে তাঁকে কাশ্মীরের আকবর। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি ফিরিয়ে আনেন হিন্দুদের, যারা চলে যায়, পরিত্যাগ করে যায় কাশ্মীর ধর্মান্তর গ্রহণের ভয়ে, ত্যাগ করে তাঁর পিতার আমলে। বহাল করেন তাদের উপযুক্ত কাজে, আনেন তাদের সমপর্যায়ে। উঠিয়ে দেন জিজিয়া। সবাইকে ধর্ম বিষয়ে দেন পূর্ণ স্বাধীনতা। নিবারণ করেন চুরি ডাকাতি। কমিয়ে দেন কর ভার। সস্তা হয় জিনিসপত্রের দাম। উন্নত করেন টাকার মান। সারা কাশ্মীরে খনন করেন কৃষির জন্য খাল। নির্মাণ করেন সেতু আর প্রশস্ত রাজপথ। কাশ্মীর হয় ধনধান্যে পরিপূর্ণ, হয় মহা সমৃদ্ধিশালী। নিজে সুপণ্ডিত, জানেন নিজের ভাষা ছাড়াও, পারস্য, আরবিক আর তিব্বতীয় ভাষা, উৎসাহ দেন সঙ্গীতের, পৃষ্ঠপোষকতা করেন সাহিত্যের আর কলা বিদ্যার। তাঁরই উৎসাহে আর প্রচেষ্টায় অনুবাদ করা হয় মহাভারত আর রাজতরঙ্গিণী পারশ্য ভাষায়। হিন্দিতে অনুবাদ করা হয় বহু আরেবিক ও পারস্য ভাষায় লেখা বই। সুখে আর শান্তিতে দিন কাটায় প্রজারা। এমন সুখ আর শান্তির মুখ দেখে নাই তারা ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর। দিন কাটায় মহা-আনন্দে। মৃত্যু হয় আবিদিনের ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে। রাজা

হন তাঁর পুত্র হায়দার সাহ। তারপর কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন অনেক রাজা, কীর্তিহীন তাঁরাও। চক্রান্ত আর অত্যাচারের ভিতর দিয়ে দিন কাটায় কাশ্মীরবাসীরা। সুখ আর শান্তি হয়ে যায় অন্তর্হিত। কাটে দিন নিরানন্দে। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে দিল্লীর সম্রাট হুমায়ূনের এক আত্মীয় অধিকার করেন কাশ্মীর, তাঁর নাম মীর্জা হায়দার। কাশ্মীর আসে মোগলের অধীনে। তাঁকে পরাজিত করে চকেরা অধিকার করে কাশ্মীরের সিংহাসন ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে। চকেরা ফিরিয়ে আনে কাশ্মীরের সিংহাসন, ফেরাতে পারে না সুখ আর শান্তি কাশ্মীরবাসীর হৃদয়ে, লাঘব হয় না তাদের অত্যাচার আর অভাবের পীড়নের মাত্রা।

এমনই করে একদিন আসে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দ। মোগল সম্রাট আকবর জয় করেন কাশ্মীর। আবার ঐশ্বর্যময়ী হয় কাশ্মীর। বঞ্চিত আর লাঞ্ছিত কাশ্মীর-বাসীর বুক ভরে ওঠে বর্তমানের পাওয়ার সুখে আর আনন্দে। দেখে তারা ভবিষ্যতের আশার স্বপ্ন। সীমা নাই তাদের সৌভাগ্যের। সম্রাট আকবর খুব ভালবাসেন কাশ্মীরকে, পরিদর্শন করেন কাশ্মীর। নিজের চোখে দেখে যান তাদের। শোনেন তাদের অভাব আর অভিযোগ। ফিরে আসে অনেক কাশ্মীরী, যারা ছেড়ে চলে গিয়েছিল কাশ্মীর। ছেড়ে গিয়েছিল রাজার অত্যাচারে থাকতে না পেরে। তাদের কাজ দেওয়ার জন্য সম্রাট নির্মাণ করেন হরিপর্বতের শীর্ষদেশে একটি দুর্গ। সুউচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত করেন সেই দুর্গ। প্রায় ত্রিশ হাজার কাশ্মীরবাসী নিযুক্ত হয় এই কাজে।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর অলঙ্কৃত করেন কাশ্মীরের সিংহাসন। সুন্দরতমা কাশ্মীর, তাঁর প্রিয়তমা। বহু অর্থ খরচ করে সাজান কাশ্মীরকে মনের সাধে। কাশ্মীরের সৌন্দর্য নিকেতনে রচনা করেন এক একটি উদ্যান। অপরূপ সেই উদ্যান, স্বর্গোদ্যানে পরিণত হয় স্থানগুলি। এমনই করে রচিত হয় ভেরীনাগ, ঝিলামের উৎপত্তি স্থলে। আচ্ছাবল আর সালিমার বাগ। রচিত হয় চশমাসাহী, ডালের তীরে। তাঁর শ্বশুর আসফ খাঁ। তিনিও ভালবাসেন কাশ্মীরকে। নির্মাণ করেন ডালের তীরে এক স্বর্গোদ্যান, নাম তার নিষাদবাগ। তুলনাহীন সেই উদ্যান। তাঁরা রেখে যান কাশ্মীরের বুকে এক সীমাহীন কীর্তি। এক গৌরবময় সৃষ্টি। অমর করে যান কাশ্মীরকে,

অমরত্ব লাভ করেন নিজেরাও। যাত্রী আসে দলে দলে, আসে সুদূর সমুদ্র পার থেকেও, দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়। দিয়ে যায় শ্রদ্ধার অঞ্জলি, দেয় ডালি উজাড় করে। নিয়ে যায় মনের মণিকোঠায় স্মৃতি, যা হয়ে থাকে অম্লান, হয় অক্ষয়। জম্মুর পথেও জাহাঙ্গীর নির্মাণ করেন বহু রমণীয় উদ্যান, নির্মাণ করেন প্রায় তিন কোটী টাকা খরচ করে। সাত শ সাতটি উদ্যানে শোভিত হয় কাশ্মীর, হয় সৌন্দর্যময়ী, হয় ঐশ্বর্যময়ীও। কাটায় দিন কাশ্মীরবাসীরা ঐশ্বর্যে আর গৌরবে।

ঔরঙ্গেবের আমলে আবার অন্তর্হিত হয় কাশ্মীরবাসীর সুখের দিন। স্বপ্ন যায় টুটে। অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। তাগিদ আসে ধর্মান্তর গ্রহণের। মানতে হয় সেই তাগিদ, মানতে হয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে। হতে হয় মুসলমান। ধর্মান্তরের তাণ্ডব নৃত্যে মুখরিত হয় কাশ্মীরের বুক, হয় কাশ্মীরের আকাশ বাতাস।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে, অবসান হয় মোগল রাজত্বের। পাঠানেরা আবার অধিকার করেন কাশ্মীরের সিংহাসন। কাশ্মীরবাসীরা থেকে যায় যে তিমিরে, সেই তিমিরেই। পরিবর্তন হয় রাজার, হয় না তাদের ভাগ্যের। কাটায় জীবন হতাশায় আর নিষ্ফলে। জর্জরিত হয় শোষণে আর পীড়নে। অভাবে আর দৈন্যে ছেয়ে ফেলে কাশ্মীরের বুক। তার উপর দলে দলে হতে হয় মুসলমান। শেষে সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তারা শরণাপন্ন হয় পাঞ্জাব কেশরী শিখ নেতা মহারাজ রণজিত সিং-এর। শিখেরা দূর করে দেয় পাঠানদের। কাশ্মীর হয় শিখ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। রণজিত সিং দান করেন জম্মু প্রদেশ, সেনানায়ক গোলাব সিংকে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের অমৃতশহরের সন্ধির সর্তে জম্মুর রাজা গোলাব সিং লাভ করেন কাশ্মীর। পান ইংরাজের কাছ থেকে। দিতে হয় মূল্য স্বরূপ প্রায় দু'কোটী টাকা।

৩

সংবিৎ ফিরে এলে তাকিয়ে দেখি বাস মন্থর গতিতে চলেছে। বৃষ্টিতে পিছল হয়েছে পথ, হয়েছে দুর্গমও। তাই এই সাবধানতা। তার উপর আসে শ্রীনগর থেকে বাস। আসে এক সঙ্গে অনেকগুলি করে। দাঁড়াতে হয় এক

পাশে। দিতে হয় তাদের যাওয়ার রাস্তা। অপেক্ষা করতে হয়, যতক্ষণ না তারা চলে যায়। এমনই করে নামি মাইল সাত আট পথ, উপনীত হই এক সমতল রাস্তায়। সেখানকার উচ্চতা পাঁচ হাজার দু'শ ফিট। পৌঁছাই কাশ্মীর উপত্যকায়। এই উপত্যকাটি প্রস্থে প্রায় আশি মাইল, দৈর্ঘ্যে একশ মাইল। নাই পৃথিবীতে আর এমন বিশাল উপত্যকা এমন উঁচুতে। তাই এই বৈশিষ্ট্য কাশ্মীরের।

বেলা দেড়টায় বাস এসে থামে মুণ্ডা ডাকবাংলোর সামনে। এখানে যাত্রীদের খাওয়া সেরে নিতে হয়। প্রস্তুত থাকে খাবারও। আমাদের বাস দেরীতে পৌঁছায়। তার ওপর শ্রীনগর থেকে একদল স্কুলের ছেলেমেয়ে এসেছে, সঙ্গে এসেছেন কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী। তাঁরা সবগুলি খাবার টেবিল অধিকার করে বসেছেন। শেষ হয়েছে সমস্ত খাবার। নাই কিছু অবশিষ্ট আমাদের জন্য। অক্ষমতা জানান ডাকবাংলোর অধ্যক্ষ। মার্জনা চান। অগত্যা রাস্তার ধারের শিখের দোকান থেকে গরম পরোটা আর মাংস কিনে এনে ডাকবাংলোর টেবিলে বসে খেয়ে নেই। খাওয়া শেষ করে রাস্তায় বেরিয়ে আসি। দূর থেকে দেখি অনেকগুলি মুসলমান ভদ্রলোক আমাদের বাসকে ঘিরে ফেলেছেন। আসছেন আরও অনেকে। আসছেন মোটরে, টাঙায় সাইকেলে, আসছেন পদব্রজেও। যাচ্ছেন আমাদের বাসের দিকে। ভাবি, হোল কি কোনও বিপদ আমার মুসলমান সহযাত্রীদের? করেছে কি কোন অসুখ? নইলে কেন এত ভীড়? কেন এত লোকের সমাগম? বাসের কাছে ছুটে যাই। দেখি হজযাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছেন বাসের পাশে। তাঁদের চতুর্দিকে ঘিরে আছেন অসংখ্য মুসলমান। আলিঙ্গন করছে একে একে। আমার সহযাত্রীণী বলেন, যারা আজ এখানে এসে এদের আলিঙ্গন করতে পারবে, তারা হবে মহাপুণ্যবান, ফল পাবে হজযাত্রার। তাই এত ভীড়। তাই কাশ্মীর থেকে দলে দলে আসে এত মুসলমান। আলিঙ্গন করে হজযাত্রার পুণ্যলাভ করে। কাশ্মীরের সীমানায় পা দিলেই নাকি কমে যাবে পুণ্যের ফল, তাই এত ভীড় এখানে। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখি এই দৃশ্য। আবার বাস ছাড়তে দেরী হয়।

এবারে বাস চলতে থাকে একটি সমতল রাস্তা দিয়ে। দু'পাশে সবুজ

ধানের ক্ষেত মিশেছে গিয়ে দিগন্তে। আশ্রয় নিয়েছে দূরের হিমগিরিশ্রেণীর পদতলে। মাঝে মাঝে জলের স্রোত বয়ে যায় রাস্তার পাশ দিয়ে, বুকে নিয়ে পদ্মফুল। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে, দূরত্বের সমতা রেখে পোলবৃক্ষ। উঠে গিয়েছে মাথায় নিয়ে পাতার গুচ্ছ। নাই কোন আভরণ অঙ্গে। দেখি নাই এমন সুন্দর গাছ এর পূর্বে। দেখতে পোলের মত, তাই নামকরণ করা হয়েছে পোলবৃক্ষ। পরিচিত সফেদা নামেও। মাঝে মাঝে দেখা যায় রাস্তার পাশে জলের উপর মাথা নত করে আছে উইলোর গুচ্ছ। প্রণাম করছে জলদেবতাকে। দেখি এই প্রথম উইলো গাছও। দেখা যায় রাস্তার পাশে আপেল ও আখরোটের বাগান। ফলে আছে গাছে গাছে অসংখ্য আপেল। দেখা যায় বাদামের ক্ষেতও। দেখতে দেখতে যাই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অপরূপ শোভা। পার হই এক সেতু। পাহারা দেয় এই সেতু এক বন্দুকধারী শান্ত্রী, নিরাপদ হয় কাশ্মীরের যাতায়াতের রাস্তা। পার হই লেডার নদীও। এই নদীই এসেছে পহেলগাম থেকে। উৎপত্তি এর শেষনাগ হ্রদে, অমরনাথের পথে। খ্যাতিলাভ করেন সেখানে দুধগঙ্গা নামে। আসি অবন্তীপুরে, দেখি রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে অবন্তীশ্বরের মন্দির। নির্মাণ করেছিলেন এই মন্দির আর তার সংলগ্ন প্রাসাদ কাশ্মীরের প্রখ্যাতনামা রাজা অবন্তী বর্মণ। আছে এখন জীর্ণাবস্থায়, ধ্বংসে পরিণত হয়ে আছে, সাক্ষী দেয় পূর্ব গৌরবের। ক্রমে পৌছাই পামপুরে, দেখি রাস্তার দু'পাশে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে রুক্ষ আর বন্ধুর ভূমি, পৃথক হয়ে আছে নিজের স্বরূপে। এই জমিতেই ফলে সোনা। ফলে বহুমূল্য জাফরানের গাছ। ফলে না ভারতের আর কোথাও। কিছুক্ষণ পরে, বাস চলতে থাকে ঝিলামের তটের উপর দিয়ে। অবশেষে নদী পার হয়ে প্রবেশ করে শহরের মধ্যে। বাস ষ্টেশনে এসে থামে। পৌছাই এসে শ্রীনগরে, ভূস্বর্গের রাজধানীতে। পরিসমাপ্তি হয় যাত্রার।

## ৪

শ্রীনগর জম্মু-কাশ্মীর সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। নির্মাণ করেন এই শহর সম্রাট অশোক। অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন এই নগর তাই পরিচিত শ্রীনগর নামে।

গড়ে উঠেছে এই শহর ঝিলাম নদীর দুই পারে। সংযোগ করেছে সাতটি সেতু, এপারের লোকেদের বাড়ি ঘর, হাট বাজারের সঙ্গে ওপারের। স্থানের নাম রাখা হয়েছে সেতুর নাম অনুযায়ী। রাখা হয়েছে আমীরা, আলি, নয়া, সাফেয়ার, জিনা আর ফতে। এই শহরের এগার স্কোয়ার মাইল পরিধি নিয়ে বাস করেন আড়াই লক্ষেরও অধিক নরনারী আর শিশু।

এক কাশ্মীরী বন্ধু, আমাদের বাসের জন্য, একটি হাউসবোট ভাড়া করে রাখেন। তাতেই এসে উঠি। দাঁড়িয়ে আছে হাউসবোটটি ঝিলামের বুকের উপর, যাদুঘরের নিকটে। নদীর অপর পারে বাঁধ। একটি সুন্দর পীচের রাস্তা তটের উপর দিয়ে সর্পিল গতিতে যায়, তার এক প্রান্তে রেসিডেন্সি, অপর প্রান্তে এক নম্বরের সেতু। স্থানের নাম আমীরা কদল। কদল সেতুর কাশ্মীরী প্রতিশব্দ। সামনে দেখা যায় নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সেণ্ট্রাল আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। দেখা যায় একটি বড় ওষুধের দোকানও। এই রাস্তার সমান্তরালে আছে কাশ্মীরের চৌরঙ্গী। আছে এইখানেই শহরের বৃহত্তম দোকান, আছে এয়ার ষ্টেশন আর বাস ষ্টেশন। আছে একটি সুন্দর উদ্যানও। আছে দশ মিনিটের রাস্তায়।

একটি সরু তক্তার উপর দিয়ে কিচেন বোটে উপনীত হই। তার ধার দিয়ে গিয়ে হাউসবোটে প্রবেশ করি। একটি 'বি' শ্রেণীর হাউসবোট, আছে এই হাউসবোটে একখানি বসবার ঘর, একটি খাবার ঘর, দুইটি শোবার ঘর। শোবার ঘরের সঙ্গে আছে স্নানের ঘর। ঘরগুলি বেশ প্রশস্ত আর মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত। ঘরের জানালাগুলিও আধুনিক আমেরিকান পদ্ধতিতে তৈরী। আছে প্রতিটি জানালার উপর এক একটি 'ভেণ্টিলেটার'। ছাদগুলি কাঠের, অপূর্ব কারুকার্য সমন্বিত। অঙ্গে নিয়ে আছে কাশ্মীরের সূক্ষ্ম শিল্প সম্ভার। শোবার ঘরের সামনে একটি সঙ্কীর্ণ বারান্দা। যুক্ত হয়েছে কিচেন বোটে যাওয়ার রাস্তা আর খাবার ঘর। সংযোগ স্থলে আছে একটি ছেদ। সেখানে ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি আছে। ছাদের দু'পাশে আছে টবে ভরতি ফুলের গাছ। বোটের সামনের গলুইকে শোভিত করা হয়েছে একটি অতি সুন্দর ঝালরের আচ্ছাদনে, পরিণত হয়েছে একটি সুন্দর বারান্দায়। বারান্দা আর সিঁড়ির সংযোগ স্থলে একটি দরজা আছে। সেই দরজা

দিয়েই শীকারা থেকে হাউসবোটে প্রবেশ করতে হয়। উঠতে হয় শীকারাতে, যখন বাইরে যেতে হয়।

প্রতি হাউসবোটে একটি কিচেন বোট আর শীকারা আছে। হাউস-বোট আর তার মালিক কাশ্মীরের একটি বৈশিষ্ট্য—শ্রেষ্ঠতম অঙ্গের অন্যতম। আছে শ্রীনগরে আর তার আশেপাশে কয়েক সহস্র হাউসবোট। আছে ঝিলামের দুই পার দিয়ে, আছে ডাল হ্রদেও। সেখানেই আছে বেশীর ভাগ বড় আর সুন্দর হাউসবোট। দেখি একটি হোটেলও স্থাপিত, এক বিশালকায় দোতলা হাউসবোটে। এক একটি হাউসবোট দৈর্ঘ্যে আশি ফিট থেকে একশ' পঁচিশ ফিট, প্রস্থে দশ থেকে কুড়ি ফিট। তাতে চার থেকে পাঁচ খানি শোবার ঘর আছে। তাদের ঘরের সংখ্যা আর আসবাবের শ্রেষ্ঠতা অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ভাগ করা হয় এ, বি, সি আর ডিতে। এক একটি হাউসবোট তৈরী করতে পনর হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগে। প্রতিটি হাউসবোটেরই পরিচয় পত্রস্বরূপ, এক একটি বিশিষ্ট নম্বর আর নাম আছে, কিন্তু কাশ্মীর অধিবাসীদের কাছে তাদের মালিকদের পরিচয় পত্রের মূল্যই বেশী। প্রতিটি শালের ব্যবসায়ী, প্রতিটি কাঠের কারবারী, বাজারের প্রতিটি দোকানদার জানে কে কোন্ হাউসবোটের মালিক, আর কোথায় অবস্থিত সেই বোট। মালিকেরা সকলেই মুসলমান। হাউসবোটই তাদের একমাত্র পৈতৃক সম্পত্তি। নাই আর কোনো সম্পত্তি, নাই তাদের দ্বিতীয় থাকবার স্থান। এইখানেই তাদের জন্ম, বিয়ে আর মৃত্যু। তারা থাকে কিচেন বোটে, প্রস্তুত হয় সেখানে ভাড়াটেদের খাবারও। ভাড়া দেয় হাউসবোটখানি। শীকারা নিয়ে যাতায়াত করে কাশ্মীরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তাদের জল আনা থেকে আরম্ভ করে, হাট, বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই এই শীকারার সাহায্যে সাধিত হয়। এই শীকারায় চড়িয়েই যাত্রীদের, নিয়ে বেড়ায়, সকাল সন্ধ্যায়, প্রচুর রোজগার করে। নাই কোনো প্রভেদ আমাদের দেশের ছোট ডিঙিতে আর শীকারার আকৃতিতে। কিন্তু শীকারায় আছে নানা রঙের ঝালর দেওয়া ছই, আছে রঙিন মখমলের বসবার জায়গা আর তাকিয়া। সমন্বয় করা হয়েছে কাশ্মীরের সৌন্দর্যের সঙ্গে। থাকে না তাদের কোনো রোজগার শীতের তিন মাস, ডিসেম্বর থেকে

ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। তখন শ্রীনগরে হয় তুষারপাত, অধিবাসীরা চলে যায় জম্মুতে, পরিত্যাগ করে শ্রীনগর। আসে না কোনো দর্শন অভিলাষী, পরিত্যাগ করে যায় শালওয়ালারা, যায় কাঠের ব্যবসায়ীরাও, ব্যবসা করে ভারতের দিকে দিকে। কিন্তু হাউসবোটের মালিককে শ্রীনগরে কাটাতে হয়। কাটায় দিন স্ত্রী পুত্র নিয়ে, কিচেন বোটের দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে। অতিবাহিত হয় কষ্টে আর অভাবে। ভেঙে খেতে হয় পুঁজি। মরসুমের সময় প্রচুর রোজগার করলেও, থেকে যায় তারা দরিদ্রই। সারা বছর ধরেই অভাবের জীবন কাটায়। তাই সুযোগ পেলেই ঠকাতে ছাড়ে না যাত্রীদের। থাকে না তাদের মেয়েদের পরিচ্ছদের প্রাচুর্যও। সন্তুষ্ট থাকতে হয় এক প্রস্থ সালোয়ারে আর আচকানে। থাকতে হয় মলিন বেশে, থাকে ভস্মের অন্তরালে রূপের বহ্নি।

আমার হাউসবোটের মালিকের আছে দুই পুত্র আর দুই কন্যা, এক একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়েছে, হয়েছে একটি বাচ্চাও। ছোট মেয়েটি সবেমাত্র পদার্পণ করেছে কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিস্থলে। যৌবনের লাবণ্য ফুটে উঠেছে প্রতি অঙ্গে, সৃষ্টি করেছে এক নিখুঁত রূপবতী কন্যা। যেমন অনবদ্য তার অঙ্গের সৌষ্ঠব, তেমনই অতুলনীয় তার মুখ, চোখ আর নাসিকার গঠন। নাম তার নূরজাহান। তার অসামান্য রূপের কাছে বুঝি পরাজয় স্বীকার করতে হয় ভারত সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের রূপকেও। কিন্তু লুকিয়ে আছে সেই রূপের বহ্নি পরিচ্ছদের মলিনতার অন্তরালে, আছে ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে। আমরা যখন সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফিরতাম, সে এসে বসতো আমাদের পায়ের কাছে, মেঝেতে কার্পেটের উপর। হেসে হেসে তাদের পারিবারিক জীবনের কথা বলতো। আমার স্ত্রীর সাধ হয় তাকে শাড়ি পরিয়ে দেখতে। উপহার দিয়েছিলেন একখানি ভাল শাড়িও। পরতে না জানায়, সে খানি তার অঙ্গে উঠলো না, রয়ে গেল বাক্সে। পূর্ণ হল না আমার স্ত্রীর বাসনাও। রাত্রির কাজের শেষে, আমার বোটের মালিকও এসে বসতো খাটের পাশে, বলতো তার সুখ দুঃখের কাহিনী। জানাত ভবিষ্যতের স্বপ্নও। তার কাছেই তাদের সমাজের জীবনযাত্রার বিষয় অবগত হই, শুনি তাদের অভাব আর অনটনের কথাও।

হাউস বোটের মালিক ছাড়া কাশ্মীরের শালওয়ালা আর কার্পেটওয়ালা আছে। এরাও কাশ্মীরবাসীর এক বিশিষ্ট অংশ অধিকার করে আছে। আছে কাশ্মীরে অনেকগুলি শাল ও কার্পেট তৈরীর কারখানা। আমার চোদ্দ দিনের স্থিতির মধ্যে অনেকগুলি শাল ও কার্পেট তৈরীর কারখানা দেখতে যাই। কারখানার মালিকরাও মুসলমান। উপরতলায় বাস করেন, নীচেরতলায় তৈরী হয় শাল। সাদা ও রঙিন পশমের জমির উপর চলে সূক্ষ্ম সূচের কাজ। শোভা পায় অপরূপ লতাপাতা কাপড়ের অঙ্গে। শোভিত করেন স্ত্রী-শিল্পী, তাদেরই স্ত্রী কন্যা, যেমন সুন্দর পরিকল্পনা তেমনই অনবদ্য রূপদান। কারখানার আকৃতি যেমন ছোট, তেমনই সীমাবদ্ধ তাদের কাজের পরিমাণ। এই সব কারখানাতেই তৈরী হয় সুন্দর সুন্দর 'বেড কভার', তৈরী হয় শাড়ি। কিছু শহরের বড় বড় দোকানে বিক্রির জন্য পাঠান হয়। কতক তারা নিজেরাই শীকারায় বোঝাই করে হাউসবোটের অধিবাসীদের কাছে বিক্রয় করে। ঠকতে হয় ক্রোতাদের, যদি না জানা থাকে বাজার দর। তাঁরাও দরিদ্রের জীবন যাপন করে, কাটায় দিন অভাবের পেষণে।

আছে কাঠের কারবারী। এরাও মুসলমান। নানা রকমের বাটালির সাহায্যে, নিজেদের কারখানায় বসে কাঠের অঙ্গে ক্ষোদিত করে তোলে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার। তৈরী করে বাক্স, পেটি, টেবিল, টিপয়, বিভিন্ন তাদের আকৃতি আর বিচিত্র তাদের অঙ্গের শিল্প-সম্পদ। এরাও শীকারা করে পণ্য নিয়ে বেড়ায়, হাউসবোটের ভাড়াটেদের কাছে চতুর্গুণ দামে বিক্রি করে। ক্রেতাদের ঠকাতে দ্বিধা করে না। পায় না পরিশ্রমের মূল্য, তাই কাটে তাদের জীবন অভাবে আর অনটনে।

আর আছে কৃষিজীবী। স্বর্ণ-প্রসূ কাশ্মীর। তার জমিতে জমিতে ধান ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে, বাগানে বাগানে ফল, আপেল, আখরোট, পীচ, বাদাম, আড়ু আরও কত কি। ফলভারে অবনত হয়ে থাকে গাছ, অদৃশ্য হয়ে যায় পাতা। তার উদ্যানে উদ্যানে ফুল, আলো করে থাকে চারিদিক। এই সব জমিতে, বাগানে আর উদ্যানে কাজ করে হিন্দু মুসলমান দুই-ই। করে জীবন ধারণ। নাই ক্রেতার প্রাচুর্য, তাই স্বচ্ছল নয় তাদের জীবনযাত্রাও।

তা ছাড়া, আছে জাফরানওয়ালা আর পদ্মমধু বিক্রেতা। তারা হাঁকে চতুর্গুণ দাম, গছিয়ে যায় খাঁটির বদলে মেকী। মূল্য দিতে হয় অজ্ঞতার অপরাধের।

আছে ছোরা বিক্রেতা, বিক্রি করে নানা আকৃতির ছোরা, আর রুটী-কাটার যন্ত্র, বিক্রি করে লাঠিও। লোভ সংবরণ কঠিন হয়, তাদের বাঁটের অঙ্গের সূক্ষ্মতম অপরূপ কারুকার্য দেখলে বাসনা হয় কিনবার। ঠকতে হয় এদের কাছেও, যদি জানা না থাকে বাজার দর। এরাও ধর্মে মুসলমান।

একদিন এক কারখানার মালিক শীকারা পাঠিয়ে তাঁর কারখানা দেখতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। দেখি নীচের তলায় অনেকগুলি ঘর। সেখানে ছেঁড়া ন্যাকড়া থেকে তৈরী হয় কাগজ। সেই কাগজ থেকে রচিত হয় নানা আকৃতির রঙ্গীন ফুলদানি, বাটি, পিলসূজ, দীপদান আরও অনেক জিনিস। অঙ্কিত করে চিত্রশিল্পী তাদের অঙ্গে বিভিন্ন আর বিচিত্র চিত্র-সম্ভার। দেখে মুগ্ধ হই শিল্পীর কর্মকুশলতা। উপর তলায় প্রদর্শনীর জন্য সাজিয়ে রাখা হয় সেই সব জিনিস। দেখে মনে কিনবার বাসনা জাগে। দামও খুব বেশি নয়। তারাও মুসলমান।

আছে আরও অনেক শিল্প কাশ্মীরে। আছে অনেক শিল্পীও। ভূস্বর্গ কাশ্মীর, বুকে নিয়ে আছে অসংখ্য শিল্পী। সীমাহীন তাদের দান, বিস্তৃত হয়ে আছে বিভিন্ন আর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। কিন্তু এরা সকলেই মুসলমান। নাই কোন হিন্দু শিল্পী কাশ্মীরে। তাদের জীবিকা সীমাবদ্ধ চাষের কাজে আর কেরানীগিরিতে। হিন্দু রাজার আমলে তারাই অধিকার করেছিলেন রাজ্যের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ। বদলেছে রাজ্যের শাসন প্রণালী, বদলেছে সে নিয়মও। নিযুক্ত এখন অনেক মুসলমান সরকারী কাজে। অধিকার করেন দায়িত্বপূর্ণ পদও। শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে স্বরু হয়েছে বেকার সমস্যা।

সবশেষে আছে শীকারার মালিক। শীকারাই শ্রীনগরে যাতায়াতের অন্যতম প্রধান উপায়। শীকারা করেই আনতে হয় জল, করতে হয় হাটবাজার। যেতে হয় অফিসে হাউসবোট থেকে। শীকারা বোঝাই করেই বিক্রেতারা নিয়ে আসে পণ্য, বিক্রি করে হাউসবোটে। বিরাম নেই সেই আসা যাওয়ার। শীকারা করেই বিলি হয় ডাক। সকাল সন্ধ্যায় হাওয়া খান কাশ্মীরের

'টুরিষ্ট'-রা। পাড়ি দেন দূরের রাস্তাও। তাই শীকারার মালিকরাও কাশ্মীরের এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

স্বাধীনতা লাভের পর, কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সেই থেকে ভারত সরকার কাশ্মীরের দৈন্য ও অভাব দূর করবার জন্য সচেষ্ট, ফিরিয়ে আনতে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য তাদের অন্তঃকরণে। স্থাপিত হয়েছে কাশ্মীর 'এমপোরিয়াম' শ্রীনগরে আর জম্মুতে। হয়েছে ভারতের সমস্ত প্রধান শহরেই। বিক্রি হয় সেখানে নির্ধারিত মূল্যে কাশ্মীরের শিল্প-সম্ভার, কারখানার মালিকেরা পায় পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য। দেখতে পায় লাভের মুখ। স্বচ্ছল আর সুন্দর হয় তাদের জীবনযাত্রা। খোলা হয় কাশ্মীরে আর কাশ্মীরের বাইরে টুরিষ্ট অফিস। তারা কাশ্মীরের যাত্রীদের সুখ ও সুবিধা দেখেন। তারাই নির্ধারণ করেন হাউসবোটের আর হোটেলের দর্শনী। মালিকেরা পায় ন্যায্য ভাড়া, মুক্তি লাভ করে অভাবের পেষণ থেকে, স্বচ্ছন্দ্যের হয় তাদেরও জীবনযাপন। খোলা হয় 'পাবলিসিটি' অফিসও (প্রচার বিভাগ) ঘোষিত হয় দিকে দিকে কাশ্মীরের অপরূপ সৌন্দর্যের কাহিনী। আমন্ত্রণ করা হয় দেশবিদেশের যাত্রীদের কাশ্মীরে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের লীলা নিকেতনে আসতে। আসতে ভূস্বর্গে। তাই আজ আসে দলে দলে যাত্রী ভূস্বর্গ কাশ্মীরে। আসে দেশবিদেশ থেকে। প্রসারতা পায় কাশ্মীরের শিল্প-সম্ভার। পায় উপযুক্ত ক্রেতা। শিল্পীরা পায় ন্যায্য মূল্য, পায় মুনাফাও। সহজ ও সুন্দর হতে থাকে তাদের জীবন। লাঘব হতে থাকে অনাটনের নিষ্পেষণ। কাশ্মীর হয় সমৃদ্ধিশালী। কাশ্মীর সরকারও স্থাপন করেন এখানে একটি সিল্ক তৈরীর আর একটি কার্পেটের কারখানা। স্থাপিত হয় উলেন মিলও। নিযুক্ত আছে তাতে অনেক কাশ্মীরী। অধিবাসীরা বলে কাশ্মীরী ভাষা, সংস্কৃত, উর্দু আর আরেবিকের সংমিশ্রণে রচিত।

৫

পরের দিন ভোরে উঠে চা ও কিছু খাবার খেয়ে একটি ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হই। সালিমারবাগে যাই। ট্যাক্সি ডালের কিনারা দিয়ে চলে। দেখতে দেখতে যাই ডালের অপরূপ শোভা। দেখি রাস্তার পাশে পাশে

কয়েকটি সুন্দর উদ্যান, আলোকিত হয়ে আছে নানা রঙের ফুলে। কয়েকটি আপেলের বাগানও আছে। দেখি একটি বড় হোটেল রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর দেখি মহারাজ হরিসিং-এর প্রাসাদ। তিনি নির্মাণ করেছিলেন এই প্রাসাদ শহরের বাইরে, ত্যাগ করেছিলেন ঝিলামের তীরে শহরের ভিতরে অবস্থিত পিতৃপিতামহের রাজপ্রাসাদ। এইখানেই মহারাজকুমার করণ সিং বাস করেন। পরিণত হয়েছে মহারাজ প্রতাপ সিং-এর প্রাসাদ সরকারী দপ্তরে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে, গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই, দেখে সালিমারের স্বর্গীয় পরিবেশ। দেখি সামনে এক নীল পাহাড় স্পর্শ করেছে আকাশ। তার বক্ষ ভেদ করে নির্গত হয় একটি নৃত্যচপল ঝরণা। শোনা যায় তার নূপুরের ধ্বনি। পদতলে প্রসারিত একটি শ্যামল মখমলের গালিচা, বিস্তৃত হয়ে আছে তিনটি স্তরে। তার বুকের উপর দিয়ে এক স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয় উদ্যানে। মুখর হয়ে ওঠে উদ্যান তার মৃদু গুঞ্জনে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি অতিকায় চানার বৃক্ষ। রচিত হয় একটি অপরূপ কুঞ্জও, সৃষ্টি করে এক সুন্দর গম্ভীর পরিবেশ। চতুর্দিকে শোভা পায় অসংখ্য ফোয়ারা, দাঁড়িয়ে আছে এক একটি নৃত্যপরায়না অপ্সরা, অঙ্গে নিয়ে সূক্ষ্ম মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন। মাঝে মাঝে নির্মিত হয়েছে কত বেদী, বেষ্টিত হয়ে আছে অসংখ্য ফুলে, বিচিত্র আর বিভিন্ন তাদের অঙ্গের রঙ। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য আপেল গাছ, ফল ভরে অবনত হয়ে আছে। আছে একটি ঘরও, প্রবাহিত হয় স্রোতাস্বিনী তার নীচে দিয়ে। ঘরের ছাদে আর দেওয়ালে শোভা পায় মোগল স্থপতির আর শিল্পীর অপরূপ শিল্প-সম্ভার। চানার কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য। নাই অন্য কোন স্থানে। কাশ্মীরকে ধ্যান গম্ভীর করে, হয় শান্ত শীতল আর রমণীয়। তার স্থলে চানার, জলে পদ্ম। পরিণত হয় কাশ্মীর এক নন্দন কাননে। প্রতীক হয়ে আছে তার কারু শিল্পেও। সম্রাট জাহাঙ্গীর নির্মাণ করেন এই উদ্যানটি ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে। রচনা করেন এক প্রেমের নিকেতন, নাম রাখেন সালিমার, যে নামে নিভৃতে কানে কানে ডাকতেন তাঁর প্রিয়তমা বেগমকে। পরিণত হয় এই উদ্যান রাজোদ্যানে। প্রথম স্তরে সভাসদেরা বসেন, কেন্দ্রস্থলে সম্রাট নিজে, সঙ্গে নিয়ে প্রিয়তমা

মহিষীকে, শেষেরটিতে অন্য রাণীরা। প্রশান্ত নীল পাহাড়, নৃত্যচপল জলধারা, নিয়ে তার নূপুরের ধ্বনি, মৃদুগুঞ্জনা স্রোতস্বিনী, নৃত্যপরায়না অপ্সরা, ধ্যান গম্ভীর চানারের কুঞ্জ আর অপেলের বেষ্টনী করে এক অপূর্ব সমন্বয়, রচিত হয় এক স্বর্গোদ্যান, এক ধ্যান গম্ভীর দিগন্ত প্রসারী নীল-পাহাড়ের পদতলে। মনে মনে বরণ করি এই মহিমময় সুন্দরকে, শ্রদ্ধা জানাই সম্রাট জাহাঙ্গীরকে আর সালিমার বেগমকে। যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তবে সে এখানেই, সে এখানেই। তার পর ধীরে ধীরে উদ্যান থেকে বেরিয়ে আসি।

সেখান থেকে 'চিল্ড্রেনস্ হোমে' যাই। এই হোম বা আশ্রমটি ভারত-সরকারের অর্থে চলে। আশ্রমবাসীরা সবাই পিতৃমাতৃহীন। জানা নাই কি তাদের নাম, কি গোত্রের তারা। জানা নাই তারা হিন্দু কি শিখ, ব্রাহ্মণ কি তাঁতি। কুড়িয়ে পাওয়া যায় তাদের রাজৌরীতে আর পুঞ্চে। পাওয়া যায় নৌসেরাতে আর ঝানগরে। মেলে মুসলমান হানাদারদের বিতাড়িত হওয়ার পর, প্রতীক তাদের হিংস্র অত্যাচারের। তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাদের বাপ ভাইকে, মা বোনের উপর চালিয়েছে অমানুষিক বর্বর অত্যাচার, যাওয়ার সময়, নিয়ে গিয়েছে সঙ্গে করে। অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে শুধু তারা, আর তাদের মত আরও অনেকে। স্থান পেয়েছে এই আশ্রমে আর অনুরূপ আশ্রয়ে, ছড়িয়ে আছে কাশ্মীবের বুকে। আছে এখানে প্রায় এক শ' বালক, বয়েস তাদেব পাঁচ থেকে ষোল। ভারত সরকারের অর্থে আরও একটি হোম চাম্পেয়ারিতে, জম্মু-শ্রীনগরের রাস্তার উপর স্থাপিত হয়েছে। সেখানে কোলের শিশু থেকে পাঁচ বছরের বালক বালিকারা স্থান পেয়েছে। স্থাপিত হয়েছে হোম রাজৌরীতে, পুঞ্চে আর নৌসেরাতে। জম্মুতেও আছে একটি অচল আর অথর্বদের হোম।

শেখান হয় এখানে লেখা পড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তার সঙ্গে হাতের কাজ, 'কার্পেণ্ট্রি', 'স্মিথি'। শেখে তারা খেলনা বানানও। বানায় নানা রকমের খেলনা। তারা কৃষি কাজও শেখে। হবে তারা স্বাধীন ভারতের উপযুক্ত নাগরিক। ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখি। একটি সুন্দর সবজির ক্ষেতও দেখি। ফলে আছে সেই ক্ষেতে অপর্যাপ্ত বেগুন, টোমাটো,

ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর আরও কত কি, ছেলেদের পরিশ্রমের ফল। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে। দেখি তাদের তৈরী একটি সুন্দর ফুলের বাগানও। বিক্রি হয় ফুল বাজারে। কেনা হয় না কোন সবজি বাজার থেকে, নিজেদের ক্ষেতের তৈরী সবজিই তারা খায়। যা থাকে বাড়তি, বিক্রি হয় বাজারে। বিক্রির অর্থ জমা হয় হোমের তহবিলে। ক্ষেতের তৈরী সবজি আর বাগানের ফুল প্রদর্শনীতেও প্রেরিত হয়। লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার। আশ্রমবাসীদের উৎসাহ বাড়ে। আলাপ করি কতকগুলি ছেলের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করি—আছে নাকি কোন ভবিষ্যতের স্বপ্ন? হতে চায় কি ডাক্তার? হবে কি বাস্তুকার? দেয় না কোন জবাব, তাকিয়ে থাকে মুখের পানে। শোনে নাই তারা এমন প্রশ্ন আগে। সবাই সপ্রতিভ। বলে, হবে তারা স্বাধীন ভারতের উপার্জনশীল নাগরিক। তাদের ড্রিল আর প্যারেড দেখি।

দেখা শেষ করে দোতলায় উপনীত হই। একটি প্রশস্ত হল আছে। তার দেওয়ালে নানাদেশের মানচিত্র টাঙান আছে। মানচিত্র আছে কাশ্মীরের প্রতিটি জেলারও। প্রথিতযশা মনীষীদের প্রতিমূর্তি আছে ও প্রতিকৃতি আছে মহাত্মার, পণ্ডিতজীর আর রাষ্ট্রপতিরও। কেন্দ্রস্থলে একটি টেবিলের পাশে বসে আমার স্ত্রী আশ্রমের অধ্যক্ষার সঙ্গে গল্পে নিযুক্তা। গৃহিণী পরিচয় করিয়ে দেন অধ্যক্ষার সঙ্গে। তাঁর মুখে এক মর্মন্তুদ কাহিনী শুনি। বাড়ি রাজৌরীতে। বাস করতেন সেখানে স্বামী, দুই পুত্র আর এক কন্যা নিয়ে। ছিল না ঐশ্বর্যের প্রতুলতা। কিন্তু পেয়েছিলেন স্বামীর অপরিসীম ভালবাসা। তাই ছিল না কোন ক্ষোভ। সুখের আর শান্তির ছিল তাঁদের জীবন। বড় ছেলেটির বয়স বছর পাঁচেক, ছোটটির তিন, কোলের শিশুটির এক বছর। স্বাধীনতা লাভ করে ভারতবর্ষ। কিন্তু তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন নি কাশ্মীরবাসীদের দিতে হবে তার মূল্য। হানাদারেরা আক্রমণ করে কাশ্মীর। যেমন অতর্কিত সেই আক্রমণ তেমনই নির্মম। রাজৌরীর বুকের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর চোখের সামনে হত্যা করে তাঁর স্বামীকে আর দুই পুত্রকে। ধরে নিয়ে যায় স্বামীর মাকে আর বোনেদের। বাদ দেয় না তাঁকেও, তাদের নিষ্ঠুর, বর্বর অত্যাচারের হাত থেকে। তিনি হারিয়ে ফেলেন জ্ঞান। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখেন শুয়ে আছেন জঙ্গলের ভিতর, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁর

সারা অঙ্গ। বুকে জড়িয়ে আছে কোলের শিশুটি। সেই অবস্থাতেই শিশুটিকে বুকে নিয়ে তিনি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসেন। আসেন অতি কষ্টে। জম্মুর পথে রওনা হন। নাই অন্ন পেটে। অত্যাচারে আর ক্ষুধায় অবসন্ন দেহ, চলে না পা। তবুও তিনি অতিকষ্টে পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে চলতে থাকেন। এগোতে থাকেন জম্মুর দিকে। শেষে অতিক্রম করে সীমা, জ্ঞান হারিয়ে রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখেন তিনি এক হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে আছেন। কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন তাঁকে আর শিশুটিকে এক সামরিক কর্মচারী, নিয়ে এসেছেন রাস্তার উপর থেকে। ছ' মাস পরে তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন। কিছু দিন ক্যাম্পে কাটান। তারপর, এখানকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। শিশুটিকে চাম্পিয়ারির শিশু আশ্রমে রেখে আসেন। সে সেখানে মানুষ হচ্ছে। বলতে থাকেন গল্প আর চোখ দিয়ে পড়তে থাকে অশ্রু, ভেসে যায় বুক। আমরাও অভিভূত হই। স্কুলের অধ্যক্ষের ডাকে সংবিৎ ফিরে পাই। তিনিও সস্ত্রীক এই আশ্রমে বাস করেন। দেখি এক সুন্দর দর্শন স্বপ্ন বিলাসী যুবক। প্রতিভার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। ডোগরা রাজপুত বংশীয়, কানাড়া জেলায় বাড়ি। এখন জম্মুতে বাস করেন। সেখান থেকেই এম-এ পাস করেন স্থির করেন দেশের আর দশের কাজে জীবন কাটাবেন। আলাপ হয় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও। ভারী শান্ত আর লক্ষ্মী মেয়েটি। এক মুহূর্তেই আমাদের আপনার করে নেয় গল্পে আর গুজবে। একদিন স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আসে ও আমাদের হাউসবোটে। আলাপ হয় অন্য শিক্ষকদের সঙ্গেও। সবাই আত্মসমর্পণ করেন আশ্রমের ছেলেদের মানুষ করার কাজে, এক অদম্য উৎসাহ নিয়ে। কিছুক্ষণ সকলের সঙ্গে গল্প করে, আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসি। নিষাদ বাগ দেখতে যাই।

একদিকে দিগন্ত প্রসারী ডাল হ্রদ, অপর দিকে এক ধ্যান গম্ভীর অভ্রভেদী নীল পাহাড়ের শ্রেণী। প্রকৃতির এক অপরূপ আর সুন্দরতম পরিবেশে রচিত হয় এই উদ্যানটি। রচনা করেন সুন্দরের জহুরী আসফ খাঁ, ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের শ্বশুর। নাম রাখেন নিষাদ। অমরত্ব দান করেন প্রিয় ভৃত্য নিষাদকে। পরিণত হয় এই উদ্যান এক আনন্দ নিকেতনে। এই

উত্থানটিতে আছে সাতটি স্তর, নেমে আসে উচ্চতার সমতা রেখে, পর্বতের নীল অঙ্গ থেকে। বিস্তৃত হয় এক ঘন সবুজ অঞ্চল গিরিবরের পদতলে। একটি জলধারাও নেমে আসে, আসে সাতটি স্তরের বুকের উপর দিয়ে, আসে নৃত্য চপল গতিতে, অন্তরের ধ্বনি শোনাতে শোনাতে। জলধারার কিনারা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ফোয়ারা, এক একটি শ্বেতবসনা অপ্সরা। দাঁড়িয়ে স্রোতস্বিনীর খেলা দেখে। জলধারায় দু' পাশে শোভা পায় ফুলের সমারোহ, বিভিন্ন আর বিচিত্র তাদের অঙ্গের রং। তার পাশে পাশে ফলে ভরা আপেলের কুঞ্জ। সবুজ অঞ্চলের বুকে শিল্পী রচনা করেন এক নানা রংএর ফুলের আর লতার সম্ভার। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এক একটি সুবিশাল চানার, হয়ে আছে এক একটি নীরব, মূক প্রহরী। সৃষ্টি হয় এক প্রশান্ত ধ্যানমৌন পরিবেশ। ঘুরে ঘুরে এক একটি স্তর দেখি। দেখে মুগ্ধ হই তাদের অপরূপ রূপ। অতিক্রম করি ছয়টি স্তর, পৌছাই এসে সপ্তমে। সেখানে দেখি একটি ঝরণা, পাহাড়ের তলদেশ থেকে নির্গত হয়। ধুয়ে নিয়ে আসে গিরিবরের চরণধূলি। কয়েকটি অতিকায় চানার গাছ দাঁড়িয়ে দেখে সেই লীলা। দেখে মুগ্ধ হই এই পরিবেশ। শেষে গিরিবরকে পিছনে রেখে তাকাই সম্মুখ পানে। দেখি সম্মুখে এক অপরূপ দৃশ্য। গিরিবরের পদতল থেকে নির্গত হয়েছে এক বিস্তৃত সবুজ অঞ্চল, বিস্তৃত হয়ে আছে সাতটি স্তরে। তার বুকে শোভা পায় নানা বর্ণের লতা পাতা আর ফুল। অঞ্চল ভেদ করে নৃত্যের ছন্দে ছুটে যায় এক কলনাদিনী, শোনা যায় তার নূপুরের ধ্বনি। পাশে দাঁড়িয়ে শ্বেত বসনা অপ্সরারা সেই খেলা দেখে। নীরবে পাহারা দেয় চানারের কুঞ্জ, বিস্ময়ে মূক হয়ে যায়। ওপারে যতদূর দৃষ্টি চলে প্রসারিত হয়ে আছে ডাল, দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। দেখি ডালের অঙ্কে দাঁড়িয়ে আছে এক স্বর্গোদ্যান, স্পর্শ করে আছে এক ধ্যানগম্ভীর গিরিবরের পদতল। দেখি নাই এমন সৌন্দর্য আগে, দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। হয়ে যাই মূক। মনে মনে বরণ করি এই মহিমময় সুন্দরকেও, শ্রদ্ধা জানাই সুন্দরের পূজারী আসফ খাঁকে। নিয়ে আসি মনের মণিকোঠায় এক স্মৃতি, যা উজ্জ্বল হয়ে আছে। হয়ে আছে অক্ষয়।

৬

পরের দিন খুব ভোরে উঠে ক্ষীরভবানীর মন্দির দেখতে যাই। সঙ্গে যান আমার স্ত্রী, কাশ্মীরী বন্ধু আর একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত। যান আরও একজন বন্ধু, সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী। বাড়ি তাঁদের পেশোয়ারে। সেদিন একাদশী। ক্ষীরভবানীতে সেদিন একটি মেলা বসে। তাই সেইদিনই ক্ষীরভবানী যাওয়া স্থির করি। বাস ষ্ট্যাণ্ডে যাই। দেখি সঙ্গীরা আগেই জমা হয়েছেন। সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে অনেক বাস। কোনটা ভর্তি, কোনটা ভর্তি হতে বাকি। সবগুলিই ক্ষীরভবানীতে যাবে। আমরা একটি খালি বাসে উঠে সামনের আসনগুলি অধিকার করে বসি। আজ মেলা উপলক্ষ্যে সমাগম হবে সেখানে হাজার হাজার দর্শকের। যাবে বাসে করে, ট্যাক্সিতে চড়ে, ষ্টেশন ওয়াগনে ভর্তি হয়ে আর টাঙায় চড়ে। যাবে পদব্রজেও। আধ ঘণ্টা পরে বাস ছাড়ে। নদী পার হয়ে, জুম্মা মসজিদের পাশ দিয়ে, হরি পর্বতের নীচে দিয়ে, সেখ আবদুল্লার বাড়ির গা ঘেঁসে বাস শহর অতিক্রম করে একটি হ্রদের কিনারায় উপনীত হয়, পরিচিত গন্ধর্ববল নামে। যেতে হয় এখান থেকে তিব্বতে। এই পথেই গিয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। দেখি হরিপর্বতের শীর্ষদেশে আকবরের নির্মিত দুর্গ প্রাচীর। অবস্থান করে এই দুর্গে কাশ্মীরের সেনাবাহিনী। এই দুর্গেরই এক কারাগৃহে বন্দী থাকেন শেখ আবদুল্লা কিছুদিন। এই পর্বতের শীর্ষদেশেই একটি বৌদ্ধ-বিহার ছিল। রাজা হরপ্রবর সেন নির্মাণ করেন সেখানে একটি মহাদেবের মন্দির। স্থাপন করেন একটি সুন্দর শহরও। মন্দিরটির নাম রাখা হয় প্রবরেশ, শহরটির শারীতক। নির্মাণ করেন এইখানে কাশ্মীরের রাজা রামাদিত্যও একটি মন্দির, পরিচিত ভীমস্বামী নামে। আজও আছে তাদের ধ্বংসাবশেষ। এখানকার দুর্গটি সিকান্দার শাহ ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। পুনর্গঠন করেন সম্রাট আকবর ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে।

বাস চলতে থাকে। বামে দিগন্ত প্রসারী গন্ধর্ববল। দক্ষিণে সবুজ ধানের ক্ষেত, বিস্তৃত হয়ে আছে দূরের অভ্রভেদী গিরিশ্রেণীর পাদদেশ পর্যন্ত, স্পর্শ করে আছে চরণ। এক অতি সুন্দর পরিবেশ, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। দেখি

রাস্তার বাম পাশে, হ্রদের বুকে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, বুকে নিয়ে আছে একটি ঘন নীল চানারের কুঞ্জ। তার ছায়া এসে পড়ে হ্রদের বুকে। নাই কোন বৃক্ষ কুঞ্জের সামনে। দেখে মনে হয় কুঞ্জের সামনে বিছান আছে একটি সবুজ মখমলের গালিচা। সেই কুঞ্জের অন্তরালে অনেকগুলি সুন্দর হাউসবোট দাঁড়িয়ে আছে। থাকেন এই সব বোটে শহরের ধনী ইউরোপীয়ানরা। বাস করেন প্রকৃতির এক সুন্দরতম লীলাভূমিতে। ক্রমে বাস একটি সেতু অতিক্রম করে। তার নীচে দিয়ে প্রবাহিত হন সিন্ধু নদ। সেতু পার হয়ে বাস একটি গ্রামে এসে থামে। শুনি এই গ্রামটির নামই সাদিপুর। এর কাছেই, সিন্ধু আর বিতস্তার সঙ্গম স্থলে, পরিত্রাণপুরে মহারাজ ললিতাদিত্য নির্মাণ করেন তাঁর রাজধানী। পরে শঙ্কর বর্মণ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন পত্তনে। অবশেষে বাস ক্ষীরভবানীর মন্দিরের দরজায় এসে থামে।

বাস থেকে নেমে, গেটের ভিতর দিয়ে গিয়ে, একটি সেতু অতিক্রম করে মন্দিরের প্রকাণ্ড চত্বরে উপনীত হই। সেতুর নীচে দিয়ে ছুটে চলেছে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। বাঁ দিকে প্রাচীরে বেষ্টিত বাঁধান ঘাট, সেইখানেই মহিলারা স্নান করেন। ডান দিকের ঘাটে স্নান করেন পুরুষেরা। আমাদের সঙ্গের পণ্ডিতজী বলেন, "এইটিই মহাপবিত্র ক্ষীরসাগর। এই সাগরের পবিত্র জলে স্নান করে হতে হবে পাপমুক্ত। তবেই দর্শন মিলবে মন্দিরের দেবতা ক্ষীর-ভবানীর। সম্পূর্ণ হবে পুণ্যলাভও।" পুণ্যলোভাতুরা মহিলারা যান বাঁ দিকে, আমরা আসি ডান দিকে। ধ্যান সিং জিনিসপত্র পাহারা দেয়। বুকজলে দাঁড়িয়ে স্নান সমাপন করে বদলে নেই কাপড়। অপেক্ষা করতে থাকি মহিলাদের আসবার। পণ্ডিতজী সকলের জন্য পূজার উপকরণ কিনতে দোকানে যান। ফিরে আসেন মহিলারা। সামনেই বিক্রি হয় দুধ আর পদ্মফুল। কয়েক প্রস্থে ফুল কিনে, সঙ্গের ঘটি দুধে ভর্তি করে নিয়ে আমরা তাঁর অনুগমন করি। দুধই এখানকার পূজার প্রধান উপচার। সমস্ত উপচার যোগাড় করে আমরা মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। একটি বৃহৎ বাঁধান কুণ্ডের ঠিক কেন্দ্রস্থলে মন্দিরটি অবস্থিত। নাই কোন রাস্তা মন্দিরের ভিতরে যাওয়ার। কুণ্ডটি জলে পরিপূর্ণ। জলের বুকে ভাসে ফুল আর বেলপাতা। শুনি এইখানেই গঙ্গাদেবী পাতাল থেকে নির্গত হন, অবরুদ্ধ হন

এই কুণ্ডতে। আবিষ্কৃত হন মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী ভবানীমাতাও এই গঙ্গা গর্ভে। পূজাও করতে হয় গঙ্গামাতাকেই। এক বিস্তৃত চানারের কুঞ্জও বেষ্টন করে আছে কুণ্ডটি। রচিত হয়েছে এক শান্ত শীতল তপোবন। এসেছিলেন এখানে স্বামী বিবেকানন্দও একদিন। করেছিলেন দেব দর্শন। আমরা পূজার উপকরণ নিয়ে কুণ্ডের ধারে বসে যাই। আমাকেই দলের পুরোধা করা হয়। পুরোহিত মন্ত্র পড়ান। পূজা করি নীচের গঙ্গামাতাকে, করি সামনের মন্দিরের দেবতা ভবানীমাতাকেও। প্রণাম করে, দর্শনী দিয়ে, সাত বার কুণ্ডকে পরিক্রমণ করি। তার পর পাশেই একটি চানার গাছের নীচে গিয়ে বসি। দেখি এসেছেন হাজার হাজার কাশ্মীরী হিন্দু মহিলা। শোভা পায় তাঁদের অঙ্গে আলখাল্লা। ঢেকে আছে গলা থেকে পা পর্যন্ত। দেখি ফুটে আছে এক একটি পদ্মফুল সারা চত্বর জুড়ে। তাঁদের রূপের আগুন ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে। আসছেন তাঁরা দলে দলে। পূজা দিয়ে, প্রদক্ষিণ করে চত্বরে গিয়ে বসছেন। এক বাঙালী ভৈরবীকেও দেখি। তিনিও পূজা দিয়ে যান। দেখি এক কাশ্মীরী মহিলা খাওয়াচ্ছেন ছোট ছোট মেয়েদের, সঙ্গে নিয়ে আসা খাবার। করছেন কুমারী পূজা। ডাক আসে পণ্ডিতজির কাছ থেকে। গিয়ে দেখি প্রস্তুত তেলেভাজা পরোটা আর ঘটি ভর্তি চা। সেই পরোটা আর চা খেয়ে ভবানীমাতার কাছ থেকে বিদায় নেই। শ্রীনগরে ফিরে আসি। আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক তপোবন। আর সেই তপোবনের মধ্যে একটি মন্দির। বেষ্টন করে আছে সহস্র বাহু বিস্তার করে এক অতিকায় চানারের কুঞ্জ সেই মন্দিরের দেবতাকে, করছে ছায়া-শীতল।

৭

পরের দিন ভোরে উঠে শঙ্করাচার্যের মন্দির দেখতে যাই। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি মহিমময় মূর্তিতে তখৎ-ই-সুলেমান পর্বতের শীর্ষদেশে, পরিচিত শঙ্করাচার্য পর্বত নামেও। নির্মিত হয় এই মন্দিরটি খৃষ্টের জন্মের দু'শ কুড়ি বছর পূর্বে, বুকে নিয়ে বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। নির্মাণ করেন সম্রাট অশোকের পুত্র জলৌকা। পরে এই মন্দিরেই শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠা করেন

শিবলিঙ্গ, পরিচিত বান লিঙ্গেশ্বর নামে। সংস্কার করেন এই মন্দির ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা গোপাদিত্য। হয় দ্বিতীয়বার সংস্কৃত অষ্টম শতাব্দীতেও।

আমরা মন্দিরের পাদদেশে শীকারা থেকে নেমে অতিকষ্টে পর্বত আরোহণ করি। অনেকগুলি সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে উপনীত হই পাহাড়ের শীর্ষদেশে, মন্দিরের সামনে। পিরামিডের আকারে নির্মিত এই মন্দিরের চূড়া আর অঙ্গের কুলুঙ্গি, তাদের অঙ্গে শোভা পায় স্থপতির সূক্ষ্ম শিল্পসম্ভার। দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে। ভিতরে প্রবেশ করে দেবতাকে প্রণতি জানিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। দেখতে থাকি পরিপার্শ্বিক সৌন্দর্য। দেখি পদতলে প্রবাহিতা খরস্রোতা ঝিলাম। দেখি শ্রীনগর শহর, বুকে নিয়ে আছে অসংখ্য অট্টালিকা, উদ্যান আর রাজপথ। দেখি ডাল হ্রদ, প্রসারিত হয়ে আছে দিগন্তে। দেখি মন্দিরের শীর্ষদেশে স্থাপিত হয়েছে একটি আলোক স্তম্ভ। রাত্রিতে আলোকিত করে চারিদিক, জানায় মন্দিরের অবস্থিতিও।

শুনি, যখন মুসলমানের অত্যাচারে কাশ্মীরের হিন্দু অধিবাসীরা দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে, তখন এই পর্বতের শীর্ষদেশ থেকেই আচার্য শ্রেষ্ঠ শঙ্কর প্রেরণ করেন তাঁর নিষেধের বাণী। সে বাণী প্রতিধ্বনিত হয় পাহাড়ের অঙ্গে, প্রকম্পিত হয় কাশ্মীরের আকাশে বাতাসে। প্রবেশ করে কাশ্মীরবাসীর মর্মে। ভীতির সঞ্চার আনে কাশ্মীরের অত্যাচারী মুসলমান শাসকদের অন্তঃকরণে। তারা সাহস পায় না অগ্রসর হতে, যতদূর পর্যন্ত সেই বাণী পৌঁছায়। রক্ষা পায় কাশ্মীরের হিন্দু অধিবাসীরা, হতে হয় না তাদের মুসলমান। ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে হয় না তাদের ধর্মান্তর গ্রহণ। রক্ষা পায় হিন্দুধর্ম আর সংস্কৃতি। তাই এত পবিত্র এই পর্বত, বিরাজ করে এখানে পরম শান্তি।

মন্দির দেখে আমরা হাউসবোটে ফিরে আসি।

বিকেলে চা ও খাবার খেয়ে, শীকারায় নদী পার হয়ে বাঁধ থেকে একটি ট্যাক্সি নিয়ে চশমাসাহী দেখতে যাই। ডালের কিনারা দিয়ে ধীরে ধীরে ট্যাক্সি চলে। আমরা দেখতে দেখতে যাই ডালের শোভা। দেখি পরিমহল। পরিমহল পার হয়ে ট্যাক্সি মোড় নেয় ডানদিকে। আধ মাইল অতিক্রম করে চশমাসাহীতে পৌঁছায়। শুনি এই শীতল ঝরণাটিও আবিষ্কার করেন

সম্রাট জাহাঙ্গীর। তিনিই নির্মাণ করেন এই কুণ্ড আর উদ্যান। নাই নাকি সারা কাশ্মীরে এমন হজ্‌মী জল। আসে দলে দলে শ্রীনগর থেকে লোক, নিয়ে যায় এই জল। আমরা পেট ভর্তি করে পান করে আসি। সঙ্গেও নিয়ে আসি তিন চার বোতল জল। একটি নীল পাহাড়ের তলদেশ থেকে নির্গত এই ঝরণা, এসে পড়ছে একটি বাঁধান কুণ্ডে। রচনা করা হয়েছে একটি সুন্দর উদ্যান কুণ্ডের চারদিকে। নানা রঙের ফুলে আলোকিত হয়ে আছে উদ্যানটি। বেষ্টিত হয়ে আছে এক প্রাচীরে। সৃষ্টি হয়েছে এক সুন্দর, রমণীয় শান্তির পরিবেশ। আমরা এক প্রান্তে বসি। দেখি তিন দিকে নীল পাহাড়ের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে উদ্যানটি। সামনে, দূরে, বিস্তারিত হয়ে আছে ডালের নীল জল, মিশেছে গিয়ে দিগন্তে। দেখি প্রকৃতির এক মহিমময় রূপ। দেখে মুগ্ধ হই।

চশমাসাহী থেকে যখন রওনা হই তখন রাত্রির অন্ধকার দিগন্তে নেমে এসেছে। জ্বলে উঠেছে আলোর মালা শ্রীনগরের রাস্তায়, ডালের বুকে। আমরা নেহেরু পার্ক দেখতে যাই। দেখা যায় বহুদূর থেকে রাত্রির নেহেরু পার্ক, বুকে নিয়ে আছে বিভিন্ন রঙের আলো। দাঁড়িয়ে আছে ডালের বুকে এক স্বপ্ন লোক, এক ইন্দ্রপুরী। স্পষ্টতর হয় পার্ক যত আসি নিকটে। ভেঙে যায় স্বপ্নের ঘোরও। গাড়ি থেকে নেমে শীকারা করে উদ্যানে উপনীত হই। শুনি বহু অর্থ-ব্যয়ে সেখ আবদুল্লা নির্মাণ করেন এই উদ্যানটি। হয়ে আছে ভারত ও কাশ্মীরের মৈত্রীর প্রতীক। ঘুরে ঘুরে দেখি এই উদ্যান। কিছুক্ষণ বসে থাকি একটি বেঞ্চির ওপর। রওনা হই শীকারা করে। রাত্রি দশটায় বোটে ফিরে আসি।

৮

তার পরের দিন পহেলগাম অভিমুখে রওনা হই। দেখতে যাই অবন্তীশ্বরের আর মার্তণ্ডের মন্দির। বাস বেলা দশটায় ছাড়ে। জিনিসপত্র আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমাদের হাউসবোটের মালিকের সঙ্গে। আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে যাই। মিনিট দশেক বিলম্ব হয় পৌঁছাতে। দেখি বাসসুদ্ধ যাত্রী

অপেক্ষা করে বসে আছে। হয়েছে বিরক্তও। তাই লজ্জা অনুভব করি। আরও মিনিট দশেক পরে বাস ছাড়ে, যায় জম্মু শ্রীনগরের পরিচিত রাস্তা দিয়ে। এবারে আমাদের সঙ্গী হন পণ্ডিতজি, সপরিবারে। সঙ্গে যান তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও একটি কুমারী কন্যা। কন্যাটি যুবতী ও রূপবতী। কাশ্মীরে আসবার পর থেকে এই পণ্ডিতজির হাতেই আমাদের দেখা-শোনার ভার ন্যস্ত হয়। তিনিই সস্তায় ঠিক করে দেন আমাদের বাসের জন্য হাউসবোটটি, উপস্থিত থাকেন বাস ষ্ট্যাণ্ডে, যখন শ্রীনগরে পৌঁছাই। আমাদের সঙ্গে ক্ষীর-ভবানীতে যান। এখন সপরিবারে পহেলগামে চলেছেন। পণ্ডিতজিরা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। পুরুষ পরম্পরায় শ্রীনগরে বাস করেন। নিজেদের বাড়ি আছে। এই বাড়িতেই বাস করেছেন তাঁর পিতা, পিতামহ, বৃদ্ধ পিতামহ। এখন বাস করেন তাঁর ছেলেমেয়েরা। আমরাও একদিন এই বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে যাই। মুগ্ধ হই তাঁদের সদয় ব্যবহারে, আদরে আর আপ্যায়নে। তাঁর আর তাঁর স্ত্রীকে জম্মুতে কাটাতে হয়। সেখানে জম্মু-সরকারের অধীনে তিনি কাজ করেন। পণ্ডিতজির এক ছেলে দিল্লীতে বাস করেন, অধ্যাপনা করেন সেখানকার এক কলেজে। তিনি কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী রামচন্দ্র কাকের জামাতা। পণ্ডিতজি যেমন অমায়িক, তেমনই আত্মভোলা। বহু সৌভাগ্য না হলে এমন বন্ধু, সহচর আর সাথী বিদেশে মেলে না। সামনের আসনের একদিকে আমরা বসেছি। অপরদিকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, এসেছেন তিনি যুক্তপ্রদেশ থেকে। তাঁর পাশে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা। তাঁদের পিছনের কয়েকখানি আসন পণ্ডিতজিরা সপরিবারে অধিকার করেছেন।

বাস ছাড়তেই পরিষ্কার বাংলায় নিজের নাম ধরে ডাকতে শুনে, চমকে পাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার যুক্তপ্রদেশের প্রতিবেশী আমার দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসছেন। মনে কৌতূহল জাগে আলাপ করবার। তিনি বলেন তাঁদের বাড়ি এলাহাবাদে। সেখান থেকে আই-এসসি পাস করে লক্ষ্ণৌ থেকে ডাক্তার হন। তারপর সরকারী চাকরি নিয়ে যুক্তপ্রদেশের প্রায় সমস্ত শহরেই ভ্রমণ করেন। মাস কয়েক আগে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে, দেরাদুনে বাড়ি নির্মাণ করে সেখানে বাস করছেন। সপরিবারে কাশ্মীর দেখতে এসেছেন। ছেলেটি কাজ করে বোম্বাইতে সেও দু' এক দিনের

মধ্যেই সেখান থেকে পহেলগামে আসবে। সকলে মিলে অমরনাথে যাবেন। দেখবেন তুষার তীর্থ।' মেয়েটির বয়স বছর আঠারো, এবারে আই-এ পাস করে বি-এ পড়ছে। আমার কন্যার সমবয়সী। আমাদের আলাপ বাংলায় চলতে থাকে। শুনি এলাহাবাদের বহু বাঙ্গালীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাট্যাচার্য শিশির ভাতুড়ী আমার কেউ হন কি না? আছে কি কোন সম্পর্ক প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় শিবদাস বিজয়দাস ভাতুড়ীর সঙ্গে? বাস এসে থামে পামপুরে। যাত্রীরা সকলেই বাস থেকে নেমে পড়ে। আমরাও নামি। ঘুরে ঘুরে জাফরানের ক্ষেত দেখি। নাই ভারতের অন্য কোথাও। পণ্ডিতজি বুঝিয়ে দেন কখন বীজ রোপণ করা হয়, কখন ফোটে ফুল, আর কি উপায়ে জাফরানের ফুলের রেণু থেকে তৈরী হয় জাফরান।

গাড়ি মিনিট পনর পরে ছাড়ে। অবীন্তপুরে এসে থামে। দেখি অবন্তী-শ্বরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। দেখি পূর্বের গৌরব বুকে নিয়ে আছে এক অতি অপরূপ হিন্দুস্থপতির ভাস্কর্যের নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি ৮৮৩ খৃষ্টাব্দে উৎপল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা অবন্তী বর্মণ। প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দিরে অবন্তীশ্বর শিবকে। ছিল এখানে একটি বিষ্ণু মন্দিরও। শ্রেষ্ঠত্বে মার্তণ্ড মন্দিরের পরেই এর স্থান।

আধ ঘণ্টা পরে বাস ছাড়ে। প্রায় ছত্রিশ মাইল জম্মু-কাশ্মীরের রাস্তায় চলবার পর, বাস পহেলগামের রাস্তায় মোড় নেয়। কিছুদূর গিয়েই একটি সেতু পার হতে হয়। লেডার নদী অতিক্রম করে এসেছে পহেলগাম থেকে। বহুদূর পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে দেখা যায় দুটি জলধারা, আর তার কিনারায় উইলোর গুচ্ছ। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে লুকিয়ে আছে মুখ। স্পর্শ করে আছে গুণ্ঠনের প্রান্তদেশ জলধারার বুক। বাস অনন্তনাগের বাজারে এসে থামে। বাস থেকে নেমে আমরা অনন্ত নাগ দেখতে যাই। নাগ ঝরণার কাশ্মীরী প্রতিশব্দ। আদিম যুগ থেকেই কাশ্মীরবাসীরা নাগের উপাসক। পূজা করেন সর্প-দেবতাকে, তাঁরা বাস করতেন এই সমস্ত নির্ঝরে। তাই মহা পবিত্র এখানকার সমস্ত নাগই। আমরা মিনিট দুই তিনের পথ অতিক্রম করে একটি প্রাচীরে বেষ্টিত উদ্যানবাটিতে এসে পৌছাই। সিঁড়ি দিয়ে উপরের স্তরে গিয়ে দুইটি বৃহৎ কুণ্ড দেখি। কুণ্ডের ভিতরে দুইটি ঝরণা

আছে। তাদের মধ্যে একটি গন্ধকের। কুণ্ডের জল পড়ে অতিক্রম করে কুলুকুলু ধ্বনিতে উদ্যানে এসে পড়ছে। সম্মুখে এক বিরাট ঘন নীল গিরিবর, কোলে নিয়ে আছে কুণ্ড দু'টিকে, সৃষ্টি হয়েছে এক শান্তির পরিস্থিতি। আছে এখানে আরও কয়েকটি ছোট কুণ্ড, সেখান থেকে গন্ধকের জল নির্গত হয়। কুণ্ডের জলে মুখ হাত ধুয়ে, কিছুক্ষণ বসে থাকি কুণ্ডের পাড়ে। তার পর একে একে শিব, রাম, সীতা আর হনুমানজিকে প্রণাম করি। তাঁরা তিন মন্দিরে বিরাজ করেন। ছুটতে ছুটতে গিয়ে বাসে উঠি।

বাস শহরের ভিতর দিয়ে চলতে থাকে। অনন্তনাগ কাশ্মীর সরকারের একটি জেলার সদর শহর। এইখানেই ছিল ইস্‌লামাবাদ শহর, কাশ্মীরের মুসলমান রাজাদের রাজধানী। আছেন এখানে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। এখানে বেশ ভাল কার্পেট তৈরী হয়। দামও শ্রীনগরের চাইতে কম। দেখি বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে সুন্দর সুন্দর কার্পেট কয়েকটি বাড়ির দাওয়াতে। দু'মাইল অতিক্রম করে বাস এসে মাটনে বা মাত্তানে বা মচ্ছিভবনে থামে। বাস থামতেই অনেকগুলি পাণ্ডা এসে বাসের যাত্রীদের আক্রমণ করে। খবর নেয় নাম ও ধামের। বলি নাম আমাদের ভারতবাসী, থাকি ভারতবর্ষে। শুনে তারা ক্ষুণ্ণ হয়ে প্রস্থান করে। আক্রমণ করে অন্য যাত্রীদের। মচ্ছি-ভবনে একটি বৃহৎ কুণ্ড আছে, পূর্ণ হয়ে আছে স্বচ্ছ শীতল জলে। দেখা যায় হাজার হাজার মাছ, খেলা করে সেই জলে। বিভিন্ন তাদের আকার আর বিচিত্র তাদের অঙ্গের রঙ। তাই এই স্থানের নাম রাখা হয় মচ্ছি-ভবন। নিক্ষেপ করি খই কুণ্ডের জলে, আসে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ, জড় হয়, খাবার জন্য। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। বড় কুণ্ড থেকে জল এসে পড়ে আর একটি ছোট কুণ্ডতে। সেটিও মাছে ভর্তি। বড় কুণ্ডের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি সূর্য-মন্দির। অপরপাশে মহিলাদের স্নানের জায়গা। দেখি জনকতক লোক কুণ্ডের ধারে বসে পিতৃলোকের তর্পণ করছেন। শুনি সারা কাশ্মীর থেকে আসেন নরনারী, এসে এই কুণ্ডে স্নান করেন। তারপর সূর্য-মন্দিরে পূজা দিয়ে, কুণ্ডের ধারে বসে পিতৃলোকের তর্পণ করেন। তাই মহা পবিত্র এই স্থান। কাশ্মীরের গয়া, স্থান মাহাত্ম্যে পুষ্করের সমান। তাই পাণ্ডারা আক্রমণ করে আমাদের বাস, যদি পায় নিজের নিজের যজমান।

নিয়ে আসে ভবিষ্যতের আশাও। আমরা কুণ্ডের জল স্পর্শ করে, সূর্য-মন্দিরে প্রণাম করে বাসে ফিরে আসি।

এখান থেকে এক মাইলের মধ্যে, আর ইস্‌লামাবাদ থেকে পাঁচ মাইল দূরে, দাঁড়িয়ে আছে একটি সুউচ্চ মালভূমির উপর মার্তণ্ড মন্দির। পরিচিত পাণ্ডু-ভবন নামেও। বুকে নিয়ে আছে কাশ্মীরের হিন্দু স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের। মন্দিরের দুই পাশে, সম্মুখে, পশ্চাতে, যতদূর দৃষ্টি চলে, বিস্তৃত হয়ে আছে একটি রমণীয় উপত্যকা। কাশ্মীরের সৌন্দর্যের এক শ্রেষ্ঠ লীলাভূমি। সৃষ্টি হয়েছে এক অপরূপ পরিবেশ। দাঁড়িয়ে আছে এক মহিমময় মন্দির, অঙ্গে নিয়ে স্থপতির সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার, প্রকৃতির এক সুন্দরতম লীলানিকেতন। তাই বিদেশী পর্যটকেরা এই মন্দিরকে কাশ্মীরের সিংহ বলে অভিহিত করেন। লাভ করে শ্রেষ্ঠ আসন বিশ্বের শিল্পের দরবারে। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ললিতাদিত্য মুক্তাদিত্য। নির্মিত হয় ৭২৫ থেকে ৭৬০খৃষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দিরে সূর্যনারায়ণকে, সূর্য-মন্দিরে পরিণত হয় এই মন্দির। আছে অপরূপ একটি সূর্য-মন্দির কোণারকে, পুরী থেকে বার মাইল দূরে, বুকে নিয়ে ভারতীয় স্থাপত্যের আর এক গৌরবময় যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কাশ্মীরের মুসলমান রাজা সিকান্দার শাহ ধ্বংসে পরিণত করেন এই মন্দিরের বিগ্রহগুলিকে। ধ্বংসে পরিণত হয় মন্দিরের কিছু অংশও ১৩৯৩ থেকে ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে। মহারাজ জয়সিংহ ১১২৪ থেকে ১১৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই মন্দিরের বৃহৎ প্রাঙ্গণটিকে একটি দুর্গে পরিণত করেন।

প্রাচীরে বেষ্টিত দুশ কুড়ি ফিট দীর্ঘ আর একশ' বিয়াল্লিশ ফিট প্রস্থ এক বৃহৎ প্রাঙ্গণের ভিতর মূল মন্দিরটি অবস্থিত। আয়তন তার ষাট ফিট দীর্ঘ আর ছত্রিশ ফিট প্রস্থ। দাঁড়িয়ে আছে একটি নাট-মন্দির মূল মন্দিরের সামনে। তার দু'পাশে আছে দু'টি প্রকোষ্ঠ, যেমন থাকে রঙ্গমঞ্চে। পরিণত হয়েছে ভগ্ন অবস্থায়। প্রবেশ পথে শোভাপায় একটি সিংহদ্বার, বুকে নিয়ে আছে সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার। দাঁড়িয়ে আছে এখানে সেখানে প্রাঙ্গণের প্রাচীর, হয় নাই একেবারে নিশ্চিহ্ন। দেখি কয়েকটি অপরূপ খিলান, শোভা করে আছে প্রাচীরের শীর্ষদেশ। স্তূপীকৃত হয়ে আছে প্রাঙ্গণের ভিতরে আর বাইরে ছোট

বড় প্রস্তর খণ্ড। অবশিষ্ট পূর্ব গৌরবের। সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে দেখি চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে কত দেব-দেবীর মূর্তি, অস্পষ্ট হয়ে এসেছে তাদের রূপ কালের করালে, আর মুসলমানের নির্মম অত্যাচারে। সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে মূল মন্দিরে প্রবেশ করি। দেখি দাঁড়িয়ে আছে সূর্য-মন্দির, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন। দেওয়ালের অঙ্গের কুলুঙ্গিতে আর নিম্নদেশে শোভা পাচ্ছেন কত বিভিন্ন দেব-দেবী, কিন্তু সুস্পষ্ট নয় তাঁদের স্বরূপ। বিষ্ণুর মূর্তি বলে মনে হয়। ক্ষোদিত করেছেন স্থপতি তাদের মস্তকের উপর ফণাযুক্ত নাগের শির। দেখে বিস্মিত হই এইসব মৃাতর অঙ্গের সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্পদ আর খিলানের বুকের অপরূপ পদ্মগুলি। প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ গৌরবময় যুগের। আসবার পথে দেখি অনুরূপ স্থাপত্যের নিদর্শন অবন্তীশ্বরের মন্দিরের ধ্বংস স্তূপেও। আরও সূক্ষ্ম তাদের অঙ্গের কারুকার্য, আরও বিস্তৃত তাদের পরিকল্পনা আরও অনবদ্য রূপদান।

নাই কোনও চিহ্ন মন্দিরের ছাদের। অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে একেবারে কালের করালে। না জানি স্থপতি ক্ষোদিত করেন কত অনবদ্য শিল্প-সম্ভার তার অঙ্গে। দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের তাই নির্মিত হয় এই মন্দিরটি আর তার সংলগ্ন প্রাঙ্গণ এক ভঙ্গুর প্রস্তরে। নির্মিত হত যদি সেই সব প্রস্তরে যা ব্যবহার করেছেন দ্রাবিড়স্থানের স্থপতি, নির্মাণ করেছেন মন্দির, কাঞ্চীপুরমে, তাঞ্জোরে, শ্রীরঙ্গমে আর মাদুরাইতে। নির্মাণ করেছেন ত্রিবেন্দ্রামে আর রামেশ্বরমে,—সহ্য করতে পারতো কালের নির্মমতা, পরিণত হত না ধ্বংসে, হত কাল জয়ী, হয়ে থাকতো অক্ষয় আর অম্লান। শিল্পীরা হত অমর। অমরত্ব লাভ করতেন ললিতাদিত্য, লাভ করতো কাশ্মীর। ভারত হত সৌভাগ্যশালী। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, শ্রদ্ধা জানাই মহারাজ ললিতাদিত্যকে, যিনি এই মন্দিরের সৃষ্টিকর্তা, জানাই শিল্পীদের। নিয়ে আসি মনের মন্দিরে এক স্মৃতি যা আজও অক্ষয় হয়ে আছে, আছে অম্লান হয়ে।

যাওয়ার পথে দেখি এক জলপ্রণালী, মালভূমির বুকে। বার হয়েছে গণেশবল থেকে। শুনি এটি একটি কৃষির খাল করছে নিকটবর্তী ভূমি উর্বরা, করছে স্বর্ণপ্রসূ।

মাটন পার হয়ে মাইল পাঁচ ছয় অতিক্রম করবার পর বাস উঠতে থাকে

একটি পাহাড়ে, উঠে ধীরে ধীরে। সুরু হয় এক অতি মনোরম রাস্তা, সমপর্যায়ে পড়ে শ্রীনগর—গুলমার্গ রাস্তার। রাস্তার দক্ষিণে ছুটে আসে একটি স্রোতস্বিনী, আসে পহেলগামের পর্বত শ্রেণীর অঙ্গ বেয়ে। শোনা যায় তার অন্তরের ধ্বনিও। রাস্তার পাশের চানারের ছায়া পড়ে তার বুকে, তাকে ছায়া শীতল করে। কোথাও চানারকে বেষ্টন করে দুদিক দিয়ে প্রবাহিত হয় স্রোতস্বিনী। বামে পাহাড়ের শ্রেণী। ওপারে ধানের ক্ষেত দূরের পাহাড়ের পদতলে গিয়ে মিশেছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের অঙ্গ থেকে প্রবাহিত হয় পাহাড়ী নদী। এসে প্রতিহত হয় রাস্তার অঙ্গে, তারপর ছুটে চলে সমান্তরালে। ক্রমে অন্তর্হিত হতে থাকে চানার, রাস্তার বুকের উপর থেকে। এগিয়ে আসে ঘন নীল পাহাড়ের শ্রেণী, আসে দু'দিক থেকেই, বুকে নিয়ে আসে দেওদার আর পাইন। বাস চলতে থাকে পাহাড়ের রাস্তায়, অতিক্রম করতে থাকে নীল পাহাড়ের শ্রেণী, তাদের অঙ্গে আর শীর্ষদেশে শোভা পায় দেওদার, শোভা পায় পাইন। দেখা যায় দূরে হিমগিরি শ্রেণী, শীর্ষে নিয়ে তুষারের রেখা, মিশে যায় দিগন্তে। ক্রমে এগিয়ে আসে পাহাড়ের শ্রেণী, শুনা যায় একটি মৃদুগুঞ্জনও, আসে লেডারের বুক থেকে। গর্জনে পরিবর্তিত হয় সেই গুঞ্জন। একটি মোড় নিয়ে বাস প্রবেশ করে পাহাড়ের বেষ্টনীর মধ্যে, উপনীত হয় পহেলগাম শহরে। একটি অত্যুচ্চ পাহাড়ের সানুদেশে নামে। তখন বেলা তিনটে। আমরা বাস থেকে নেমে পড়ি।

পহেলগাম একটি ক্ষুদ্র শহর, এই শহরটি প্রায় সাড়ে আট হাজার ফিট উঁচুতে। মেষপালকের কাশ্মীরী প্রতিশব্দ পহেল। বাস করতো এখানে অনেক মেষপালক, তাই স্থানটির নাম রাখা হয় পহেলগাম, মেষপালকের গ্রাম। তাদেরই একজন, কোনও এক প্রাচীনকালে, পাহাড়ে মেষ চরাতে নিয়ে যায়। দিনের শেষে পাওয়া যায় না একটি মেষ। তাই সম্ভব হয় না বাড়িতে ফিরে আসাও। মেষের অনুসন্ধানে সে অতিক্রম করে পাহাড়ের উপর পাহাড়। অতিক্রম করে রাত্রিদিন। অতিক্রম করে কত গ্লেসিয়ার কত তুষারের পাহাড়। এমনই করে কেটে যায় কিছুদিন। একদিন সে উপনীত হয় এক গুহার সামনে। দেখে বিস্মিত হয় গুহার মধ্যে এক তুষারের শিবলিঙ্গ। কিছুক্ষণ অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে শিবলিঙ্গটিকে। লুটিয়ে পড়ে দেবতার

চরণে। ফিরে আসে গ্রামে, নিয়ে আসে এক অপূর্ব উপলব্ধি, মনের মন্দিরে। এসে জানায় তার অভিজ্ঞতার কথা তার বাপ মাকে। জানায় বন্ধুবান্ধব আর প্রতিবেশীদের। অবগত হয় গ্রামবাসীরাও। শেষে গ্রাম অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে এই খবর দিকে দিকে। আসেন হিমালয়ের গুহা থেকে সাধু সন্ন্যাসীরা, সমাগত হন মুনি ঋষিরাও, আবিষ্কার করেন ভারতের এক শ্রেষ্ঠ তীর্থ। আবিষ্কার হয় তুষার তীর্থ অমরনাথ। আবিষ্কার করে পহেলগামের এক নিরক্ষর মেষপালক। অমরনাথ স্বয়ম্ভূ। তুষার জমে গড়ে উঠে তার অঙ্গ। গড়ে উঠে এক অপূর্ব শিবলিঙ্গ গুহার অভ্যন্তরে। সেই অঙ্গ পূর্ণ পরিণতি পায় শ্রাবণী পূর্ণিমায়। সেইদিন যাত্রী আসে দলে দলে। আসে ভারতের সব প্রান্ত থেকে। আসে সুদূর বিদেশ থেকেও। এসে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে এক আশ্চর্য দেবতাকে। দিয়ে যায় শ্রদ্ধার অঞ্জলি, দেয় নিঃশেষ করে, জানায় প্রণতি, চরিতার্থ হয় তাদের জীবন, সফল হয় জন্ম। অমরনাথ অমর করেন কাশ্মীরকে, সেই সঙ্গে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকে এক ক্ষুদ্র গ্রাম, নাম তার পহেলগাম। ক্রমে পরিণত হয় সেই গ্রাম একটি শহরে। পহেলগাম থেকেই যেতে হয় অমরনাথে। নাই অন্য কোনও পথ। যেতে হয় আঠাশ মাইল। আট মাইল দূরে চন্দনবাড়ি। এখানে আছে একটি তুষারের সেতু, যেতে হয় সেই সেতু পার হয়ে। আরও বার মাইল অতিক্রম করে উপনীত হতে হয় শেষনাগে। ছুটে আসে দুধগঙ্গা বা লেডার নদী এই পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে। বয়ে যায় পহেলগামের বুকের উপর দিয়ে উদ্দাম গতিতে। বুকে নিয়ে এক অশ্রান্ত গর্জন, বুঝি হার মানিয়ে দেয় সেই গর্জন সমুদ্রের গর্জনকেও।

এখানে কাশ্মীর সরকারের একজন তহশীলদার আছেন, পুরোধা পৌর শাসনের। আছে ডাকঘর, আছে একটি থানাও। আছে আট-দশটি ছোট বড় হোটেল, আর আছে তাঁবু, খাটান হয় সেগুলি এক একটি অধিত্যকার উপর, পাইন কুঞ্জের নীচে। খাটান হয় যাত্রীদের অভিরুচি অনুযায়ী, দিলে ন্যায্য দাম। বাজারটিও বেশ বড়। পাওয়া যায় সব রকমের জিনিস। আছে এই বাজারে অনেকগুলি দোকান। সেখানে পাওয়া যায় তাঁবু, রেনকোট, কম্বল আরও অনেক রকমের অমরনাথের পথের প্রয়োজনীয় জিনিস। ভাড়া করে নিয়ে

যান যাত্রীরা, ফিরিয়ে দেন যাত্রা হলে পরিসমাপ্ত। দিতে হয় পুরা ভাড়া অগ্রিম। আছে কয়েকটি ভালো হালুইকরের দোকানও, পাওয়া যায় খাঁটি ঘিয়ের খাবার। আছে অনেক ঘোড়ার মালিকও, বাস করে নিকটবর্তী পাহাড়ী গ্রামে। ঘোড়া নিয়ে এসে আক্রমণ করে যাত্রীদের বাস থামামাত্র, সংগ্রহ করে যাত্রী, হোটেলে হোটেলে ঘুরে ঘুরেও। তারাই নিয়ে আসে কুলী। তাদের উপর আছে একজন চৌকিদার, তাকে খবর দিলে সুলভ হয় ঘোড়া আর কুলী পাওয়াও, সহায়ক অমরনাথে যাওয়ার।

পহেলগাম কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতনের অন্যতম। বিখ্যাত স্বাস্থ্য নিবাস। প্রায় আট হাজার ফিট উঁচুতে অবস্থিত, একটি মাইল দেড়েক দীর্ঘ, মাইল খানেক প্রস্থ উপত্যকা। চতুর্দিক বেষ্টন করে আছে পহেলগামকে সুউচ্চ হিমগিরি শ্রেণী। তাদের উচ্চতা বার হাজার ফিটের উপর, শীর্ষে নিয়ে আছে তুষারের মুকুট, অঙ্গে নিয়ে আছে ঘন নীল পাইনের কুঞ্জ। তার বুক ভেদ করে প্রবাহিত হয় দুধগঙ্গা, বিভক্ত হয়ে আছে দুইটি ধারায়। প্রবাহিত হয় অবিরাম গর্জনে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট অধিত্যকা বেষ্টিত হয়ে আছে পাইনের কুঞ্জে, মনে করিয়ে দেয় তপোবনের কথা। সৃষ্টি করে এক নন্দন কানন। তাই অমরনাথের যাত্রী ছাড়াও, যাত্রী আসে পহেলগামে। আসে হাজারে হাজারে, কাটিয়ে যায় কেউ এক মাস, কেউ ততোধিক, উপভোগ করে পহেলগামের শান্ত স্বর্গীয় পরিবেশ, ফিরে পায় হৃত স্বাস্থ্য। এই রকম অনেক পরিবার ছিলেন আমাদের হোটেলের অধিবাসী। কেউ এসেছিলেন পাঞ্জাব, কেউ যুক্তপ্রদেশ, কেউ বোম্বাই থেকে। এসেছিলেন সপরিবারে। থাকে না কোন যাত্রী পহেলগামে শীতকালে, পহেলগাম তখন তুষারে আবৃত থাকে।

আমরা বাস থেকে নামামাত্র আক্রমিত হই তিনদিক থেকে। এক যোগে আক্রমণ করে কুলীরা, হোটেলের মালিকেরা আর ঘোড়ার মালিকেরা, সঙ্গে নিয়ে ঘোড়া। দিশেহারা করে দেয়। আসে বিপদের উপর বিপদ। হঠাৎ মেঘে আচ্ছন্ন হয় দিগন্ত, অবলুপ্ত হয় তার অন্তরালে পাহাড়ের শ্রেণী। আসে বৃষ্টি, আসে বেশ জোরে। সময় পাওয়া যায় না ছাতা খুলবারও। পণ্ডিতজির উপর সব ভার অর্পণ করে, আমরা ছুটে গিয়ে নিকটের একটি বাড়ির বারান্দায়

আশ্রয় নেই। বৃষ্টি থামবার অপেক্ষা করতে থাকি। আশ্রয় নেন পণ্ডিতজির পরিবারবর্গ, আর আমাদের যুক্ত প্রদেশের সহযাত্রী ডাক্তারবাবুও, আশ্রয় নেন সপরিবারে।

স্থির হয় সবাই মিলে একই হোটেলে থাকবো। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে যায়। দেখি তখনও পণ্ডিতজিকে ঘিরে আছে কুলীর দল, সক্ষম হন নাই তিনি তাদের পাওনা স্থির করতে। ব্যূহ ভেদ করতে পারেন নাই। তাঁকে জানিয়ে আমরা হোটেল ঠিক করতে যাই। দেখি একে একে অনেকগুলি হোটেল। সবগুলিই যাত্রীপূর্ণ। যেগুলি আছে খালি সেগুলি মনোমত নয়। শেষে দূরে, পাহাড়ের গায়ে, দুধগঙ্গার একেবারে কিনারায় অবস্থিত হোটেলটিতে আশ্রয় নেই। নেন না ডাক্তারবাবু, রাজী নন অতদূরে থাকতে। অপূর্ণ রয়ে যায় আমাদের এক হোটেলে বাসের বাসনা।

কুলীরা জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে যায়, শেষ হয় আমাদের চা-পানও, কিন্তু দেখা নাই পণ্ডিতজির, সন্ধান পাওয়া যায় না তাঁর পরিবারবর্গেরও। আমি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। দেখতে যাই শহর। আকাশ তখন মেঘ-মুক্ত। দু'এক ফালি মেঘ ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকের পর্বতশ্রেণীর বুকে, হয়ে আছে বিচ্ছিন্ন। জানিয়ে দিচ্ছে তাদের অস্তিত্ব। বলে, "আমরা আছি। সময় হলেই আবার ছেয়ে ফেলবো পাহাড়ের শীর্ষদেশ। ছুটতে ছুটতে নেমে আসবো ধরিত্রীর বুকে। অন্ধকারে দিগন্ত লুপ্ত হয়ে যাবে। সুরু হবে বর্ষণ।" দেখি অপরাহ্নের শেষ রশ্মি এসে পড়ে চতুর্দিকের হিমগিরি শ্রেণীর মস্তকের উপর, জ্বলে তুষারের রেখা সেই আলোতে। কোথাও বা সৃষ্টি হয় পাহাড়ের শীর্ষদেশে এক একটি তুষারের নদী। অপরাহ্নের লাল আভা প্রতিফলিত হয় সেই নদীর বুকে, পরিণত করে এক একটি লাল নদীতে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এক সুন্দরতম পরিবেশ। শোনা যায় দুধগঙ্গার গর্জনও, এক শান্ত-গম্ভীর শান্তির পরিবেশে।

সকালে উঠে জানালা খুলতেই প্রকৃতির এক অপরূপ রূপ দেখি। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। দেখি সামনে দিয়ে প্রবাহিত হন দুধগঙ্গা, বয়ে যান উন্মত্ত বঙ্কিম গতিতে। যান গর্জন করতে করতে। সূর্যের কিরণে উদ্ভাসিত হয় তাঁর বুকের রূপালী জল। ওপারে, যতদূর দৃষ্টি চলে, দাঁড়িয়ে আছে এক ঘন নীল

পাইনের কুঞ্জ, এক নীল পাহাড়ের বুকে, স্পর্শ করে আছে আকাশ। মনে হয়, দাঁড়িয়ে আছেন এক নীলবসন গিরিবর, কোলে নিয়ে এক শ্বেত বসনা, নৃত্য চপলা, মুখরা কন্যাকে। শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। ফিরে আসি বারান্দায়। সম্মুখেই দেখা যায় একটি নাতিপ্রশস্ত উপত্যকা, অঙ্গে জড়িয়ে আছে সবুজ অঞ্চল। অঞ্চল ভেদ করে, শাড়ির পাড়ের মত, চলে যায় একটি সরু রাস্তা, ওঠে বঙ্কিম গতিতে অনতিদূরের পাহাড়ের অঙ্গে, মিশে গিয়ে দিগন্তে। এই রাস্তা দিয়েই যাত্রীদের অমরনাথে যেতে হয়। যায় যাত্রী দূরের পাহাড়ী গ্রামেও। কিছুক্ষণ বসে দেখি যাত্রীর চলাচল। দেখি অনেক দেশী সাহেব আর মেম, চন্দন বাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। চা ও খাবার খেয়ে বাজারে যাই।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে, পাহাড়ের উপরকার পাণ্ডব আমলের একটি মন্দির দেখতে যাই। আছে এখানেও একটি ঝরণা। সঙ্গী হন পণ্ডিতজি আর আমাদের হোটেলের সহযাত্রী এক শিখ-দম্পতী। সেতুর উপর দিয়ে অতিক্রম করি কলনাদিনী দুধগঙ্গা, অগ্রসর হই নৃত্যপরায়ণ উন্মাদিনী দুধগঙ্গার পাড়ের উপর দিয়ে, এক সুউচ্চ পাহাড়ের গা ঘেঁষে। পাহাড়ের শীর্ষদেশের তুষারের রেখা উদ্ভাসিত হয় সূর্যের কিরণে, ধরে সোনার বরণ। কিছুদূর নদীর ধার দিয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠতে থাকি, পৌঁছাই মন্দিরে, আসেন আরো অনেক দর্শন অভিলাষী। তাঁরাও টুরিষ্ট, এসেছেন পাঞ্জাব থেকে। আলাপ হয় তাঁদের সঙ্গে। ফিরবার পথে পাকদণ্ডী দিয়ে আসি। বর্ষায় পিছল হয় রাস্তা। আসতে হয় খুব সাবধানে। তবুও গড়াগড়ি যান আমার স্ত্রী ও পণ্ডিতজি, যান আরও দু'জন মহিলা। শেষে অতিকষ্টে নদীর ধারে উপনীত হই। বসে থাকি সেখানে কিছুক্ষণ। দেখি চতুর্দিকের শোভা। ফিরে আসি হোটেলে। হোটেলের সহযাত্রীদের সঙ্গে গল্পগুজবে অতিবাহিত হয় সময়। যোগ দেন পণ্ডিতজির কন্যা আর পুত্রবধূও।

পরদিন ভোরে উঠে, শ্রীনগরে ফিরবার বাসের ব্যবস্থা করে, চন্দনবাড়ির পথে যাই। অপরূপ রাস্তা, এঁকেবেঁকে চলে, মৃদুগুঞ্জনা দুধগঙ্গার ধার দিয়ে। অতিক্রম করি প্রায় মাইল চারেক পথ, তারপর ফিরে আসি। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বাসের ষ্টেশনে রওনা হই, আসেন আমাদের হোটেলের সহবাসীরাও, বিদায় দিয়ে যান। এক বিচ্ছেদের ব্যথায় আচ্ছন্ন হয় মন।

বাস বেলা বারোটায় ছাড়ে। আসে সেই অতি রমণীয় পরিবেশের মধ্য দিয়ে। প্রথমে থামে মাত্তানে, তারপর অনন্তনাগে, সেখান থেকে ঘুরে যায় আচ্ছাবলে, গেটের পাশে এসে থামে।

গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেই দেখি ট্রাউট মাছের চাষ। দেখি জলে ভর্তি ছোট বড় অসংখ্য চৌবাচ্চা। সংযুক্ত তারা সরু নালা দিয়ে। স্রোতের জল নালা দিয়ে চৌবাচ্চায় এসে পড়ে। ট্রাউট মাছগুলি খেলা করে বেড়ায় চৌবাচ্চার মধ্যে, জালের বেষ্টনীর অন্তরালে, বিভিন্ন তাদের আকৃতি আর বিচিত্র তাদের অঙ্গের রং। প্রতিটি চৌবাচ্চার পাশে আছে একটি করে ফলক। তাতে লেখা আছে চৌবাচ্চার ভিতরের মাছের জাতি আর বয়স, পৃথক করা হয়েছে তাদের বয়স অনুযায়ী। খাওয়ানো হয় বিভিন্ন খাদ্য বিভিন্ন বয়সে। খায় তারা রেশম-কীট আর ছোট ছোট মাছ। শুনি খুব সুস্বাদু এই ট্রাউট মাছ, প্রিয় খাদ্য শেতাঙ্গদের, বিক্রি হয় পাউণ্ড দরে, চার থেকে পাঁচ টাকা করে। চৌবাচ্চার ধার দিয়ে গিয়ে পাহাড়ের পদতলে উপস্থিত হই। সেখানে দেখি একটি জরাজীর্ণ পাকাবাড়ি, ছিল নাকি কোনও সাধুর আস্তানা। বাড়িটি দেখে, দেখতে যাই আচ্ছাবলের স্বর্গোদ্যান। রচনা করেছিলেন এই উদ্যানটিও সুন্দরের পূজারী ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীর। সম-পর্যায়ে পড়ে তাঁর কাশ্মীরের অন্যতম কীর্তি সালিমারবাগের। দাঁড়িয়ে আছে এক প্রাচীন পাহাড়। বুকে নিয়ে লতাগুল্ম, অঙ্গে নিয়ে শৈবালের দল। জল পড়ে সহস্র ধারায়, পড়ে অবিরাম, সেই লতাগুল্ম থেকে আর শৈবালের অঙ্গ বেয়ে। ভাসিয়ে দেয় পাহাড়ের পদতল। পদতল থেকেও নির্গত হয় জল, নিঃসৃত হয় মাটি ভেদ করে, ঝরণা থেকে। সেই জল নিয়ে যাওয়া হয় একটি বৃহৎ চৌবাচ্চায়। সেখান থেকে প্রবাহিত হয় দ্বিতীয় স্তরে, তৃতীয় স্তরেও যায়। দ্বিতীয় স্তরে আছে একটি সুন্দর প্রশস্ত ঘর, অঙ্গে নিয়ে আছে মোগল স্থপতির আর চিত্রশিল্পীর সুন্দরতম শিল্পের নিদর্শন। এই ঘরেই এসে বসতেন সৌন্দর্যপিপাসু সম্রাট, সঙ্গে নিয়ে প্রিয় বেগমদের। উপভোগ করতেন নিজের রচিত এক স্বর্গোদ্যানের স্বর্গীয় পরিবেশ। শোভিত করা হয়েছে তিনটি স্তরকেই সবুজ ঘাসের গালিচায়। রচিত হয়েছে তার বুকে অসংখ্য ফুল, নীল জবা, ডালিয়া আর গোলাপের দল। আলো করে আছে

সমস্ত উদ্যানটি। আলোকিত হয়ে আছে চতুর্দিক। ফুলের মাঝে মাঝে আছে ফল। আছে গাছে আপেল, সেও, আড়ু আর পীচ। চতুর্দিক বেষ্টন করে আছে ধ্যানমৌন চানারের কুঞ্জ, প্রহরী হয়ে আছে, দিয়েছে সম্পূর্ণতা। ঘুরে ঘুরে দেখি সমস্ত উদ্যানটি। দ্বিতীয় স্তরের একপ্রান্তে এসে বসি। অপরাহ্নের শেষ রশ্মি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় পাহাড়ের শীর্ষদেশে। বোনে, চারিদিকে এক স্বপ্নের জাল। সৃষ্টি করে এক রহস্যময় পরিবেশ, তলিয়ে যাই সেই পরিবেশে, ভুলে যাই পারিপার্শ্বিকতা। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পাই বাসের ড্রাইভারের ডাকে। হাঁকে, উত্তীর্ণ হয়েছে সময়, সবাই উঠেছেন বাসে। বাকী শুধু আমরা দু'জন। আর একবার দেখে নেই এই অপরূপ কীর্তি, প্রণাম জানাই তার স্রষ্টাকে, নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও অম্লান হয়ে আছে।

বাস কোকরনাগে এসে থামে। রাস্তা থেকে প্রায় এক ফারলং গিয়ে আমরা একটি পাহাড়ের নীচে উপস্থিত হই। আছে সেখানে তিন চারটি ঝরণা, নৃত্যের ছন্দে নেমে আসছে পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে। শোনা যায় তাদের নূপুরের ধ্বনিও। পাহাড়ের অপর প্রান্তে ভেরীনাগ। এই ভেরীনাগে আছে একটি নির্ঝর, সেই নির্ঝর থেকেই উৎপত্তি হয় ঝিলাম নদীর। এখানেও রচিত হয় একটি স্বর্গোদ্যান, রচনা করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। অনবদ্য এই উদ্যানটি, সমপর্যায়ে পড়ে সালিমারের আর নিসাদের। দেখে মুগ্ধ হই। কোকরনাগের জল হজমিগুলির কাজ করে। তাই স্বাস্থ্যপিপাসুরা এসে, এখানে কটেজ ভাড়া নিয়ে, কিছুদিন কাটিয়ে যান। আমরা পেট ভরতি করি সেই জলে, করি বোতল ভরতিও। আছে এখানে একটি দোকান। দেখা শেষ করে, সেখানে খাবার খেয়ে, শ্রীনগরের পথে রওনা হই। এইখানেই কয়েকজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়, তাদের কেউ কাজ করেন শ্রীনগরের কলেজে, কেউ সরকারী দপ্তরে। রাত্রি নয়টায় শ্রীনগরে পৌঁছাই।

৯

পরের দিন ভোরে উঠেই গুলমার্গ দেখতে রওনা হই। বাসে করে যাই। যাই উরীর রাস্তায় প্রায় আট মাইল। অতি মনোরম এই রাস্তাটি। এই পথ

দিয়েই রাওলপিণ্ডি ও মারী হয়ে যেতে হতো কাশ্মীরে। এখন উরীর পরপার পাকিস্তান দখল করেছে। তাই যাতায়াত করতে হয় জম্মুর রাস্তায়। মধুর অভাবে খেতে হয় গুড়। বাস মোড় নেয় বাঁদিকে—চলতে থাকে একটি অতি রমণীয় রাস্তা দিয়ে। তার দু'পাশ দিয়ে চলেছে জলধারা, ছুটেছে মৃদু-গুঞ্জনে, পরপারে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত। সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক অভ্রভেদী পর্বত শ্রেণী—দাঁড়িয়ে আছে পীরগঞ্জল। শুনি এর এক চূড়া অতিক্রম করে ষোল হাজার ফিট। গাড়ি ট্যানমার্গ-এ এসে থামে। রাস্তা নাই আর গাড়ি চলার। নেমে পড়তে হয় গাড়ি থেকে। আসে অনেক ঘোড়ার মালিক, সঙ্গে নিয়ে ঘোড়া, আক্রমণ করে যাত্রীদের, যেমন করেছিল পহেলগামে। দুটো ঘোড়া ঠিক করে আমরা তার পিঠে চড়ে বসি। অতিক্রম করি পাহাড়। যেতে হবে আড়াই মাইল পথ। চড়তেও হবে প্রায় দেড় হাজার ফিট, তবেই পৌছান যাবে গুলমার্গে, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের কুসুম উদ্যানে। স্থানীয় লোকেরা বলে, গৌরী মার্গই নাকি পরিবর্তিত হয়েছে গুলমার্গ-এ। এইখানেই বাস করতেন সুন্দরের পূজারী গৌরী দেবী। পথ চলে বঙ্কিম গতিতে—ঘন নীল পাইনকুঞ্জের পাশ দিয়ে, শ্বেত-বসনা পাহাড়ী কলনাদিনীর গা ঘেঁষে। মাঝে মাঝে দেখা যায় এক গিরিবর, দাঁড়িয়ে আছেন পথ রুদ্ধ করে। কাছে গেলেই, সরে দাঁড়িয়ে মুক্ত করে দেন যাওয়ার রাস্তা। রুদ্ধ হয় না গতি।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে দেখতে যাই পথের অপরূপ শোভা। পৌছাই এসে গুলমার্গ-এ, এক স্বপন পুরীতে। সম্মুখে বিস্তৃত হয়ে আছে গুলমার্গ—বিছিয়ে দিয়েছে তার সবুজ অঞ্চল, স্পর্শ করে আছে সামনের পীরগঞ্জলের পদতল। শোভা পায় শুভ্র তুষারের মুকুট পীরগঞ্জলের মস্তকে। বুকে নিয়ে আছে ঘন নীল পাইনের কুঞ্জ, সেই নীলের বেষ্টনী ভেদ করে নির্গত হয় কত অসংখ্য রূপালি জলধারা। আসে নৃত্য করতে করতে। শোনা যায় তাদের অন্তরের ধ্বনিও। ছুটে যায় নীচের সমতল ক্ষেত্রে। রূপ নেয় বেগবতী স্রোতস্বিনীর। অঞ্চলের উপরেও দাঁড়িয়ে আছে পাইনের শ্রেণী আর তার ফাঁকে ফাঁকে কাঠের তৈরী সুন্দর বাংলো, চোখের সামনে তুলে ধরে এক নয়নাভিরাম ছবি। ইংরাজ রচনা করে গুলমার্গ, সে ছিল তাঁদের সুয়োরাণী। তারা কাটাত তাদের অবসর

সময় তারই সাহচর্যে, বাস করত এসে গুলমার্গে। এখানেই ছিল তাদের প্রমোদ ভবন, দিন কাটাত বিলাসে আর ব্যসনে। ছিল 'গল্‌ফ' খেলবার জায়গা, 'টেনিসকোর্ট', ছিল 'নিভাজ' হোটেল, ছিল অসংখ্য ছবির মতো বাংলো, অপ্রতুলতা ছিল না বিলাসের আয়োজনের। আজ বিদায় নিয়েছে ইংরাজ, অন্তর্হিত হয়েছে গুলমার্গ-এর চমৎকারিতাও, হয়ে আছে শুধু প্রকৃতির এক সুন্দরতম লীলাভূমি।

আরও প্রায় আড়াই মাইল চড়াই অতিক্রম করে খিলানমার্গ-এ উপনীত হই। এখান থেকে দেখি সুন্দরী শ্রেষ্ঠা গুলমার্গকে। ঘন নীলের অবগুণ্ঠনে লুকিয়ে আছে মুখ। দেখা যায় দূরে, শ্রীনগরও—বিস্তার করে আছে শ্রী। দেখা যায় 'নাঙ্গা'। দেখা যায় পীরগঞ্জল, মস্তকে শোভা পায় শ্বেত তুষারের কিরীট। দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। অতিক্রম করি আরও কিছুটা পথ, উপস্থিত হই একেবারে শীর্ষদেশে—দেখি এক দিগন্ত বিস্তৃত তুষারের হ্রদ ( গ্লেসিয়ার ), পরিচিত আল্‌পাথর নামে। অধিবাসীরা বলে, অহল্যা পাথর। এইখানেই নাকি প্রস্তরে পরিণত হয়ে আছেন অহল্যা। খেলতে আসে এখানে যুবক যুবতীরা, স্কেটিং করে এই হ্রদের বুকে। দেখি কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ হয়ে। নেমে আসি খিলানমার্গ-এ, সেখান থেকে গুলমার্গে। খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম করি কিছুক্ষণ। তারপর ট্যানমার্গ-এ আসি। সেখান থেকে বাসে করে শ্রীনগরের হাউসবোটে ফিরে আসি।

## ১০

পরের দিন, সেদিন ছিল শনিবার, সকালে উঠে "সোনামার্গ" দেখতে যাই। বাসে করে যাই। সোনামার্গ শ্রীনগর থেকে প্রায় আটষট্টি মাইল দূরে, প্রায় আট হাজার ফিট উঁচুতে। উচ্চতায় সমপর্যায়ে পড়ে পহেলগাম আর গুলমার্গ-এর। বাস রবিবারে আর শনিবারে চলে। শহর অতিক্রম করে কিছুদূর যাওয়ার পর, বাস একটি সুন্দর মনোরম পরিবেশের ভিতর দিয়ে চলতে থাকে। ক্রমে সেই পরিবেশ পহেলগামের রাস্তার মূর্তি ধারণ করে। দেখতে দেখতে যাই কাশ্মীরের এক সুন্দরতম লীলাভূমি, সোনামার্গ-এ এসে পৌছাই। বাস থেকে নেমে দেখতে

যাই কাথিড্রাল পর্বত। চূড়াগুলির আকার কাথিড্রালের মতো, তাই নাম রাখা হয়েছে কাথিড্রাল পর্বত। অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন এই পর্বত শ্রেণী। পদতলে বয়ে যায় এক স্রোতস্বিনী, যায় গর্জন করতে করতে। এই পর্বতের চূড়া থেকে দেখা যায় খাজোবাস গ্লেসিয়ার। আমরা দূর থেকে খাজোবাস গ্লেসিয়ার দেখে শ্রীনগরে ফিরে আসি।

পরের দিন সকালে একটি টাঙ্গায় চড়ে শহর দেখতে বার হই। দেখি শের-ই কাশ্মীব পার্ক, প্রতাপ পার্ক আর গান্ধী পার্ক। দেখি যাদুঘর আর এম্পোরিয়াম, করি কিছু বাজারও। দুপুরে শিকারায় চড়ে সাতটি সেতু দেখতে যাই। যাওয়ার পথে দেখি পুরাতন রাজপ্রাসাদ, প্রতাপসিংহের মহল। দেখতে দেখতে যাই নদীর দু'ধারেব শ্রীহীন জরাজীর্ণ বাড়ি। পরিচয় দেয় কাশ্মীরের দৈন্যের। ভূস্বর্গ কাশ্মীর, কিন্তু দরিদ্র তার প্রজারা। নিষ্পেশিত হয়ে আছে অভাবে আর অনাটনে। দেখি কয়েকটি শাল তৈরীর কারখানা। দেখি কাঠের কারখানাও। দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি অতি নোংরা পরিবেশে। সব শেষে দেখি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী একটি সুন্দর লক্ গেট, তারই সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা হয় ঝিলামের জল। ফিরে আসি গভীর রাত্রিতে।

## ১১

তার পরের দিন ভোরে উঠে রওনা হই পত্তনের মন্দির দেখতে। দেখতে উলার হ্রদও। কাশ্মীরের বৃহত্তম হ্রদ। আমরা প্রাইভেট বাসে চড়ে যাই। আমিরকদলের ওপার থেকে ছাড়ে। সেতু পেরিয়ে, শ' খানেক গজ হেঁটে গিয়ে বাসে উঠতে হয়। কয়েকটি রাস্তা অতিক্রম করে বাস এসে পৌছায় রাওয়ালপিণ্ডির রাস্তায়। এই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়েছিল গুলমার্গ-এ। মোড় নিতে হয়েছিল আট মাইল গিয়ে। বাস এসে থামে পত্তনে। এই পত্তনে এসেই রাজধানী পত্তন করেছিলেন মহারাজ শঙ্কর বর্মণ, কাশ্মীরের খ্যাতিমান রাজা, অবন্তীপুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরের রচয়িতা অবন্তী বর্মণের পুত্র। নাম রেখেছিলেন শঙ্করপুরা। তিনি নির্মাণ করেন এখানে দুইটি শিব মন্দির, শঙ্করগৌরীশ্বর আর সুগন্ধেশা। আজও দাঁড়িয়ে আছে নিয়ে তাদের পূর্বগৌরব। সাহায্য

করেছিলেন মহারাণী সুগন্ধা। সংগ্রহ করা হয়েছিল মন্দিরের উপকরণ, সাত মাইল দূরের এক গ্রাম থেকে, নাম তার পরিহাসপুরা। তাঁরা এখানে রাজত্ব করেছিলেন ৮৮৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিকল হয় আমাদের বাসের যন্ত্র, তাই সময় হয় মন্দির দর্শনের। দেখি অদৃশ্য হয়েছে প্রাঙ্গণ। দাঁড়িয়ে আছে বিমান কিন্তু চিহ্ন নাই মণ্ডপের। দাঁড়িয়ে আছে অলিন্দগুলি অঙ্গে নিয়ে সূক্ষ্মতম গান্ধার ভাস্কর্যের নিদর্শন।

শুনি, বুনিয়ার-এ, উরি নৌশারার মধ্যবর্তী এক দূরবর্তী গ্রামেই আছে নাকি একটি মন্দির, দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত অবস্থায়, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ কাশ্মীরী স্থাপত্যের নিদর্শন, নিদর্শন গান্ধার স্থাপত্যেরও। আছে বানিয়াতে, শ্রীনগর থেকে বত্রিশ মাইল দূরে, পবিত্র হরমুখ পর্বতের পাদদেশে দুইটি মন্দিরের সমষ্টি, ভূতেশ আর জ্যেষ্ঠ তাদের নাম। নির্মাণ করা হয় তাদের বিভিন্ন যুগে। নির্মিত হয় তাদের মধ্যে প্রাচীনতম মন্দির খৃষ্টের জন্মের দুশো পঞ্চাশ বছর পূর্বে, রচিত হয় ভূতেশ। কাশ্মীরের সৃষ্টি থেকেই হরমুখ পর্বত পরিণত হয় এক মহাতীর্থে। কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাদিত্যও নির্মাণ করেন এখানে একটি মন্দির। যুক্ত হয় আর একটি মন্দির বুকে নিয়ে অনবদ্য শিল্প-সম্ভার, জ্যেষ্ঠ গোষ্ঠীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তিনি ভূতেশকেও উৎসর্গ করেন মহামূল্য উপঢৌকন। নিস্তার পায়না এই মন্দিরগুলিও সিকান্দারের ধ্বংসের হাত থেকে।

একেবারে অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, অঙ্গে নিয়ে কাশ্মীর স্থাপত্যের নিদর্শন, একটি ক্ষুদ্র বিষ্ণু-মন্দির, পাণ্ড্রেথানে, শ্রীনগর থেকে তিন মাইল দূরে। দাঁড়িয়ে আছে একটি গ্রামে, একটি জলাশয়ের বুকে। এইখানেই ছিল মন্দিরের প্রাঙ্গণ, অঙ্গে নিয়ে কাশ্মীরী স্থাপত্যের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন। প্রস্তরে গঠিত এই মন্দির, নির্মিত হয় পার্থের রাজত্ব-কালে, নির্মাণ করেছিলেন ৯০৬ থেকে ৯২১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মন্ত্রী মেরু বর্ধন স্বামী। মন্দিরের শীর্ষদেশে শোভা পায় চতুষ্কোণ ত্রিভুজের আকারে ছাদ, অঙ্গে নিয়ে সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভার। রচিত হয় শীর্ষদেশও ত্রিভুজের আকারে।

ছিল এই মন্দিরটির তিনটি তলা। মন্দিরে আছে একটি এগার × সাত ফিট স্কোয়ার বেদী, শোভা পায় মন্দিরের ভিতরের ছাদ অপরূপ ভাস্কর্যে। পেয়ারেও

আছে একটি শৈবমন্দির, আছে অক্ষত অবস্থায়। ক্ষুদ্রতম, কিন্তু তার অঙ্গে শোভা পায় প্রকৃষ্টতম আর সূক্ষ্মতম কাশ্মীরী ভাস্কর্যের নিদর্শন, হয়ে আছে কাশ্মীরী স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ আর অনবদ্য প্রতীক। খুব সম্ভব নির্মাণ করা হয় এই মন্দিরটি দশম শতাব্দীতে।

একমাত্র শঙ্করাচার্যের মন্দির ছাড়া নাই কাশ্মীরে আর কোন বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন, নাই কোনও স্তূপ, নাই চৈত্য, নাই বিহার। আদিম কাশ্মীরবাসীরা ছিল নাগের পূজারী, পূজা করত সর্পদেবতাকে, বাস করতেন তাঁরা কাশ্মীরের অসংখ্য নির্ঝরে, তারই চিহ্ন বুকে নিয়ে আছে ভেরীনাগ, অনন্তনাগ, আছে কোকরনাগ। পরিণত হয় এই সকল স্থান মহাতীর্থে। যাত্রীরা আসে দলে দলে কৃতার্থ হয় পূজা দিয়ে। আসে ২৬০ খৃষ্ট পূর্ব। মহারাজা অশোক প্রচারক পাঠান কাশ্মীরে। তাঁরা প্রচার করেন বৌদ্ধধর্ম সারা কাশ্মীরে। প্রবল থাকে বৌদ্ধধর্ম ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত। নির্মিত হয় কত স্তূপ, কত চৈত্য আর বিহার সারা কাশ্মীরে। হূন, মিহিরকুল অধিকার করেন কাশ্মীর ৫৩০ খৃষ্টাব্দে। শৈব তিনি, ধ্বংস করেন বহু বৌদ্ধ বিহার আর চৈত্য। পুনর্জীবিত হয় বৌদ্ধধর্ম সপ্তম শতাব্দীতে। এই সময়েই আসেন কাশ্মীরে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউ-য়েন সান্। বাস করেন এখানে দু'বছর। ৬৩৩ আর ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে অনুশীলন করেন এখানকার ধর্মগ্রন্থ। তখন ললিতাদিত্যে মুক্তাদিত্য অলঙ্কৃত করেন কাশ্মীরের সিংহাসন। আসেন আরও একজন চীনদেশীয় পরিব্রাজক ৭৫৯ খৃষ্টাব্দে—ইউ-কং তাঁর নাম। বাস করেন তিনি কাশ্মীরে দীর্ঘ চার বৎসর। কাটান ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আর বিহারে বিহারে ঘুরে। ছিল তখন কাশ্মীরে তিন শতেরও অধিক বিহার আর অসংখ্য স্তূপ। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে সেই সব বিহার আর স্তূপ হিন্দু আর মুসলমান শাসকের অত্যাচারে। লুপ্ত হয়ে গিয়েছে একেবারে, অন্তর্হিত হয়েছে কাশ্মীরের বুকের ওপর থেকে।

মন্দির দেখে ফিরে আসি, দেখি নিরাময় হয়েছে বাহন, হয়েছে সচল। দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তুত হয়ে। আমরা বাসে উঠে পড়ি। স্টার্ট দেয় ড্রাইভার, বাস চলে দ্রুত গতিতে। কিছুক্ষণ পরে বাস এসে থামে একটি টিলার পাশে। টিলার ওপার গিয়ে দেখি এক স্মৃতি ফলক, লেখা আছে তাতে "এরাই রক্ষা

করেছে বারমূলা, ত্রাণকর্তা কাশ্মীরের"। এই বারমূলা রক্ষা করতে গিয়েই মৃত্যু বরণ করেন রণজিৎ রায় ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী। তিনিই নিযুক্ত হন প্রথম সেনাপতি এই অভিযানের, রক্ষা করেন বারমূলা। রক্ষা পায় কাশ্মীর হানাদারদের হাত থেকে। অকালে ঝরে পড়ে এক মহামূল্য প্রাণ। পরিসমাপ্তি হয় এক বিরাট সম্ভাবনার মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে। আছে একটি ছোট স্মৃতি-স্তম্ভও কাশ্মীরে। শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেখানে সমস্ত কাশ্মীরবাসী, জানায় রণজিৎ রায়কে, কাশ্মীরের ত্রাণকর্তাকে।

অকালে পরিসমাপ্তি হয় আরও একটি মহামূল্য প্রাণের। সে প্রাণ ব্রিগেডিয়ার ওসমানের। ত্রাণকর্তা নৌশেরার আর ঝা নগরের। তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন ঝা নগরে, শত্রুর গোলাবৃষ্টিতে। শেষ হয় আরও এক বিরাট সম্ভাবনার। বেঁচে থাকলে এরা দু'জনেই হতে পারতেন সর্বাধ্যক্ষ, উপনীত হতে পারতেন উন্নতির চরম শিখরে।

শ্রদ্ধা জানাই কর্ণেল রায়কে, জানাই ব্রিগেডিয়ার ওসমানকেও, জানাই নিঃশেষে। ধীরে ধীরে এসে বাসে উঠি। আবার চলতে থাকে বাস। শেষে বারমূলায় এসে দাঁড়ায়। বাস থেকে নেমে দেখতে যাই শহীদ শেরোয়ানীর কবর, পরিণত হয়ে আছে এক মহাতীর্থে।

শেরোয়ানী বারমূলার নেতা। গরীবের তিনি মা বাপ, বিপদের বন্ধু। বুক দিয়ে সাহায্য করেন হিন্দু মুসলমান সকলকেই। সমর্থন করতে পারেন নাই জিন্নার মতবাদ। কাশ্মীরই তাঁর স্বর্গ, সেই স্বর্গের অধিবাসীদের সেবা করেন তিনি, সেবা করেন প্রাণপণে, মানেন না জাতিবিচার। তিনি বাধা দেন আক্রমণকারীদের, তারা তাঁকে বেঁধে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় বধ্যভূমিতে, লাগায় বেত। পরে গুলি করে মারে। অকালে ঝরে পড়ে একটি মহামূল্য প্রাণ। মরবার সময় ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হয় "বেঁচে থাক আমার সাধের কাশ্মীর।" শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করি শহীদ শেরোয়ানীর উদ্দেশ্যে।

মনের পর্দায় ভেসে ওঠে আর একটি ছবি, চিত্র এক মর্মন্তুদ কাহিনীর। অনেক দিন আগে এক ইংরাজ মহিলা কাশ্মীরে আসেন। চিরকুমারী, সন্ন্যাসিনী তিনি। এখানকার অধিবাসীদের দুঃখে কাতর হয় তার অন্তঃকরণ, থেকে যান এখানে চিরদিনের জন্য। স্থাপন করেন এক আশ্রম। ধীরে ধীরে সেই

আশ্রম পরিণত হয় একটি সেবাশ্রমে, ক্রমে যুক্ত হয় একটি হাসপাতালও। সেখানে প্রতিদিন শত শত গরীব ছেলেমেয়েদের হয় চিকিৎসা, পায় তারা ঔষধ। স্থাপিত হয় একটি বিদ্যালয়ও। লেখাপড়া করে সেখানে গরীব ছেলেমেয়েরা, শেখে তাঁত বোনা, উলের কাজ আর সেলাইও। কয়েকজন সন্ন্যাসিনী পরিচালনা করেন সেই আশ্রম। তাঁরা কেউ ফরাসী, কেউ জার্মান, কেউ ইটালিয়ান। বাদ দেয় না হানাদারেরা এই আশ্রমটিকেও। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, তারা আক্রমণ করে এই আশ্রমটিকে। অতিথিশালায় তখন ছিলেন কয়েকজন বিদেশী। তাদের মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধ ইংরাজ দম্পতি, লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল ডাইকস্‌ আর তাঁর স্ত্রী। একে বৃদ্ধ তাতে বাতে পঙ্গু। বন্দুক হাতে তুলে নেবার আগেই হানাদারেরা তাঁর মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর পিছনে ছিলেন মিসেস ডাইকস্‌। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর উপর। পর দিন তাঁর মৃত দেহ পাওয়া যায় উলঙ্গ অবস্থায়। নিয়ে যায় হানাদারেরা তাঁর অঙ্গের আবরণও। তারা দাঁড় করায় নয় জন সিস্টারকে পাশাপাশি। বন্দুক উঠায় তাঁদের মস্তক লক্ষ্য করে। এমন সময় সেখানে এসে পড়ে একজন পদস্থ হানাদার। তাঁরই হুকুমে রক্ষা পান সন্ন্যাসিনীরা। প্রাণ দেন আরও একজন সন্ন্যাসিনী। প্রাণ দেন হানাদারদের গুলিতে। অকালে শুকিয়ে যায় একটি অমূল্য জীবন। বাদ দেয় না হাসপাতালের রোগীদেরও। কাউকে করে নিহত, কেউ হয় আহত। হানাদারেরা রেখে যায় এক চরম বর্বরতার চিহ্ন।

একটি টাঙ্গায় চড়ে উলার দেখতে রওনা হই। যেতে হয় সোপুর, সেখান থেকে ঝিলাম পার হয়ে বন্দীপুর। অতিক্রম করি বন্দীপুর শহরও। একটি মাঠের ভিতর দিয়ে টাঙ্গা এসে পৌছায় উলারের ধারে। এক রিজার্ভ ফরেষ্টের সামনে। গেট দিয়ে প্রবেশ করে টাঙ্গা এসে পৌছায় একটি খালের পারে। টাঙ্গা থেকে নেমে সামনেই দেখতে পাই একটি জেলের নৌকা, এসেছে মাছ ধরতে। দেখি স্তূপীকৃত হয়ে আছে পানফল, জন্মেছে উলারের জলে। নৌকার মাঝিকে কিছু পারিতোষিক দিয়ে, খাল পার হয়ে উলারের কিনারায় এসে পৌছাই। উলার নিস্তরঙ্গ, নিথর উলার, বিস্তৃত হয়ে আছে দিগন্তে। নাই চঞ্চলতা, নাই কোন প্রাণের স্পন্দন। কোথায় লুকালো সে—

তার বুকের উত্তাল তরঙ্গ, কোথায় সে ভীষণ গর্জন, কোথায় অন্তর্হিত হোল তার ভয়ালরূপ যা দেখতে ছুটে আসি এতখানি পথ। এক হতাশার মর্মবেদনায় ভরে যায় বুক। বসে পড়ি উলারের তীরে। প্রায় দু'ঘণ্টা বৃথা অতিবাহিত করে বন্দীপুরে ফিরে আসি। সেখান থেকে বাসে করে শ্রীনগরে ফিরি। রাত্রি তখন গভীর।

## ১২

পরেরদিন সকালে উঠেই রওনা করিয়ে দিই বাড়তি জিনিসপত্র ধ্যান সিং-এর সঙ্গে। বেলা ১১টায় একটি বড় সুটকেশ ও দুইটি এ্যাটাচি নিয়ে এয়ার ষ্টেশনে উপনীত হই। তাদের গাড়ি করে যাই এরোড্রামে। ঠিক একটায় প্লেনে উঠি। ধীরে ধীরে আকাশের গায়ে প্লেন ওঠে। জানালা দিয়ে দেখতে থাকি ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অপরূপ রূপ। দেখি তার অট্টালিকা, দেখি তার ফলের ক্ষেত, আপেল আর আখরোট্। দেখা যায় এক বিস্তৃত সবুজ অঞ্চল। সেই অঞ্চল ভেদ করে এঁকে বেঁকে চলে যায় একটি রূপালী রেখা, দেখি ঝিলাম। দেখা যায় দিগন্ত বিস্তৃত ডাল। দেখি হিমগিরি শ্রেণী। প্লেন এসে পৌঁছায় বাণিহালের শীর্ষদেশে। দেখা যায় বাণিহাল। দেখা যায় তার অঙ্গের রাস্তাও, জড়িয়ে আছে শাড়ির পাড়ের মত। নীচে থেকে উঠে আসে একটি ঘন মেঘ। আসে তাড়া করে। অবলুপ্ত হয়ে যায় অট্টালিকা, নদী আর পাহাড় তার অন্তরালে। অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে। চলে যায় দৃষ্টির বাইরে। মনে মনে প্রণাম জানাই ভূস্বর্গকে, প্রণাম জানাই তার সৃষ্টি-কর্তাকে। মনের মন্দিরে নিয়ে আসি এক স্মৃতি যা আছে অম্লান হয়ে শয়নে, স্বপনে, আর জাগরণে।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### কাশ্মীর স্থাপত্যের ধারা ঃ

সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন কাশ্মীর, বিশ্বের নন্দন কানন, বুকে নিয়ে আছে অপরিসীম সৌন্দর্য। শোভিত হয়ে আছে মহিমময় তুষার শীর্ষ হিমগিরিতে, বেগবতী কলনাদিনী স্রোতস্বতীতে, দিগন্ত প্রসারিত সরোবরে আর অনুপম উপত্যকায়। পৃথক হয়ে আছে বাইরের জগৎ থেকে। সুন্দরের পূজারী তার অধিবাসীরা, অধিকারী স্বতন্ত্র সভ্যতা আর সংস্কৃতিরও, গড়ে তোলে কাশ্মীরের বুকে এক নিজস্ব স্থাপত্য, মহিমময় পরিকল্পনায়, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম রূপদানে।

নির্মিত হয় কাশ্মীরে কত অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য ( মন্দির ) আর বিহার, বুকে নিয়ে শিল্প-সম্ভার। নির্মিত হয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। হয় শ্রীনগরের কাছে হারোয়ানে আর বারমূলার কাছে উশকারে। এইখানেই ছিল বৌদ্ধদের বসতি। আবিষ্কৃত হয়েছে হারোয়ানে একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ, তার মস্তকে শোভা পায় সপ্তসারি যুক্ত একটি ছত্র। অঙ্গে নিয়ে আছে এই স্তূপটি গান্ধার স্থাপত্যের নিদর্শন। এইখানেই একটি আদর্শ চৈত্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুরূপ দক্ষিণ ভারতের গুহা মন্দিরের চৈত্যের। নাই অন্য কোন স্থানে। পরিসমাপ্তি হয় কাশ্মীর স্থাপত্যের আদি যুগের।

অষ্টম শতাব্দী থেকে সুরু হয় মধ্যযুগ। নির্মিত হয় কাশ্মীরে বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য আর বিহার। নির্মিত হয় হিন্দুমন্দির, নির্মাণ করেন ললিতাদিত্যের মন্ত্রী আর ললিতাদিত্য মুক্তাদিত্য। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কাশ্মীরের, অলঙ্কৃত করেন সিংহাসন ৭২৪ থেকে ৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। হারোয়ানের আর উশকারের শিশু পরিণত হয় এক বল বীর্যশালী যুবকে। কাশ্মীরের স্থাপত্য, কাশ্মীরের ভাস্কর্য লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। পরিচয় দেয় তাদের অনবদ্য স্থাপত্য জ্ঞানের।

এই যুগের প্রাচীনতম নিদর্শন বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য আর বিহার বুকে নিয়ে আছে পরিহাসপুরা, শ্রীনগর থেকে ষোল মাইল দূরে অবস্থিত। আছে

পুরাণাধিষ্ঠানও, পরিচিত পাণ্ডেথান নামে। নির্মাণ করেন এই স্তূপ, চৈত্য আর বিহার ললিতাদিত্যের মন্ত্রী চানকুনা। চুন সুরকি দিয়ে নির্মিত হয় এইসব স্তূপ, চৈত্য আর বিহারের পাথরের দেওয়াল। অঙ্গে নিয়ে আছে প্রকৃষ্টতম শিল্প-সম্ভার।

নাই এই যুগের অন্য কোন বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। পরবর্তী পাঁচশত বৎসর হিন্দুমন্দির নির্মাণে নিবদ্ধ থাকে কাশ্মীর স্থপতির প্রচেষ্টা আর উদ্যম। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাশ্মীর মুসলমানের অধিকারে আসে।

গান্ধার স্থপতির স্তূপের প্রাঙ্গণের আর বিহারের অনুকরণে নির্মিত হয় মন্দিরের প্রাঙ্গণ। রচিত হয় কুলুঙ্গি আর শীর্ষদেশ। শোভা পায় ত্রিপত্রাকারে খিলান। পীরামিডের আকারে রচিত হয় মন্দিরের চূড়া। নির্মিত হয় স্তম্ভ বাঁশীর আকারে। শোভিত করা হয় স্তম্ভের অঙ্গ আর শীর্ষদেশ অপরূপ শিল্প-সম্ভারে। হয় প্রস্ফুটিত পদ্মে, বল্লমে আর বৃত্তে।

সর্পের পূজারী তাঁরা, তাই শোভা পায় জল আর সর্পের মূর্তিও লুডফ্ আর পাণ্ড্রেথানের মন্দিরে। সর্পের মূর্তি দিয়ে শোভিত করা হয় অন্য মন্দিরগুলিকেও। সাজান ওয়াংনাথের মন্দিরের পাথরের দেওয়াল সূক্ষ্ম আর সুন্দরতম শিল্প-সম্ভারে। সাজান যুগ যুগ ধরে। অর্ধচন্দ্রাকারে নির্মিত হয় মন্দিরের ছাদ। আছে তার নিদর্শন লুডফের কাছে রুদ্রেশের মন্দিরে। অপরূপ শিল্পসম্পদে সজ্জিত করা হয় ছাদের অঙ্গও। শ্রীনগর থেকে ষোল মাইল দূরে রুদ্রেশের মন্দিরই বুকে নিয়ে আছে মধ্যযুগের হিন্দুমন্দিরের প্রাচীনতম নিদর্শন। নির্মিত এই মন্দিরটি গান্ধার স্থপতির পদ্ধতিতে।

বুকে নিয়ে আছে উন্নততর স্থাপত্যের নিদর্শন তকৃথ্-ই সুলেমান পর্বতের শীর্ষদেশে অবস্থিত শঙ্করাচার্যের মন্দির। এই মন্দিরটিও অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত হয়। দাঁড়িয়ে আছে মহামহিমময় মূর্তিতে এক পর্বতের শিখরে, তার পদতলে প্রবাহিতা খরস্রোতা ঝিলাম।

কাশ্মীর স্থাপত্যের সমধিক উন্নত সংস্করণ বুকে নিয়ে আছে নরস্তানের মন্দির। দাঁড়িয়ে আছে শ্রীনগর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে ত্রিশ মাইল দূরে। আছে এই মন্দিরে ছাঁচে তৈরী কুলুঙ্গি। আছে ত্রিকোণ চন্দ্রাতপ। আর

আছে প্রাচীরে বেষ্টিত প্রবেশ পথে একটি সুউচ্চ প্রবেশ দ্বার। অপরূপ শিল্পসম্ভারে শোভিত তাদের অঙ্গ।

এই যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সর্বযুগেরও, বুকে নিয়ে আছে মার্তণ্ডের মন্দির। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি এক মহামহিমময় মূর্তিতে, প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে, বেষ্টিত হয়ে আছে হিমগিরি শ্রেণীতে। এই মন্দিরের বিরাট সিংহদ্বার, মূল মন্দির, আর মন্দিরের সংলগ্ন মণ্ডপ-তোরণ আর অলিন্দ পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যজ্ঞানের। প্রতীক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য জ্ঞানেরও। দান প্রকৃতির অনুপম সৃষ্টির আর ললিতাদিত্যের স্থপতির প্রতিভার চরম উৎকর্ষের, হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্যের, মনের সবখানি মাধুরীর। তাই অমর হয়ে আছে এই মন্দির, অমর হয়েছে কাশ্মীর, অমর ভারতবর্ষ।

নির্মিত হয় এই যুগে ওয়াঙ্গাতেও একটি মন্দিরের সমষ্টি। কিন্তু তারা সমপর্যায়ে পড়ে না মার্তণ্ড মন্দিরের। পড়ে না পরিকল্পনার মহিমায়ত্বে। শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। অষ্টম শতাব্দীতে ললিতাদিত্য এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরের সমষ্টি পবিত্র হরমুখের পাদদেশে, প্রকৃতির এক সুন্দরতম লীলা নিকেতনে, বেষ্টিত হয়ে আছে পাইনকুঞ্জে আচ্ছাদিত পর্বত কন্দরে। পদতলে প্রবাহিত হয় এক কলনাদিনী স্রোতস্বিনী।

অবন্তী বর্মণ, অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা কাশ্মীরের, অধিরোহণ করেন সিংহাসনে ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে, রাজত্ব করেন ৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুরু হয় কাশ্মীর স্থাপত্যের দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ। হারোয়ানের বীজ পরিণত হয় মহীরূহে। শ্রীনগর থেকে আঠার মাইল দূরে ঝিলামের তীরে তিনি স্থাপন করেন রাজধানী, পরিচিত অবন্তীপুর নামে। নির্মাণ করেন সেখানে দু'ইটি মন্দির। একটি শৈব, পরিচিত অবন্তীশ্বর নামে। দ্বিতীয়টি বিষ্ণু মন্দির, অবন্তীস্বামী নামে খ্যাতি লাভ করে। বৃহত্তর তাদের মধ্যে অবন্তীশ্বরের মন্দির, নির্মিত হয় সর্বসাধারণের পূজার জন্য। বিরাজ করতেন এই মন্দিরে পঞ্চদেবতা। নির্মিত হয় মূল মন্দিরটি সাতান্ন ফিট "স্কোয়ার" পরিধি নিয়ে, একটি দু'শ' আঠার ফিট দীর্ঘ আর দু'শ' ফিট প্রস্থ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে।

নির্মিত হয় অবন্তীস্বামীর মন্দির তেত্রিশ ফিট স্কোয়ার পরিধি নিয়ে, একশ চুয়াত্তর ফিট দীর্ঘ আর একশ' আটচল্লিশ ফিট প্রস্থ প্রাঙ্গণের মধ্যে। বিরাজ

করতেন এই মন্দিরেও পঞ্চ দেবতা। বিরাজ করতেন ক্ষুদ্র মন্দিরে, মূল মন্দির থেকে পৃথক হয়ে। খনিত হয় মূল মন্দিরের সামনে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। রচিত হয় একটি কীর্তিস্তম্ভ তার সামনে। প্রাচীরের অঙ্গে নির্মিত হয় উনসত্তরটি প্রকোষ্ঠ। শোভিত হয় প্রকোষ্ঠগুলি সত্তরটি সমদূয় স্তম্ভের শ্রেণীতে। ষোলকোণ প্রতিটি স্তম্ভদণ্ড। প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশদ্বার। দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য স্তম্ভ প্রবেশদ্বারের পাশেও। প্রাচীরের বাইরেও শোভা পায় স্তম্ভের শ্রেণী। সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম ভাস্কর্যে শোভিত করা হয় মন্দিরের দেওয়াল আর স্তম্ভের অঙ্গ।

অনুরূপ মার্তণ্ডের মন্দিরের পরিকল্পনায় আর বিস্তৃতিতে, সূক্ষ্মতর আর সুন্দরতর এই মন্দিরের অঙ্গের ভাস্কর্য, দেওয়ালের আর স্তম্ভের অঙ্গের শিল্প-সম্ভার। কাশ্মীর স্থপতির একশত বৎসরের প্রচেষ্টার ফল। মহা-মহিমময় মার্তণ্ড, পরিচায়ক বিশালতার, নির্দেশক বিরাটের। অনবদ্য অবন্তীস্বামী, অনুপম, কমনীয়, প্রতীক কাশ্মীর স্থপতির পূর্ণ পরিণতির, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, অমর কীর্তির।

সমসাময়িক বুনিয়ারের মন্দির আর উরির নিকটে ধাতা মন্দির। আছে অক্ষততম অবস্থায় বুনিয়ারের মন্দির। নাই এই মন্দিরে প্রকৃষ্ট কারুকার্য, নাই সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভারও।

৮৮৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীনগর থেকে সতের মাইল দূরে, পত্তনে নির্মিত হয় দুইটি শৈব মন্দির। নির্মাণ করেন অবন্তী বর্মণের পুত্র শঙ্কর বর্মণ। তিনিই পত্তনে রাজধানী পত্তন করেন। পরিচিত এই মন্দির দুইটি শঙ্কর গৌরীশ্বর আর সুগন্ধেশা নামে। সুগন্ধা ছিল মহারাণীর নাম। অনুরূপ মন্দির দুইটি গঠনে আর শিল্পসম্ভারে। অনবদ্য পরিকল্পনায়। সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম রূপদানে। প্রতীক কাশ্মীর স্থাপত্যের এক গৌরবময় যুগের, এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, এক অতুলনীয় কীর্তির।

নির্মিত হয় নাই কাশ্মীরে কোন উল্লেখযোগ্য মন্দির দশম আর একাদশ শতাব্দীতে। দ্বাদশ শতাব্দীতে, শ্রীনগর থেকে তিন মাইল দূরে পাণ্ড্রেথানে নির্মিত হয় একটি ক্ষুদ্র মন্দির। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি কাশ্মীর স্থাপত্যের পরবর্তীযুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সাড়ে সতের ফিট স্কোয়ার এই

মন্দিরের পরিধি। উচ্চতায় চব্বিশ ফিট। অনবদ্য গঠনে আর অঙ্গের শিল্প-সম্ভারে। অভিনব এই মন্দিরের ছাদ।

নির্মিত হয় এই যুগে কয়েকটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে মন্দিরও, হয় পেয়ারে, মামালে, কোথারে আর বামুজে। নাই তাতে স্থপতির গৌরবময় সৃষ্টি, নাই প্রকৃষ্ট শিল্প-সম্ভার। সমপর্যায়ে পড়ে না দক্ষিণ ভারতের পাথর কেটে তৈরী মন্দিরের, পড়ে না নাসিকের, ঔরঙ্গাবাদের, কারলার, অজন্তার আর এলোরার।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান অধিকার করে কাশ্মীর। রুদ্ধ হয় কাশ্মীরে মন্দির নির্মাণ। লুপ্ত হয় কাশ্মীরের হিন্দু স্থাপত্য, অন্তর্হিত হয় একেবারে।

**সমাপ্ত**

## যে-যে বই থেকে সাহায্য পেয়েছি
## তাদের ও তাদের রচয়িতার নাম


| | রচয়িতার নাম | বই-এর নাম |
|---|---|---|
| ১। | Fergusson, J. | History of Indian and Eastern Architecture Vol. I & II |
| ২। | Havell, E. B. | The Ancient & Mediaeval Architecture of India |
| ৩। | Percy Brown | Indian Architecture Vol. I ( Buddhist & Hindu ) |
| ৪। | Kramrisch, Stella | The Hindu Temple. |
| ৫। | Do | The Art of India Through the ages. |
| ৬। | Rowland, Benjamin | The Art & Architecture of India. |
| ৭। | Smith. V. A. | A History of Fine Art in India & Ceylon. |
| ৮। | Majumdar, R. C. ; Ray Chowdhuri. H.C. & Dutta, Kali Kinkar | An Advanced History of India. |
| ৯। | Rupam, | Magazine of the India Society of Oriental Art, Calcutta. |
| ১০। | C. Minakshi | Kanchi ( An introduction to its Architecture ) |
| ১১। | Tourist Bureau, Mysore | The Home of Hoysala Architecture. |
| ১২। | Do | Sravanbelagola |
| ১৩। | Do | Somanathapur, A Museum of Indian Art. |
| ১৪। | Do | Belur, The Home of Indian Architecture. |
| ১৫। | যাযাবর | ঝিলাম নদীর তীরে |